যাযাবরী

শিবনাথ ভাদুড়ী

জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা এপ্রিল ১৯৫৪

প্রকাশক :
দিলীপ চক্রবর্তী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
দিলীপ মুখার্জী
ডি. বি. প্রেস
৮২, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সরস্বতীর জীবন-আলেখ্য
সরস্বতীর হাতে তুলে দিলাম

প্রস্তাবনা

বাসে জানালার ধারে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। সারা দিনের ক্লান্তি, তার সঙ্গে গ্রীষ্মের সান্ধ্য ঝিরঝিরে বাতাসের আমেজ। আমার ঘুম এসে গিয়েছিল।

দু'দিন ধরে সেমিনার চলেছে শিশির মঞ্চে। আমি সাংবাদিক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সকাল নটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলেছে বক্তৃতা। মাঝখানে স্বল্প সময়ের জন্য কফি পানের বিরতি, মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি ও বৈকালিক চা পানের বিরতি ছিল।

তবু এক নাগাড়ে বসে বসে অনবরত গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শোনা যথেষ্টই ক্লান্তিকর। কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেই সেমিনারে কলকাতার নাগরিক জীবনের মূল্যায়ন ও তার শিল্প সংস্কৃতি চর্চার মূল্যায়নের প্রসঙ্গে গুন্টার গ্রাস বা দোমিনিক লাপিয়েরের নামোল্লেখ হয়েছে। ফলে বিতর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। "মিছিল নগরী" বা "মৃত নগরী" বিশেষণকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হয়ে উঠেছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কখনও মৃদু, কখনও বা উচ্চকিত গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। বক্তৃতার মধ্যে তা প্রাণসঞ্চার করেছে। তবু দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা শোনার ক্লান্তি, বক্তৃতার বক্তব্য মস্তিষ্কের কুঠুরিতে ধরে রাখার ক্লান্তি কম নয়। নিজেকে আমি টানটান রাখতে পারছিলাম না। ক্লান্ত শরীর মন সমর্পণ করে দিয়েছিলাম তন্দ্রাদেবীর কাছে।

হঠাৎ কানের পাশে উত্তেজিত মহিলাকণ্ঠের সক্ষোভ আর্তনাদে কেটে গেল আমার তন্দ্রাভিভূত ঘোর। চোখ খুলে দেখতে পেলাম সামনে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাকে। সুশ্রী আভিজাত্যপূর্ণ চেহারার মহিলাটি মাথা নীচু করে বাইরের দিকে দেখছেন আর সমানে বিলাপ করে যাচ্ছেন।

একটুক্ষণ মনোনিবেশ করে ব্যাপারটা বোঝা গেল। পথে কয়েকটি কুকুর শুয়ে ছিল। ড্রাইভার চেষ্টা করেও তাদের সবাইকে বাঁচাতে পারেনি। বাসের যাত্রীরা অনেকেই হাহুতাশ করছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার উত্তেজনা তাদের সকলের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

উচ্চগ্রামে গলার স্বর তুলে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন তিনি। বারবার একই কথা বলে চলেছিলেন ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে।

—এভাবে কুকুরগুলোকে মারলেন? মানুষ নয় বলে কি ওদের জীবনের কোন দাম নেই? আপনার কষ্ট হোলনা এভাবে ওদের মেরে ফেলতে?

ড্রাইভার স্টিয়ারিঙে হাত দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে জবাব দিল।

—আমি কি ইচ্ছা করে মেরেছি, দিদি? দেখলেন তো চেষ্টা করলাম কত।

যাযাবরী—১

জোরে জোরে হর্ন দিলাম। তবু রাস্তা থেকে নড়লনা। হঠাৎ করে কি গাড়ি থামানো যায় মাঝপথে? কিছু হলে আমায় কি ছেড়ে দেবেন আপনারা?

দু' একজন যাত্রী ড্রাইভারকে সমর্থন করল।

—কি করবে ও? কুকুর বাঁচানোর জন্য তো মানুষ মেরে ফেলতে পারে না।

ভদ্রমহিলা মেনে নিলেননা।

—মানুষ মারার কথা হচ্ছেনা। কিন্তু চেষ্টা করলে কুকুরগুলিকে বাঁচানো যেত। কুকুর মারলে শাস্তির ভয় নেই। তাই সকলেই কেমন নির্বিকার! কিন্তু কুকুরের জীবনেরও দাম আছে।

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য রসিকতা করি আমি।

—তা আছে। তবে মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক কম।

কথাটার মধ্যে খোঁচা আছে মনে করে বিরক্ত হলেন ভদ্রমহিলা।

—আমি তা মনে করি না। মানুষের জীবনের চেয়ে কুকুরের জীবনের দাম কেন কম হবে? কুকুর অবোলা জীব বলেই কি তার জীবনের দাম কম হয়ে যাবে?

অবাক হয়ে যাই। কুকুরের জীবনের চেয়ে মানুষের জীবনের দাম তো স্বতঃসিদ্ধভাবেই বেশি বলে জানি। তা কি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? কোন দিন যে এমন অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীণ হতে হবে, তাও যেন অকল্পনীয় ছিল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। নিরুত্তর বিস্ময়ে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করে দেখি। বেশভূষায় কোন রকম অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ছেনা। একটু বয়স হয়েছে। সহজাত সুশ্রী চেহারায় সেই বয়স ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। তবে চেহারায় পারিবারিক আভিজাত্যের সঙ্গে একটু যেন অহংকারের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

অভিজাত পরিবারের মহিলাদের কুকুরপ্রীতি আমার অজানা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ বিড়াল, পাখি, ইত্যাদিও পুষে থাকেন। জীবজন্তু পোষা ও তাদের প্রতি প্রীতি পোষণ করা কখনই অস্বাভাবিকতা বলে গণ্য হয় না।

পরিচিত বহু পুরুষ ও মহিলার মধ্যে আমি এরকম পশুপাখিপ্রীতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাদের কেউই মনুষ্যজীবন ও পশুজীবনকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে এভাবে ওজন করার চেষ্টা করে নি।

আমার চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশিত হতে দেখেই হয়ত নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখান তিনি।

—মানুষ শক্তিমান, সে কথা স্বীকার করি। শক্তিমত্তা বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব সত্যিই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জীবনের মূল্য, অস্তিত্বের মূল্য কি শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখেই বিচার হবে? পশুর মুখে ভাষা ফোটে না। ফুটলে সেও কি অনেক ব্যাপারে তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা মানুষের মতই সোচ্চারভাবে ঘোষণা করত না?

হয়ত বা মানুষের স্বভাবে যে অনেকগুলি খারাপ দিক আছে, তার তুলনায় পশুর শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণিত হতো।

আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলার বক্তব্যের মধ্যে যুক্তির ধার বড় কম নয়। তবু মানুষ আর পশুর জীবনের দাম সমান, একথা মানতে পারছিনা। এত বছর ধরে যে ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তা আমার রক্তে মজ্জায় অনুভূতিতে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। যুক্তিতে হেরে গেলেও ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাই একমত হতে পারিনা।

আমার পাশে যে মহিলা বসে ছিলেন, তিনি নেমে গেলেন। ভদ্রমহিলা বসে পড়ে নাছোড়বান্দার মত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—আমরা মানুষরা নিজেরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করি। আমরা মনে করি, আমাদের জীবনের দাম অনেক। পশুদের জীবনের দাম কানাকড়িও নয়। প্রয়োজনে, এমনকি অপ্রয়োজনেও, পশুপাখিকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করিনা।

কথাগুলি মিথ্যা নয়। তবু আমি প্রতিবাদ করি।

—মানুষ যা-ই করুক, তবু সে শ্রেষ্ঠ জীব। তার জীবনের মূল্য সব সময়েই পশুর জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশি।

ভদ্রমহিলার কথায় উষ্ণ ঝাঁঝ প্রকাশ পায়।

—আপনার মতে, শ্রেষ্ঠত্বই জীবনের মূল্যের মাপকাঠি? তাহলে হিটলার কি দোষ করেছিল? কিংবা মুসোলিনী? আর যেসব জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য নিপীড়নের শাসন চালায়, তারাই বা কি দোষ করে?

আমার অদ্ভুত লাগছিল। কোন্ প্রসঙ্গ থেকে কোন্ প্রসঙ্গ এল? আমি কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিলামনা। অবাক বিস্ময়ে মনে মনে খালি একটি কথাই ভাবতে লাগলাম।

—এ তো আচ্ছা কুকুরপ্রেমী মহিলার পাল্লায় পড়েছি? ইনি কি জোর জবরদস্তি করে স্বীকার করিয়ে নেবেন যে, মানুষের চেয়ে কুকুরের দাম কম নয়? এরকম হাস্যকর কথা যে কেউ বলতে পারে, তা স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস হোতনা।

আমার মনোভাব গোপন করিনা।

—আপনি হাস্যকর কথা বলছেন। হিটলার বা মুসোলিনীর প্রসঙ্গ আসছে কেন? আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

—একটুও হাস্যকর কথা বলছি না। হিটলার বলেছিল, জার্মান জাতি অন্য সব জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অতএব অন্য সব জাতির ওপর তার আধিপত্য বিস্তারের অধিকার আছে। মুসোলিনীও প্রকাশ্য জনসভায় ইটালীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে দেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করত। নাৎসিবাদ, ফ্যাসি-

বাদের প্রকোপে মানবসভ্যতা যে ধ্বংস হতে চলেছিল, তা তো আপনি জানেন। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তুলে তারা নিপীড়ন চালিয়েছিল মানুষের ওপর।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

—তাতে কি? হিটলার মুসোলিনী নিজেরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করেছিল। কিন্তু মানুষ হিসাবে, জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে গেলে কতগুলি বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

—ঠিক কথা। কিন্তু ইতিহাস বলে, তারা সেই দাবি তুলেই দেশবাসীকে নাচিয়েছে। যারা তা মানতে পারেনি, তাদের অবস্থা প্রাণান্তকর হয়েছে। আর যদি ধরেও নিই, কোন জাতি বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাতে পারে, তাহলেও কি তার দরুন অন্য সব জাতিকে ধ্বংস করার, পদদলিত করার অধিকার জন্মায়?

—না, তা জন্মায় না। কিন্তু কথা হচ্ছিল মানুষ ও কুকুর—

ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন অসহিষ্ণু হয়ে।

—জানি। আমার খেয়াল আছে। আমি বলছি, মানুষও নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তুলে তার জীবনকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে জাহির করে। পশুরা নির্বাক বলেই প্রতিবাদ জানাতে পারে না। নিঃশব্দে মানুষের সব রকম অত্যাচার সহ্য করে। তাদের জীবনের দাম তার জন্য কম হতে পারে না।

ভদ্রমহিলার চড়া কণ্ঠস্বরে অনেকেই সচকিত হয়ে উঠেছে। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করি। যুক্তির দিক দিয়ে পুরোপুরি নির্ভুল তার বক্তব্য। পরিবেশ ভারসাম্য বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিচারে প্রতিটি সৃষ্ট জীবেরই মূল্য রয়েছে। তবু যে মানুষকে বিধাতার আদলে তৈরি বলে জানি, তার মূল্য অন্য সব জীবের সমান বলে ভাবি কি করে?

তর্কের প্রসঙ্গ ছেড়ে রসিকতা করি আমি।

—বুঝেছি, মানুষের চেয়ে কুকুরকে বেশি ভালবাসেন আপনি! মানুষ মারা গেলে হয়ত এতখানি বিচলিত হতেন না। তাই না?

ভদ্রমহিলা রাগ করলেন না। অবলীলাক্রমে মেনে নিলেন আমার কথা।

—সত্যিই আমি কুকুর খুব ভালবাসি। মানুষের মত শয়তানি জানেনা কুকুর। বিশ্বাসঘাতকতা জানেনা, ভণ্ডামী জানেনা, মিথ্যাচার জানেনা। মানুষের তুলনায় কুকুর অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

আমি আবছাভাবে অনুভব করলাম, ভদ্রমহিলার জীবনে অবশ্যই কোন করুণ অধ্যায় আছে। অভিজাত পরিবারের কুকুরপ্রীতি বলে যা ভেবেছি, তার মূল কারণ নিহিত আছে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে।

আমার তীব্র কৌতূহল হোল ভদ্রমহিলার জীবনের সেই অধ্যায় জানার। প্রতিদিন ট্রামে বাসে কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়। কত বিষয়ে কথা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সাময়িক এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে কতজনের সঙ্গে। তাদের

জীবনের খণ্ড খণ্ড অধ্যায় বা অভিজ্ঞতা উন্মোচিত হয়। কিন্তু সকলের সম্পর্কে সমান কৌতূহল জাগে না।

একটু পরেই হয়ত নেমে যাবেন ভদ্রমহিলা। আর কোন দিন হয়ত ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা ভেবে খারাপ লাগল। মনে হোল, একটা চমকপ্রদ কাহিনী আমার কাছে চিরদিন অজানা থেকে যাবে। অথচ আমি যদি একটু সচেষ্ট হই, তাহলে হয়ত বা আমাকে সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় না।

কথাটা ভেবে খারাপ লাগল। ভদ্রমহিলার অভিজ্ঞতা যে সুখকর নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমি সেই দুঃখজনক কাহিনী শুনতে এত আগ্রহী কেন? কিংবা সেটি শোনা হবেনা ভেবেই বা এতখানি অধীর হচ্ছি কেন? আমি কৌতূহল চাপা দিয়ে নির্বিকার থাকলাম।

কিন্তু আমার স্টপে ভদ্রমহিলাকে নামতে দেখে অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলাম। মনে হোল, ভদ্রমহিলা হয়ত বা কাছাকাছি কোথায়ও থাকেন।

আমি বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছি। একটু দূরে ভদ্রমহিলাও আপন মনে এগিয়ে চলেছেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করে ওর পাশে চলে যাই।

অবাক চোখে লক্ষ্য করেন ভদ্রমহিলা আমাকে।

—কিছু বলবেন?

আমি ভণিতা করলাম না। সোজাসুজি প্রশ্ন করি।

—আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

থমকে গেলেন ভদ্রমহিলা। আমাকে স্থির চোখে লক্ষ্য করে পাল্টা প্রশ্ন করেন।

—কেন বলুন তো?

অস্বস্তি বোধ করি। বুঝতে পারি, আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। সরল মনে আমার প্রশ্নটি গ্রহণ করতে পারছেন না।

আমি একরকম মরীয়া হয়েই আমার মনোভাব ব্যক্ত করি।

—আপনার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আর দশ জনের থেকে আপনার জীবনের ছক আলাদা।

একটু বিষন্ন হাসি খেলে গেল-ভদ্রমহিলার মুখে।

—আপনার অনুমান ভুল নয়। আমার জীবন সত্যিই অনেকের থেকে আলাদা। আমি নিজেই যখন নিজের জীবন নিয়ে ভাবি, তখন অবাক হয়ে যাই। ভাবি, আমার মত এত ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীণ হয় কয়জন মেয়ে? রূপকথার রাজকন্যার ঘুঁটেকুড়নী হয়ে যাওয়ার গল্প শুনেছেন তো? অনেকটা সেরকম। তবে ঘটনাগুলো অনেক বেশি চমকপ্রদ, অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি অস্বাভাবিক। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আপনি কেন জানতে চান আমার কথা? আপনি কি লেখেন? যদি লেখেন, তাহলে অবশ্য আমার জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস অনেকের কাছেই অকল্পনীয় বলে মনে হবে। হয়ত বা বিশ্বাসই হবে না অনেকের।

আমি সত্যি কথাই বলি।

—না না, লেখা টেখা আসেনা আমার। তবে মানুষের সম্পর্কে কৌতূহল রয়েছে আমার। বিশেষ বিশেষ মানুষকে দেখে, তাদের কথাবার্তা শুনে আমার ইচ্ছা হয় তাদের সম্পর্কে জানার। আপনার কুকুরের প্রতি অতখানি ভালবাসা—

আমাকে শেষ করতে দিলেন না ভদ্রমহিলা।

—কুকুরের কথাটা ভুলতে পারছেন না দেখছি। কুকুর সত্যিই মানুষের তুলনায় অনেক বিশ্বাসযোগ্য। শুনলে অবাক হবেন, আমাকে একবার কুকুর কামড়েছিল। বেশ অনেকদিন ভুগেছিলাম। তবু আমার কুকুরের ওপর রাগ নেই। কুকুরও আমাকে খুব ভালবাসে।

আমি হেসে ফেলি।

—আইজাক নিউটনের শুনেছি ডায়মণ্ড নামে এক পোষা কুকুর ছিল। বহু বছরের গবেষণার মূল্যবান কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলেছিল সে। তবু নিউটন তার ওপর রাগ করেন নি। শুধু দুঃখ করে বলেছিলেন 'হায় ডায়মণ্ড, তুমি জানলা, তুমি কি গুরুতর ক্ষতি করেছ।' আপনার কথা শুনে আমার নিউটনের কথা মনে পড়ছে।

ভদ্রমহিলাও হাসেন।

—নিউটনের কথা জানি না। তবে আমি কুকুরের সান্নিধ্যে অনেক সময়েই দুঃখযন্ত্রণার উপশম খুঁজেছি। কুকুরকে ভালবাসলে তার প্রতিদান পাবেন। কুকুর সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে জানে। সাময়িকভাবে কোন কারণে ক্ষেপে গিয়ে কামড়াতে পারে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা বা শয়তানী কুকুরের মধ্যে দেখবেন না।

গম্ভীরভাবে শুনে গেলাম আমি। কোন মন্তব্য করলাম না। কৌতূহলের বেগ ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠছে আমার মধ্যে। কিন্তু অসাবধানে হঠকারিতার বশে কিছু বলে ফেলা ঠিক হবে না। ভদ্রমহিলা নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেন। আমি ওঁর পাশে চলতে চলতে এটা সেটা নানা কথা বলতে থাকি।

একটু পরেই আমার বাড়ি এসে গেল। আমি ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ করলাম ভেতরে আসতে। একটু যেন দ্বিধা করলেন। পরে অবশ্য আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে এসে উপস্থিত হন।

মিনতিকে চা জলখাবার দিতে বলে বসার ঘরে এসে দেখি, উঠে দাঁড়িয়েছেন উনি।

আমি অবাক হই।

—বসুন। চা খেয়ে যাবেন।

ভদ্রমহিলা বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

—না না, আমি এখনই যাব। চা খাব না।

আমি জোর করি।

—তা কি হয় ? আমার কাজের লোকটি খুব চটপটে। দেখবেন, এক্ষুনি এসে যাবে চা।

ভদ্রমহিলা বসলেন না। আগের মত অনমনীয় ভঙ্গীতে কথা বলেন তিনি।

—আমি চা খাবনা। জোর করবেন না আপনি।

আমি অপ্রস্তুত বোধ করি। বুঝতে পারি, কোথায়ও একটা মানসিক অসুবিধার ব্যাপার আছে ভদ্রমহিলার। ভদ্রতা আর আন্তরিকতার প্রত্যুত্তরে কোন মানুষ যে এরকম শক্ত কথা বলতে পারে, তা আমার কাছে অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা।

কিন্তু জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা লাভ করেছি। মানুষের আপাত অস্বাভাবিক আচার আচরণের মূল কারণ নিহিত থাকে তার জৈবিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই। সে তথ্য জানা থাকে না বলেই আমরা ক্ষুব্ধ হই, রুষ্ট হই, বিস্মিত হই।

এই মহিলার সঙ্গে স্বল্পক্ষণের আলাপেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এঁর সঙ্গে আচার আচরণে আমাকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

মুহূর্তকাল চিন্তা করে ভেতরে গিয়ে মিনতিকে বারণ করে আসি।

মিনতি অবাক হোল শুনে।

—সে কি, কেন ? চা হয়ে গেছে।

আমি কথা বাড়াতে চাইলাম না।

—উনি খাবেন না। তুই খেয়ে নে।

বাইরের ঘরে এসে দেখি, ভদ্রমহিলা তখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে আশ্বস্ত করার জন্য একটু হাসি।

—বসুন। চা আসছে না।

একটু লজ্জিত হলেন ভদ্রমহিলা। খানিকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীতেই নিজের আপাত অভব্য আচরণের ব্যাখ্যা দিলেন।

—চা আমি বেশি খাইনা। আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিলেন। আমার জন্য কেউ অকারণে ব্যস্ত হয়, তা আমি চাই না।

আমি সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য কথা বলি।

—আপনি তো কাছেই থাকেন। আসবেন মাঝে মাঝে।

—দেখুন, কথা দিতে পারছিনা। আমি খুব ব্যস্ত থাকি।

—আপনি কি চাকরি করেন ?

—না। ছাত্র পড়াই। যা দিনকাল পড়েছে! একটি দুটি ছাত্র পড়িয়ে পেট চালানো যায় না। বেশ কয়েকটি ছাত্রছাত্রী পড়াতে হয় আমায়। সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত ব্যস্ত থাকি তাদের নিয়ে। শনি রবি ছুটি ভোগ করি। তবে পুরোপুরি ছুটির স্বাদ ভোগ করতে পারি না। সব কাজকর্ম তো আমাকেই করতে হয়।

—বিয়ে করেছেন ?

—না।

—বাড়িতে কে আছেন ?

—কেউ না। আমি একা থাকি।

এবার পাল্টা প্রশ্ন করেন আমায় ভদ্রমহিলা।

—আপনি ?

—করেছিলাম। স্বামী মারা গেছেন। ছেলেমেয়ে নেই। একেবারে ঝাড়া হাত পা। আপনার মত।

রহস্যময়ী মোনালিসা হাসি হাসেন ভদ্রমহিলা।

—আমার মত ? আমার মত আপনি কমই পাবেন এ সংসারে।

এ কথার জবাব হয় না। তবু পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য কথা চালিয়ে যাই।

—এক অর্থে, এ সংসারে- আমরা কেউ কারুর মত নই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও, কোন কোন বিষয়ে মিল থাকতে পারে। আমার সংসারে মিনতিকে বাদ দিলে আমি একা। আপনার সংসারেও আপনি একা। আমি সেদিক থেকে মিলের কথা বলেছিলাম।

—আপনার শ্বশুর বাড়ি আর বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ?

—না থাকার মতই। আসলে আমরা দুজনেই পরিবারের অমতে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিলাম। আমাদের দুজনের জাত আলাদা ছিল। আমার বাড়ি, আমার স্বামীর বাড়ির কেউই বিয়েতে রাজী ছিলনা। স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, তখন তার বন্ধু-বান্ধব, আমার বন্ধুবান্ধব কেবল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। তিনি মারা যাওয়ার পর পরিস্থিতি পালটেছে। এখন দুই বাড়ি থেকেই খোঁজখবর করে। তবে সেটা নিতান্তই মৌখিক। আমি যেমন তাদের কাছে কিছু পাবার আশা করি না, তারাও তেমন বুঝে নিয়েছে, আমার কাছে তাদের কিছু পাওয়ার নেই। মৌখিক ভদ্রতা বা সৌজন্যের সীমা ছাড়ায়না তাই আমাদের সম্পর্ক।

—আপনার বাপের বাড়ির সঙ্গেও কি একই রকম সম্পর্ক রয়েছে ? কোন হেরফের নেই ?

আমি হাসি।

—বাহ্যতঃ সত্যিই কোন হেরফের নেই। একদিন তাদের কাছেও ভাল ব্যবহার পাইনি। তবে নিজের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের গাঁটছড়া তো সহজে খোলা যায় না। দুই বাড়ির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক না আবাহন, না বিসর্জনের। দুই বাড়ির অবস্থাই সচ্ছল। তাদের দায়দায়িত্ব বহনের কোন আর্থিক বা নৈতিক চাপ আমাকে তাই সহ্য করতে হয় না।

ভদ্রমহিলাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনেছেন বলে মনে হচ্ছিলনা। ওঁর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, উনি অন্য কথা ভাবছেন। মনে হোল, আমার কথার খেই ধরে হয়ত বা নিজের জীবনের কথাই ভাবছেন।

আবার সেই দুর্বার কৌতূহল পেয়ে বসে আমাকে। ভদ্রমহিলা নিজেই সেই

কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন। খুব অল্প সময়ের আলাপ আমাদের। তার মধ্যেই একাধিকবার তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, তার একটাই অর্থ হয়। আর দশজনের থেকে আলাদা পথে চলেছে তার জীবন।

কিন্তু তার অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর হয়নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন উনি। মানুষের কাছে ধাক্কা খেয়ে কুকুরের দিকে ঝুঁকেছেন, তাদের কাছে মানসিক আশ্রয় বা সান্ত্বনা লাভ করেছেন।

আমি নিজেও পোড় খাওয়া মানুষ। সংসারে, কর্মক্ষেত্রে চলতে ফিরতে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীণ হয়েছি। তবু ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ওঁর মত জীবন সম্পর্কে অতখানি বীতস্পৃহ আমি এখনও হয়ে উঠিনি। মানুষের সম্পর্কে আমার মনে অতখানি তিক্ততার পাহাড়ও গড়ে ওঠেনি।

ভদ্রমহিলা একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের আলাপে তার সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছিল, পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতার পর সেই ধারণা আরও জোরালো হয়েছে। তার জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনার কথা জেনেছি। তার কোমলে কঠোরে ঋজুবক্র স্বভাবের অনেক জটিলতা আমার কাছে বহুপঠিত বইয়ের মত সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে।

একদিনে দুইদিনে তা সম্ভব হয় না। বাসে আকস্মিকভাবে যে আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল, তা যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্য গরজ ছিল আমারই। প্রথম দিকে তেমন সাড়া পাইনি। আমি ওঁর বিরক্তি, ক্রোধ, সন্দেহ, অবহেলা অগ্রাহ্য করেছি। ওঁর সঙ্গে মতান্তর মনান্তরের ধাক্কা সহ্য করে আমার উৎসাহকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

অবশেষে সবুরে যে মেওয়া ফলে, তার প্রমাণ মিলেছে। আপাতরুক্ষ স্বভাবের সেই মহিলাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে। আমি তার বারো ঘর একটি উঠানের বস্তীপ্রতীম ঘরটিতে একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন অভিযান চালিয়েছি। তার এক চিলতে খুপরি ঘরে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার প্রকোপ সহ্য করে তার স্বহস্তে তৈরি চা খাবার খেয়েছি। অবশ্যই বিনা স্বার্থে নয়।

আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওঁর সমস্ত মানসিক প্রতিরোধ ধূলিসাৎ করব। ওঁকে বাধ্য করব আত্মসমর্পণে। আমি পেশায় সাংবাদিক। আমার দৌড় ফীচার লেখা, প্রতিবেদন লেখা এবং পুস্তক সমালোচনা পর্যন্ত। জীবনে কোনদিন গল্প কবিতা লিখিনি। কিন্তু সরস্বতী ঘোষালের কাছে দিনের পর দিন রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে যে কাহিনীর পটচিত্রের আবরণ উন্মোচিত হতে দেখেছি, তার অবিশ্বাস্য চমক আমার মধ্যেও লেখার তাগিদ সৃষ্টি করল।

শিশুবয়সে রূপকথা শুনে বা পড়ে যে রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় বোধ করতাম, সেই এক অনুভূতি বোধ করেছি সরস্বতী ঘোষালের মুখে তার জীবনের বহুবিচিত্র ঘটনাবলীর কথা শুনে। মনে হয়েছে, ওঁর কথা লিখি। সত্য যে কল্পনার চেয়েও

অবিশ্বাস্য হতে পারে, তার প্রামাণিক কাহিনী তুলে ধরি জনসমক্ষে। ভাল হোক্, খারাপ হোক্, একটু মুসাবিদা করে লিখে ফেলিই না সে কাহিনী। কলমের জোরে না হোক্, কাহিনীর নিজস্ব অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের জোরেই তা জনচিত্ত হরণে সক্ষম হতে পারে।

কিন্তু সরস্বতী ঘোষালের থেকে সে কাহিনী সুরু করে অসুবিধা বোধ করেছি। মনে হয়েছে, এ কাহিনীর সুরু আরও অনেক আগে থেকে করলে ভাল হবে। পারিবারিক যে ঐতিহ্যের বলি হয়ে আজ সরস্বতী ঘোষাল তার ভাষায় 'রাজকন্যা থেকে ঘুঁটেকুড়নী''-তে রূপান্তরিত হয়েছে, তার ছবিটি তুলে না ধরলে সমস্ত কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না।

আমি তাই ওঁর বাবার সম্পর্কে, ওঁর ঠাকুর্দার সম্পর্কে, ওঁর পরিবারের অন্যান্য মানুষজনের সম্পর্কে বারে বারে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছি অনেক তথ্য।

সরস্বতী ঘোষাল নিজেও অনেক কিছু ভালভাবে জানে না। সে তার মায়ের কাছে, পিসিদের কাছে, এমনকি অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেও অনেক কিছু শুনেছে। তার কানে এসেছে অনেক কথা। তার পরিবারের অতীত ইতিহাসের অনেক কিছু তার কাছেও রহস্যময় ঠেকেছে। তবু সে যতটুকু জানে, ততটুকু জানাতে দ্বিধা করেনি।

আমাদের সম্পর্ক 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়িই। আমার সম্পর্কে সরস্বতী ঘোষালের মনের অনেক সন্দেহ, কুণ্ঠা আর দ্বিধা চলে গিয়েছিল। পরিবারের এমন সব গোপনীয় ঘটনা সে আমাকে জানিয়েছিল, যা সচরাচর লোকে অত অল্প সময়ের পরিচয়ে কোন ব্যক্তির কাছে অতখানি অনাবৃত করে তুলে ধরে না।

বিশ শতকের কলকাতা শহরের বুকে এমন সব ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। লিখতে গিয়ে নিজেরই সন্দেহ হয়েছে। কতবার লিখেছি, কতবার তা বাতিল করেছি।

সরস্বতী ঘোষাল যেভাবে আমার কাছে তার কাহিনী বিবৃত করেছিল, সেভাবে সেই কাহিনী লিখে উপস্থাপন করা যেত। কিন্তু ভেবে দেখেছি, সরস্বতী ঘোষালের কাহিনী কোন বিচ্ছিন্ন কাহিনী নয়। চারিত্রিক ভূমিকার সঙ্গে পারিবারিক ইতিহাস, বংশমর্যাদা, ধনগরিমা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সেগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপন না করলে এ কাহিনীর সারবস্তুটি বাদ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

পারিবারিক রমরমার মুহূর্তগুলির সাক্ষী বলতে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাই সরস্বতী ঘোষালের মুখে শোনা ইতিবৃত্তের সঙ্গে নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ধারণার মিশ্রণ জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

সরস্বতী ঘোষালের সময় থেকে যে কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে, তার মধ্যে কল্পনার মিশেল প্রায় নেই বললেই চলে। সুরুতে যা ছিল শুধু শোনার কৌতূহল,

কিংবা জানার আগ্রহ, পরে সেটিই কখন যে লেখার আগ্রহে রূপান্তরিত হচ্ছে, তা আমি নিজেই খেয়াল করিনি।

সরস্বতীকে প্রথমে আমি লিখব বলে বলিনি। পরে যখন লেখার তাগিদ বোধ করেছি, তখন তাকে খোলাখুলিভাবে সেকথা জানিয়েছি। তার কাছে অনুমতি চেয়েছি। আশ্চর্যের কথা, সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় সে তার অনুমতি দিয়েছে।

তার ভাবে ভঙ্গীতে বুঝেছি, সে যেন কিছুটা উল্লসিত বোধ করছে তার কাহিনী লেখা হবে বলে। পরে লেখা যখন পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার পারিবারিক ইতিহাস যে এভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে তার খারাপ লাগবে না তো? জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল সরস্বতী। বলেছিল, তার পরিবারের লোকগুলির সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ বোধ করে না সে। তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হলে খুশিই হবে।

যে লোকগুলির জন্য তার জীবন আজ এভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলেছে, তারা দেখুক, তাদের কথা সরস্বতী জানিয়ে দিয়েছে অন্যদের। দীর্ঘদিন ধরে এই লোক-গুলির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে আসছে সে। তা যে অবশেষে চরিতার্থ হতে চলেছে, তাতে অখুশি হবে কেন?

জবাব শুনে বিস্মিত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, সরস্বতী ঘোষাল তার পরিবারের সম্পর্কে যতই বীতস্পৃহ হোক্ না কেন, সেই পরিবারের উত্তরাধিকার সে বহন করছে তার মানসিকতার মধ্যে, তার চরিত্রের মধ্যে।

তার আপনজন তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ঠিকই। কিন্তু পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও ঔদাসীন্যের ভাগ ঠিক আদায় করে নিয়েছে তার চরিত্র, তার মানসিকতা।

কিন্তু না, তার চরিত্রের বিশ্লেষণ আমি করব না। তা করবে পাঠক। আমি শুধু তার মুখে বেশ কিছুদিন ধরে শোনা কাহিনী যথাসাধ্য আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব। বাদবাকি দায়িত্ব পাঠকের।

তার আগে পাঠককে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কাহিনী সুরু হচ্ছে দিব্যনারায়ণ ঘোষালের যৌবনকাল থেকে। দিব্যনারায়ণ ঘোষাল সরস্বতী ঘোষালের বাবা। সরস্বতী ঘোষালের কাছে যে কাহিনী শুনেছি, তার মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক ফাঁক পেয়েছি। বহু ঘটনাই রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। আমার পক্ষেও সম্ভব হয়নি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার। তবু সাধ্যমত নিজের জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে কাহিনীর সেই ফাঁক আমাকে পূরণ করতে হয়েছে। কতখানি পেরেছি, তা বলবেন পাঠক। তার রায় নতমস্তকে মেনে নেবে এই অক্ষম লেখক—লেখা যার পেশা নয়।

॥ এক ॥

দিব্যনারায়ণ ঘোষাল দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। তার চোখ মাঝেমাঝেই বিচরণ করছিল ঊর্ধ্বে আকাশের বুকে। ঘন মেঘের সমারোহ সারা আকাশ জুড়ে। মাঝে মাঝে চিলিক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরে পরেই শোনা যাচ্ছে বজ্রনির্ঘোষের শরীর কাঁপানো আওয়াজ।

শরীরে মনে বিচিত্র এক অস্বস্তি বোধ করছিলেন দিব্যনারায়ণ। ঘনমেঘের ঘটা দেখে উল্লসিত হবার মত মানসিকতা বা মেজাজ কোনটাই তার ছিলনা। মাস খানিক আগে "মনোমোহিনী" ও "বিশ্ববন্ধু" নামে দুটি জাহাজে মসলাপাতি, তেল, চাল, ডাল, ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লণ্ডনের উদ্দেশে। এর মধ্যে জাহাজগুলির পৌছে যাওয়ার কথা বন্দরে। বাণিজ্য শেষ করে ফিরে আসার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন খবরাখবর পেঁছয়নি।

গত রাত্রে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল দিব্যনারায়ণের। স্বপ্নটার খুঁটিনাটি মনে নেই। কিন্তু এলোমেলোভাবে মনে পড়ছিল অথৈ সমুদ্রের কথা, বিরাট বাজপাখীর কথা, একটা ভাঙ্গা জাহাজের কথা, কতগুলি শবদেহের কথা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তার প্রথমা স্ত্রী, যাকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন— তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়েছিলেন স্বপ্নে। তার প্রথমা স্ত্রী বিনোদিনী মাঝসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। জলের থেকে তার মুখ বার করে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে আর্ত্তরব তুলছিল। কিন্তু দিব্যনারায়ণ তাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যাননি। তিনি তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, বিনোদিনী ডুবে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। দারুণ দুশ্চিন্তা, অস্বস্তি আর অপরাধবোধ অনুভব করে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন দিব্যনারায়ণ। ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রথমে তার সব কিছু জোড়া দিতে অসুবিধা হয়েছিল। তিনি কোথায়, তাও যেন মনে করতে পারছিলেন না।

এক মুহূর্ত পরে চেতনার সেই বিহবলতা কাটিয়ে উঠে হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন মাথার বালিশ, পাশ বালিশ, চাদর, খাটের মাথা ইত্যাদি। মুহূর্তের জন্য স্বপ্নের জগৎকে বাস্তব জগৎ বলে মনে হয়েছিল। পনর বছরের বিনোদিনীর মুখটা এত স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন স্বপ্নে যে, ঘুম ভাঙ্গার পরও তার মুখটা জ্বলজ্বল করছিল চোখের সামনে।

গত চার বছর ধরে বিনোদিনীর সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ নেই। কয়েক মাস আগে তার মৃত্যু সংবাদ কানে এসেছিল। বেঁচে থাকলে বিনোদিনীর বয়স এখন

উনিশ হওয়ার কথা। তার চেহারার অবশ্যই অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু সেই বিনোদিনীকে তিনি দেখেননি। স্বপ্নে চার বছর আগের বিনোদিনীর মুখই তার সামনে ভেসে উঠেছিল। সেই মুখে কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি।

কিন্তু বিনোদিনী হঠাৎ তার স্বপ্নে হানা দিল কেন? তিনি তো তাকে পরিত্যাগ করেছেন। বাবার অবাধ্য হওয়ার সাহস হয়নি বলে কৃষ্ণা বিনোদিনীকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় তাকে দেখে হতাশ হয়েছেন। কল্পনায় যে সুন্দরী রাজকন্যাকে পাবার স্বপ্ন লালন করেছেন, তার পরিবর্তে অতি সাধারণ চেহারার কৃষ্ণা বিনোদিনীকে বধূবেশে চোখের সামনে দেখে তার যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল।

বাবার কেন তাকে ভালো লেগেছিল, তিনি জানেন না। তিনি শুনেছিলেন, তার বউ খুব সুন্দরী নয়। তাই বলে এতখানি সাধারণ চেহারা হবে, তা তিনি ভাবতেই পারেননি। ইতিপূর্বে তার দাদার বিয়ে হয়েছিল যে মেয়ের সঙ্গে, তার চেহারা যথেষ্ট সুন্দর। বাবা তার জন্য কেন ওরকম নিকৃষ্ট চেহারার মেয়ে মনোনীত করেছিলেন, তা আজও ভেবে পাননা দিব্যনারায়ণ।

বিয়ের সময় তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস হয়নি। মনে যা-ই থাক, মুখে বুজে মেনে নিয়েছিলেন সব কিছু। বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। স্ত্রীর সঙ্গে সহজ হতে পারেননি।

স্ত্রী যে তাকে খুবই ভালোবাসত, তা বুঝতে পারতেন দিব্যনারায়ণ। তাকে প্রায় দেবতা জ্ঞানে এক রকম পুজো করত সে। তিনি কিন্তু পারতপক্ষে বিনা প্রয়োজনে তার সঙ্গে বাক্যালাপও করতে চাইতেন না।

তার কিশোরী বধূ সেধে সেধে অযাচিতভাবে তার সঙ্গে কথা বলত। প্রয়োজনের জিনিষগুলি তার কাছে এগিয়ে দিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাত্রে শোবার পূর্বে ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করত। তার ব্যবহারে কোন ত্রুটি পাননি দিব্যনারায়ণ।

বাড়ির সকলেই তার গুণমুগ্ধ ছিল। বাবা মেজ বৌমা বলতে একেবারে অজ্ঞান ছিলেন। তবু দিব্যনারায়ণ অবাঞ্ছিত মনে করে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাকে।

দিব্যনারায়ণের যখন বাইশ বৎসর বয়স, তখন তার বাবা লিভার ক্যানসারে মারা যান। অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন তিনি। সাহেব সুবোদের সঙ্গে কাজকারবার। সিটিংভোরদের শুচিবায়ুগ্রস্ত হলে চলে না। সাহেবদের আপ্যায়নের জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকত।

বিশাল তিন মহলা বাড়িতে তার জন্য আলাদা হলঘর ছিল। নিজেরা সঙ্গ না দিলে আপ্যায়ন যথাযথ হতে পারে না। সেই কারণে মদ্যপানের যে রেওয়াজ সুরু হয়েছিল, তা পরে মাত্রাতিরিক্ত নেশার মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।

দিব্যনারায়ণের বাবার আমল থেকে বাড়িতে মদ্যপানের যে হাওয়া বয়েছিল, তা

তার তিনটি ছেলেকেও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দিব্যনারায়ণের দাদা আদিত্যনারায়ণ মদ্যপানে বাবাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর যখন অশৌচ চলছে, তখনও মদ্যপান বন্ধ করেননি। শ্রাদ্ধের পূর্বদিন একভাবে মদ্যপান করতে করতে লিভার ফেটে মারা যান তিনি। ছোট ভাই রুদ্রনারায়ণেরও মদ্যপানে অনাসক্তি ছিল না।

বাবা পুত্রদের পানাসক্তির কথা বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু মদ্যপান, বাইজী নাচ, ইত্যাদি জমিদার বাড়ির সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। সেসব ব্যাপারে পুত্রদের ওপর অভিভাবকত্ব ফলানোর কোন চেষ্টা তিনি করেননি।

তবে বিয়ে জিনিষটা পরিবারের কাছে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য হোত না। ওটা ছিল পারিবারিক ব্যাপার। পরিবারের ঐতিহ্য, ভালমন্দ, সুখদুঃখের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করে দেখা হোত। তার বাবা তাই নিজের জীবদ্দশায় বড় ও মেজ দুটি পুত্রের বিবাহই নিজের পছন্দমত পাত্রীর সঙ্গে দিয়েছিলেন। পুত্রদের মতামতের ধার ধারেননি। ছোট রুদ্রনারায়ণের বিবাহ অবশ্য অনেক পরে হয়। তখন তার বাবা জীবিত ছিলেন না।

দিব্যনারায়ণ বিবাহের ব্যাপারে বাবার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানাতে পারেন নি। তার প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছিল তার আচরণের মধ্যে। স্ত্রীর সঙ্গে শীতল নিস্পৃহ ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রতিবাদ।

বাড়ির সকলেই সেটা বুঝত। বাবা একাধিকবার দিব্যনারায়ণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। দিব্যনারায়ণ নীরবে শক্ত মুখে শুনে গিয়েছেন। তার আচরণে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।

শান্ত, সুশীল স্বভাবের স্ত্রীটির জন্য তার মনে কখনই করুণার উদ্রেক হয়নি, একথা বলা যাবে না। কিন্তু কালো রঙের অতিসাধারণ মেয়েটিকে কিছুতেই যেন স্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে পারতেন না তিনি। অনেক সময়েই তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠত। মনে হোত, যাকে দাসী হিসাবে মানায়, তাকে জবরদস্তি করে তার স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বাবা মারা যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই দিব্যনারায়ণ স্ত্রীকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে পিত্রালয়ে দিয়ে আসেন। তার কিশোরী বধূ ছলছল চোখে তাকে বারবার প্রশ্ন করেছিল—'তুমি আমায় শিগগির এসে নিয়ে যাবে তো?' হয়ত বা তার নিষ্পাপ মনে ভবিষ্যতের ছবিটা ধরা পড়েছিল।

দিব্যনারায়ণ ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

—তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমাকে তো জলে ফেলে যাচ্ছিনা? ভাবছ কেন?

শ্বশুর বাড়ির সকলের প্রশ্নও চালাকি করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সেই ঘটনার পরে আর দ্বিতীয় দিন শ্বশুরবাড়ি যাননি দিব্যনারায়ণ। স্ত্রীর কোন খোঁজখবরও করেননি আর। অন্যদেরও বারণ করে দিয়েছিলেন খোঁজখবর

করতে। তার স্ত্রীকে সকলেই খুব ভালবাসত। গোপনে কেউ যদি খবরাখবর নিয়ে থাকে, সেকথা আলাদা। সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

কয়েক মাস পর শ্বশুর বাড়ি থেকে তাগাদা এসেছিল স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দিব্যনারায়ণ জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্ত্রীকে তিনি গ্রহণ করবেন না। তবে তার ভরণপোষণের জন্য অর্থ পাঠাতে তিনি অরাজী নন। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই প্রস্তাব।

কয়েক মাস পূর্বে লোকমুখে বিনোদিনী শয্যাগত বলে খবর পান। তিনি শুনেছিলেন, বিনোদিনী তাকে দেখতে চেয়েছিল শেষবারের মত। তিনি মমতা অনুভব করেছিলেন। ভেবেছিলেন, একবার যাওয়া বৈ তো নয়! যাকে বিনা দোষে অন্যায়ভাবে পরিত্যাগ করেছেন, তার শেষ ইচ্ছাটুকু কেন পূরণ করবেন না?

শেষ পর্যন্ত তার সাহস হয়নি। বিনোদিনীকে পিত্রালয়ে দিয়ে আসার কয়েক মাস পরে নিজে দেখে শুনে পরমাসুন্দরীএক কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন তিনি। আগুনের মত অত্যাশ্চর্য সেই রূপসী তার প্রাণপ্রতিমা। তাকে দেখলে দিব্যনারায়ণের বুকের রক্ত ঝলকে ওঠে। বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করার কোন গ্লানি বাসা বাঁধতে পারেনা তার বুকে। বরং সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে গভীর এক স্বস্তিবোধ।

মাঝে মাঝে বিনোদিনীর মুখ তাকে কাঁটার খোচা দিয়েছে—হয়ত মনের অতলে অপরাধবোধের কোন তলানি থেকে গিয়েছিল। সেজন্যই বিনোদিনীর মৃত্যুসংবাদে কষ্টের সঙ্গে গভীর স্বস্তিও যেন বোধ করেছিলেন।

শুধু একটাই আফশোস ছিল তার। মেয়েটা কেন তাকে এত ভালবেসেছিল? তিনি শুনেছিলেন, বিনোদিনীর বুকের অসুখের কারণ তার দ্বিতীয় বিবাহ। বিনোদিনী নাকি ভাবতেই পারেনি, স্বামী তার জীবদ্দশায় আর এক জনকে বিবাহ করবে। প্রতিদান না পেয়েও বোকা মেয়েটা পাগলের মত ভালবাসত তাকে।

এসব খবর হাওয়ায় ভেসে আসে। অনেকে ইচ্ছা করেই কৌশলে এসব খবর শুনিয়ে যায়। তিনি বোঝেন, বিনোদিনীর প্রতি মমতা বশতঃ যতটা নয়, তার থেকে অনেক বেশি তার প্রতি আক্রোশ বশতঃ এসব খবর স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে দিয়ে যায় লোকে। অতঃপর সেসবের অনেকটাই বন্ধ হবে ভেবে, আর তাকে জোর করে কেউ অপরাধী বানাতে পারবেনা ভেবে, স্বস্তি পেয়েছিলেন তিনি।

দিব্যনারায়ণ ভেবে পাচ্ছিলেন না, কেন বিনোদিনীকে স্বপ্নে ওভাবে দেখলেন? স্বপ্নটার রেশ তিনি মুছে ফেলতে পারছিলেন না।

জোর করে সেটি কাটাবার জন্য পার্শ্ববর্তিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। শয্যাপার্শ্ব শূন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, স্ত্রী ঘরে এল। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, বাথরুমে গিয়েছিল সে।

রসিকতা করলেন দিব্যনারায়ণ।

—কি ব্যাপার? রাত থাকতে বাথরুমে যাওয়ার অভ্যাস করছ যে? সারদা মা শুনেছি—

স্ত্রী হকচকিয়ে গেল।

—না তো! রোজ তো আমি এ সময়ে—

প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন দিব্যনারায়ণ। স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেন, কথাটা তিনি একেবারে বেখেয়ালে বলেননি।

—রোজ না হতে পারে। সে আমি জানি না। ঘুমিয়ে থাকি যে। কিন্তু কয়েক দিন শেষরাতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর, তোমাকে বিছানায় দেখতে পাইনি, বিদ্যুৎপ্রভা।

নিজের ভেতরের অস্বস্তিকে তাড়াবার জন্য ইচ্ছা করে রসিকতা করছিলেন দিব্যনারায়ণ। নয় তো সাধারণ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আবার কথা চালাচালি করে নাকি কেউ? কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভা ভীষণ থতমত খেয়ে গেল। দেখে মজা পেলেন দিব্যনারায়ণ।

—ছেলেমানুষ আর কাকে বলে? এত ভয় পাওয়ার কি আছে? আর লজ্জারই বা কি আছে? স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার! প্রয়োজন আবার সময় অসময় মানে নাকি?

আর কথা বাড়াননি তিনি। স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন। অনেক আদর করেছিলেন তাকে।

—আমার সোনা বউ। আমার মিষ্টি বউ। তুমি আমাকে চিরকাল ভালবাসবে তো?

স্বামীর বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বিদ্যুৎপ্রভা। কোন জবাব ছিলনা তার মুখে।

সারা দিন আর কিছু মনে হয়নি দিব্যনারায়ণের। অফিসে গিয়েছেন, কাজকর্ম করেছেন। জাহাজের সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে জলপানাদি সেরে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের ব্যবসার কথা ভাবছিলেন। তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল স্বপ্নটার কথা। তার মনটা কেমন কু গাইছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, খুব বিপদ ঘনিয়ে আসছে। স্বপ্নটার মধ্যে সেরকম একটা ইঙ্গিত ছিল যেন।

এখনও পর্যন্ত স্টিভেডোরের ব্যবসায়ে যথেষ্টই রমরমা চলছে। বিদেশের বহু বন্দরে তার পাঠানো পণ্য খালাস হয়। আজ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন অভিযোগ আসেনি। কিংবা কেউ তাকে বাতিল করেনি।

ডালহাউসি পাড়ায় তার অফিসে জনা দশ বারো কাজ করে। কর্মচারীরা সকলেই বিশ্বস্ত, দক্ষ ও পুরনো। ব্যক্তিগতভাবে সব কিছু দেখাশোনা করেন তিনি নিজে। রুদ্রনারায়ণ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বড় বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে থেকে ডাল, তেল, মসলাপাতি নানা পণ্যসম্ভার খরিদ করে থাকেন তিনি নিয়মিতভাবে। তারা তাকে খাতির করে। ভাল জিনিষ ন্যায্য মূল্যে পান তাদের কাছে। বিদেশের বাজারে বেইজ্জত হতে হয় না।

তবু তার মনটা বড় উচাটন হচ্ছে। স্বপ্নটা পরিষ্কারভাবে মনে গেঁথে রয়েছে। ভাঙ্গা জাহাজ, উত্তাল অথৈ সমুদ্র, বিশাল বাজপাখী, সর্বোপরি বিনোদিনীর জলমগ্ন শরীর, তার অসহায় আর্ত চিৎকার, মন থেকে কোনমতেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

আর দশজনের তুলনায় অনেকখানি শক্ত মনের মানুষ তিনি। তবু ব্যবসা বড় গোলমেলে জিনিষ। নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দেয় না। মুহূর্তের মধ্যে কত রকমের অঘটন ঘটে যেতে পারে। ফকির রাজা হয়, আবার রাজারও ফকির হতে দেরি হয় না। ভয়টা সেই কারণেই।

তার বাবা কঠোর পরিশ্রমে এই রমরমা ব্যবসা তৈরি করে দিয়েছেন। দিব্যনারায়ণ নিজেও খুব অল্প বয়স থেকে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। অনেক অন্ধিসন্ধি, অলিগলি বুঝে গিয়েছেন তিনি এই কয়েক বছরেই। বাবা ও দাদার মৃত্যুর পর বাবার হাতে তৈরি ব্যবসা হালে পানি দিতে হয়েছে তাকে। তিনিই হয়েছেন তার কর্ণধার।

কর্মচারীরা বাবার আমলের। তাদের ওপর নির্ভর করা যায়। তাদের বিশ্বস্ততায় কোন খাদ নেই। তবু শেয়ারের ওঠা নামা, বাজারের অবস্থা ইত্যাদি মাঝে মাঝেই তাকে ভাবিয়ে তোলে। তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

ব্যবসায়িক চিন্তা ও উদ্বেগ যৌবনের অপচয় ঘটায়। যুবককে বৃদ্ধ করে তোলে। অবশ্য উল্টোটা ঘটাও সম্ভব। আজ অফিসে এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছেন, সেও চিন্তিত। তাকে স্বপ্নের কথা বলেননি। কাকে কতটুকু বলতে হবে, সে বিষয়ে অল্প বয়স থেকেই তার জ্ঞান খুব টনটনে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দিব্যনারায়ণ সেসব কথাই ভাবছিলেন। একটু পরে বৃষ্টি সুরু হোল। দক্ষিণের বারান্দা পেরিয়ে উত্তরের বারান্দার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণের ঘরের দিকে। একটা বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার।

বারান্দার বড় বড় থামের আড়ালে ওদিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কয়েক পা এগোবার পর হঠাৎ দিব্যনারায়ণের চোখ পড়ল রুদ্রনারায়ণের ঘরের দিকে। একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে ওদিকের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেল।

অন্ধকারে পেছন থেকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিলনা। স্ত্রীলোকটিকে দেখবার জন্য দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলেন না। থামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

খানিকটা বিস্মিত ও চিন্তিত ভাবে আবার পিছু হঠে রুদ্রনারায়ণের ঘরে

ঢোকেন তিনি। একবার ভাবলেন, ভাইকে জিজ্ঞাসা করবেন, এই সন্ধ্যাবেলায় কে তার ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু সংকোচ বোধ করলেন দিব্যনারায়ণ।

অজান্তেই তার চোখ পড়ল খাটের ওপর। একটু এলোমেলো হয়ে রয়েছে চাদর। তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। একটু জরীপ করার ইচ্ছা ছিল। নিজের সেই ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করলেন। যদি তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলেও লাভটা কি হবে? তিনি কিভাবে তার প্রতিকার করবেন?

বয়সে ছোট রুদ্রনারায়ণ। তার সঙ্গে নারীঘটিত বিষয়ে কথা বলবেন কি করে? তবে লক্ষ্য রাখতে হবে। দাসী বা আশ্রিতা কারুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে পারিবারিক সুনাম হানির সম্ভাবনা।

এই অঞ্চলে মান্যগণ্য তিনটি ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্যতম তাদের ঘোষাল পরিবার। বাবা ও দাদার অবর্তমানে ঘোষাল পরিবারের পুরুষ অভিভাবক তিনিই। বয়সে তিনি নবীন হতে পারেন। কিন্তু দায়িত্ববোধ বা পরিবারের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, সুনাম দুর্নামের চিন্তাভাবনা এড়িয়ে যাবেন কিভাবে? কিছু অঘটন ঘটলে তাকেই দিতে হবে গুণগার।

ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর। পরিবারের সকলের দিকে তাই নজর দিতে পারছেন না। তার বাবা বা দাদা জীবিত থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হোত। দায়িত্ব সকলের মধ্যে সমভাবে ভাগ হোত।

অজান্তেই তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়।

রুদ্রনারায়ণ একটু অবাক হয়ে দাদাকে প্রশ্ন করেন—'কিছু বলবে আমায়, মেজদা?'

নিজের ভেতরে উত্তাল হয়ে ওঠা জিজ্ঞাসা দমন করে শান্তভাবে জবাব দিলেন দিব্যনারায়ণ।

—হাঁ। ব্যবসাপত্র নিয়ে বড়ই চিন্তায় আছি। জাহাজগুলো ঠিকমত মাল খালাস করল কিনা, ভাবছি। কোন খবরাখবর পাচ্ছিনা।

রুদ্রনারায়ণ নির্বাক থেকে শুনে যান। কোন মন্তব্য করেন না।

দিব্যনারায়ণ বিরক্ত হন।

—আমি একা কত বিষয়ে ভাবব, বলতে পার? তোমারও তো দায়িত্ব আছে, না কি? তুমি যদি একটু মাথা ঘামাতে—

রুদ্রনারায়ণ কিছু বলার আগেই অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান দিব্যনারায়ণ। ঘরে আলো জ্বলছেনা দেখে অবাক হন তিনি। আলোটা জ্বেলে দিতেই তার চোখে পড়ল, বিদ্যুৎপ্রভা চোখ ঢেকে শুয়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়েছে কিনা, বোঝা গেলনা। অসময়ে স্ত্রীকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে চিন্তিত হলেন দিব্যনারায়ণ। অসুখ বিসুখ করল না তো?

প্রথমা স্ত্রীকে একদিনের জন্যও যে ভালবাসা তিনি দিতে পারেননি, দ্বিতীয়া

স্ত্রীকে তা শতগুণে সহস্রগুণে ঢেলে দিয়েছেন। এই রূপসী স্ত্রীর দিকে তাকালে তার নেশা ধরে যায়। তার গোপন ঐশ্বর্য এই রমণী। মনে মনে প্রচণ্ড গর্ব বোধ করেন দিব্যনারায়ণ এই স্ত্রীর জন্য। দুনিয়ায় আর কয়জনের ঘরে এমন অপ্সরা সুন্দরী স্ত্রী আছে, তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি বোঝেন, এই নারীর সৌন্দর্যের আগুনে বহু পুরুষকেই পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে হবে।

কিন্তু—মনে মনে হাসেন দিব্যনারায়ণ। বঙ্গবধূ, তাই রক্ষা। স্বামী শ্বশুরের ঘরে অন্তঃপুরে জীবন কেটে যাবে। পরপুরুষের একে দর্শনের সৌভাগ্য হবে না, সেটাই যা বাঁচোয়া। নাহলে দ্বিতীয়বার লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যেত।

বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। স্ত্রীর কাছে বসে অপলকে তাকে দেখতে থাকেন। চোখ খোলেনা তার স্ত্রী। তার পদ্মপলাশ চোখ দুটি দেখতে পাননা তিনি। কিন্তু তার আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, তার নিটোল সুঠাম কপোল, তার তিলফুলনিন্দিত নাসা, তার রক্তাভ উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, পাতলা রক্তবর্ণ ওষ্ঠের বঙ্কিম ছন্দ, সুগোল নিটোল দুটি হাত, অনবদ্য লোভনীয় শরীর ও সর্বোপরি মসৃণ ত্বকের উজ্জ্বলতা ও চেকনাই দেখে বিভোর হয়ে যান দিব্যনারায়ণ।

ঈশ্বর! আমার মত ভাগ্যবান পুরুষ কয় জন আছে? এই রমণীরত্ন যার ঘরে আছে, দুনিয়ার আর কোন্ রত্নে তার আসক্তি থাকবে? বিনোদিনীকে ত্যাগ না করলে এই রত্ন কি লাভ হোত?

স্ত্রীর হাত চোখ থেকে সরিয়ে দিলেন দিব্যনারায়ণ।

—শরীর খারাপ লাগছে, বিদ্যুৎপ্রভা?

চেষ্টা করে একটু হাসল বিদ্যুৎপ্রভা।

—কেমন গা ম্যাজম্যাজ করছে। মনে হচ্ছে, জ্বর আসবে।

দিব্যনারায়ণ উতলা বোধ করেন। স্ত্রীর গলায় কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করেন।

—হাঁ, একটু গরম লাগছে। তুমি উঠোনা। শুয়ে থাক। একটু সাবধান থাকলে ঠিক হয়ে যাবে শরীর। আজ রাত্রে ভাত খেয়ো না।

বিদ্যুৎপ্রভা কিছু বলল না। চুপচাপ আগের ভঙ্গীতেই শুয়েরইল। দিব্যনারায়ণ আরও কিছুক্ষণ বসে থাকেন স্ত্রীর কাছে। অপলকে দেখতে থাকেন আগের মতই। তার বৌদি এই ভার্যাপ্রীতি খুব ভাল চোখে দেখেন না। দিব্যনারায়ণের কানে অনেক কথাই আসে। তিনি শুনেছেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলেই বিদ্যুৎপ্রভার নাকি এত কদর।

বিদ্যুৎপ্রভা নিজেও তার কাছে তা নিয়ে নালিশ করেছে। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

—বলুক যার যা খুশি। তোমার তাতে কি? সকলে তোমায় হিংসে করে স্বামী সোহাগিনী বলে। তোমার তো গর্ব হবার কথা!

একটু থেমে পরক্ষণেই সগর্বে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

—আমাকেও তো অনেকে হিংসা করে। তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছি বলে। আমার তো ভালই লাগে ওদের ঐ হিংসাটুকু। ভাগ্যকে আমি বারবার ধন্যবাদ দিই তার জন্য।

উঠে বসল বিদ্যুৎপ্রভা। ভাল করে তাকে লক্ষ্য করলেন দিব্যনারায়ণ। একটু চনমনে, অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে যেন। কিছু কি হয়েছে? কেউ কি কিছু বলেছে বিদ্যুৎপ্রভাকে?

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকাটা শোভন দেখাবেনা। পরে কারণটা জিজ্ঞাসা করবেন ভেবে উঠে দাঁড়ালেন দিব্যনারায়ণ।

স্ত্রীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে নিজের অপার ভালবাসা ব্যক্ত করেন তিনি।

—তোমার ওঠার দরকার নেই। কাজের লোক অনেক আছে। তারাই সব সামলাবে। আমি রামুর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও তোমার দেখাশোনা করবে।

দিব্যনারায়ণ চলে গেলেন বন্ধুর বাড়ি। পাড়ার আরেক মানী পরিবার সান্যালদের বাড়ি। তাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব রয়েছে সান্যাল আর রায়েদের পরিবারের সঙ্গে। সান্যালরা তাদের আগেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের মলমের ব্যবসা খুবই রমরমা। খুব দীনদরিদ্র অবস্থা থেকে সুরু করে আজ প্রভূত অর্থৈশ্বর্যের মালিক হয়ে বসেছে সান্যালরা। আরেক মানী পরিবার হোল রায়েদের পরিবার।

এই তিনটি পরিবারের মধ্যে যথেষ্টই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। উৎসবে পার্বনে এক পরিবার অন্য পরিবারকে আমন্ত্রণ জানায়, আপ্যায়ন করে। ঘোষালদের বাড়ি হয় জগদ্ধাত্রী পুজো, রায়েদের বাড়ি দুর্গাপুজো আর সান্যালদের বাড়ি হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। দুঃখের দিনেও এক পরিবার অন্য পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়।

নিজেদের কৌলিন্য আর আভিজাত্য সম্বন্ধে তিনটি পরিবারই অত্যন্ত বেশি রকমের সচেতন। পাড়ার অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা নেই। উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী হিসাবে অনেকেই আমন্ত্রিত হয়, তবে তাদের সমকক্ষ বলে গণ্য করা হয় না। তাদের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে একটা পার্থক্য বজায় রাখা হয়।

কৌলিন্যবোধের ব্যাপারে ঘোষাল পরিবারের উন্নাসিকতা সবচেয়ে বেশি। সান্যালরা ব্যবসাসূত্রে ও রায়রা চাকরিসূত্রে অর্থসম্পদের মালিক হয়ে বসেছে। জমিদারি রয়েছে একমাত্র ঘোষালদের।

দিব্যনারায়ণের পিতামহ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল অনেকগুলি ইঁটভাঁটির মালিক ছিলেন। তাছাড়াও তার ছিল বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে জমিদারি। দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, বরানগর, আলমবাজার ও সিঁথি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার এলাকা। একদিকে ইঁটভাঁটি, অন্য দিকে এস্টেটের খাজনা বাবত প্রভূত অর্থসম্পদের অধিকারী হন তিনি।

তার দুই ছেলে ভূপতি ঘোষাল ও ত্রিভুবন ঘোষাল স্বভাবে চরিত্রে পুরোপুরি

বিপরীত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভূপতি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। মদ ও মেয়েমানুষে প্রচণ্ড আসক্তি ছিল তার। বিলাসব্যসনে পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কলকাতার এক বিশিষ্ট রাজ পরিবারের বউকে নিয়ে পালিয়ে যান পরে। তার আর কোন হদিশ মেলেনি। এক রকম নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে দেখা গেল, বহু লক্ষ টাকার ঋণ রেখে গিয়েছেন তিনি।

ঋণশোধের জন্য "রিচার্ডসন এণ্ড উইলিয়াম" বলে এক জাহাজ কোম্পানির অফিসে কেরানীর কাজ নিতে বাধ্য হন তার ছোট ভাই ত্রিভুবন ঘোষাল—দিব্যনারায়ণের পিতা। বেশিদূর পড়াশোনা করেননি তিনি। কিন্তু হাতের লেখাটি ছিল চমৎকার। এক রকম তার হাতের লেখা দেখেই তাকে চাকরি দেন বড় সাহেব উইলিয়াম। পরে কাজের দক্ষতার জন্য সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সাহেব নিজে একদিন তাকে ডেকে বলেন—"ত্রিভুবন বাবু, তোমাকে আর সামান্য ক্লার্কের কাজ করতে হবে না। তুমি বরং মাল সরবরাহ কর আমার কোম্পানিতে। আমার ধারণা, ব্যবসায়ে নামলে তোমার উন্নতি অবধারিত।"

তখন সারা বিশ্বের বন্দরে বন্দরে মাল যেত স্ট্র্যাণ্ড রোডের ঐ জাহাজ কোম্পানি থেকে। রাশিয়া, চীন, জাপান, আমেরিকা, লণ্ডন প্রভৃতি দেশের বন্দরে জাহাজে করে নুন, তেল, মসলাপাতি, ঘি ইত্যাদি চালান যেত।

পরে এই ব্যবসায়ে অগাধ টাকার মালিক হয়ে বসেন ত্রিভুবন ঘোষাল। "মনোমোহিনী" ও "বিশ্ববন্ধু" নামে দুটি জাহাজ কেনেন। সেই জাহাজে সারা বিশ্বে মাল সরবরাহ করা হোত। দাদার চল্লিশ লক্ষ টাকার ঋণ অনায়াসে শোধ করেন।

শুধু তাই নয়। মহালের পর মহাল কিনে বাবার জমিদারির সীমানা বিস্তৃত করেন। অত্যন্ত দানশীল স্বভাবের ছিলেন ত্রিভুবন ঘোষাল। প্রার্থীরা কেউ তার কাছে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না। দাদার ঋণ শোধ ছাড়াও তার মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। সেই মেয়ে দুটি মেয়ে রেখে অল্প বয়সে মারা যায়। পরে নাতনী দুটির বিয়েও তিনি দেন।

তাকে ব্যবসার ব্যাপারে সাহায্য করতেন দিব্যনারায়ণ। কারণ দাদা আদিত্যনারায়ণ ছিলেন জ্যাঠামশায়ের মত মদ্যপায়ী, অপদার্থ। তার ওপর আদৌ ভরসা করতেন না ত্রিভুবন ঘোষাল। আর ছোট ছেলে তো মায়ের আদুরে গোপাল। কাজেকর্মে মন নেই। নিতান্তই উদরসর্বস্ব আর ভোগী স্বভাবের রুদ্রনারায়ণ। তা সত্ত্বেও, ত্রিভুবন ঘোষালকে স্ত্রীর আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছিল। স্ত্রী এজেন্সির অফিসটি ছোট ছেলের নামে রাখার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন স্বামীর কাছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র স্ত্রীর পীড়াপীড়ির জন্যই তিনি শেষ পর্যন্ত তার আবদার মেনে নিয়ে অফিসের নামকরণ করেন 'রুদ্রনারায়ণ এণ্ড ব্রাদার্স"।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ব্যবসা কি ভাবে চলছে, তার কি সমস্যা, কোথায় কি করতে হবে, এসব কিছুই জানে না রুদ্রনারায়ণ। একেই বলে প্রহসন। দিব্যনারায়ণ বহুবার বলে দেখেছেন। কোন লাভ হয় নি। রুদ্রনারায়ণ দায়িত্ব বহনে রাজী নয়। সমস্ত ভার দাদার কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে চায় সে। অতএব সব কিছু দেখতে হয় দিব্যনারায়ণকেই। দিব্যনারায়ণ তাতে অখুশী নন। তিনি কাজের মানুষ। কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ভালবাসেন।

কিন্তু পিতার স্টিভেডোরের ব্যবসার প্রতি যতখানি হৃদয়ের টান বোধ করেন তিনি, তার অনেক গুণ বেশি মমতা বোধ করেন মহালের জমিদারির জন্য। স্টিভেডোরের ব্যবসা তার কাছে অর্থোপার্জনের উৎস। কর্মচারীদের সঙ্গে, সাহেব সুবো মক্কেলদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেছে। কিন্তু মহালগুলি তাকে মানসিক তৃপ্তি দেয়। তার আভিজাত্যবোধ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। প্রজাদের প্রতিও অনুকম্পামিশ্রিত এক ধরনের ভালবাসা ও বাৎসল্যবোধ রয়েছে তার।

জমিদার হিসাবে প্রজাদের সুখে দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায় ঘোষালরা। উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রজারা নিমন্ত্রিত হয় জমিদার বাড়িতে। দূরত্ব বজায় রেখেও যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ঘোষালদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক।

কিন্তু জমিদারসুলভ মানসিকতা বেশি রয়েছে দিব্যনারায়ণের। কর্তৃত্বে, আভিজাত্যবোধে ও ব্যক্তিত্বে পিতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ত্রিভুবন ঘোষালের আমলে প্রজাদের সঙ্গে দূরত্ব তুলনায় কম ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই দিব্যনারায়ণ নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। গাম্ভীর্য ও রাশভারি স্বভাবের জন্য প্রজারা তাকে যথেষ্টই সমীহ করে চলে। শ্রদ্ধাও তারা তাকে কম করে না।

ধনতন্ত্র দিব্যনারায়ণের কাছে অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার উপায়। তার জন্য কোন সম্মানের আসন পাতা নেই তার হৃদয়ে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের প্রভাব তার আত্মা, তার হৃদয়, তার সমস্ত চেতনার ওপর।

সান্যাল ও রায়েদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধুত্ব রয়েছে। সেকারণেই তাদের পাত্তা দেন তিনি। কিন্তু মনে মনে ঘোষাল পরিবারকে রায় ও সান্যাল পরিবারের ওপরে স্থান দেন। তার যুক্তি, ঐ দুটি পরিবারের কেবল অর্থকৌলিন্যই আছে। সান্যালদের মত জমিদারি আভিজাত্যের ঐতিহ্য ওদের থাকার কথা নয়। প্রজারা যখন তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, কিংবা খাজনা বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার কথা তার কাছে পেশ করে, তখন যে তীব্র আত্মতৃপ্তি তিনি বোধ করেন, তা আর কোন কিছুতেই করেন না। তবে তার সেই অনুভূতি বাইরে প্রকাশ পায় না।

অন্তরের প্রচ্ছন্ন গর্ব যাতে তিনটি পরিবারের সম্পর্কের অন্তরায় না হয়, সে বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন। এমন কি পরিবারের অপর কারুর কাছেও তিনি সেটি

ব্যক্ত করেন না। আভিজাত্য গরিমা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কার্যতঃ তিনটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্টই ভাল।

ঘোষাল পরিবারের বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে সান্যাল পরিবারের সঙ্গে। দিব্যনারায়ণের পিতা ত্রিভুবন ঘোষালের বিশেষ বন্ধু ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সান্যাল। বয়সে ত্রিভুবনের চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন তিনি। একাধারে দাদা ও বন্ধুর সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন ত্রিভুবন। তিনিও সাধ্যমত তার প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেননি। সুখে দুঃখে দুটি পরিবার জড়িয়ে গিয়েছিল একে অপরের সঙ্গে।

প্রফুল্লচন্দ্রের একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্র বয়সে আদিত্যনারায়ণের চেয়েও অনেকটা বড়। অতিরিক্ত স্নেহে ও প্রশ্রয়ে অনেক বদভ্যাস তৈরি হয়েছে তার। নারী ও সুরার প্রতি আকর্ষণ তাদের অন্যতম।

প্রফুল্লচন্দ্র অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু বিমলচন্দ্রের বেশ্যাপ্রীতি তাসত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে। একদিকে মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান, অপরদিকে ক্রমান্বয়ে বেশ্যাসংসর্গের কারণে পরবর্তীকালে তার দেহে একাধিক দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে।

বিমলচন্দ্রের সঙ্গে দিব্যনারায়ণের বয়সের অনেক ফারাক থাকা সত্ত্বেও, পারিবারিক সূত্রেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বন্ধুর সুরাপানের সঙ্গী হলেও তার বেশ্যাসংসর্গ তিনি পছন্দ করেন না। বিমলচন্দ্র তার হিতোপদেশে কান দেন না। সেটি জানা আছে বলে দিব্যনারায়ণও তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চান না।

তাসে খুব আসক্তি আছে দিব্যনারায়ণের। বিমলচন্দ্র তার তাসখেলার নিয়মিত সঙ্গী। মাঝে মাঝে রায় বাড়ির প্রতাপচন্দ্রও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। বিমলচন্দ্রের বাড়িতেই অধিকাংশ দিন তাসের আসর বসে। বিমলচন্দ্রের আবার বাইরে যাবার তাগিদ থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাসের আসর উঠিয়ে দেন। মাঝে মাঝে অসমাপ্ত থেকে যায় খেলা। বন্ধুদের কাছে অজানা নেই বিমলচন্দ্রের বেশ্যাসংসর্গের কথা। ঠাট্টা তামাশা করে তারা তা নিয়ে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বিমলচন্দ্র বিচলিত হন না। যথাসময়ে আসর উঠিয়ে গাত্রোত্থান করেন।

আজ দিব্যনারায়ণেরই মন ছিল না খেলায়। বিদ্যুৎপ্রভার মুখটা বারে বারেই তার মনে হানা দিচ্ছিল। তাস খেলার আসরে তিনি উপস্থিত হয়েছেন দুটি কারণে। একটি বরাবরের অভ্যাস, অপরটি ব্যবসা সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়ার ইচ্ছা।

একটুক্ষণ খেলার পরেই তার মন কেমন বেসুরো গাইতে লাগল। বিদ্যুপ্রভার অনিন্দ্য রূপ তার চোখের সামনে কেবলি ঝলসে উঠছিল। খেলায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

বিমলচন্দ্র সেটি লক্ষ্য করে বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা করেন।

—হোল কি তোমার, দিব্যনারায়ণ? আমার মত তোমার তো পরকীয়া প্রীতি

নেই। কিন্তু বড় অন্যমনস্ক দেখছি যেন তোমাকে? আজ বাড়ি যেতে চাইছ বুঝি তাড়াতাড়ি? বুঝেছি। দ্বিতীয় পক্ষ বলে কথা। তার ওপর সুন্দরী। না ভায়া, তোমাকে আমি আটকাব না। তুমি যেতে চাইছ, যাও।

দিব্যনারায়ণের ভাল লাগলনা কথাটা।" দ্বিতীয় পক্ষ" কথাটায় আপত্তি রয়েছে তার। বিনোদিনীর সঙ্গে নামেমাত্র বিবাহ হয়েছিল। তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তার এখনও আপত্তি। মাঝে মাঝে নিজের মনোভাবে নিজেই বিস্মিত বোধ করেন। বুঝতে পারেন, বিনোদিনীর প্রতি এই নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই। তবু বিনোদিনীর সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে প্রবল অনিচ্ছা তার।

বাহ্যিক ঘটনা যাই বলুক, বিদ্যুৎপ্রভাই তার স্ত্রী। বিনোদিনী কয়েক দিন অতিথি ছিল তাদের পরিবারে। তারা এক ছাদের তলায় এক বিছানায় শুয়েছেন। কিন্তু বিনোদিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দূরে থাক্, তাকে সেভাবে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি তিনি। কিন্তু সমাজ তা মানবে না। বিদ্যুৎপ্রভাকে দ্বিতীয় স্ত্রী বলেই গণ্য করবে সকলে।

বিমলচন্দ্র বয়সে তার চেয়ে অনেকটাই বড়। তাকে দাদা বলে সম্বোধন করেন দিব্যনারায়ণ। বন্ধু হিসাবে তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা যে একেবারেই চলেনা, তা নয়। তবু অসুস্থ পত্নীর জন্য উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার কথা ফলাও করে বলতে কেমন বাধবাধ ঠেকল।

ইচ্ছা করেই ছোট্ট একটি মিথ্যা কথা বললেন।

—না দাদা, যা ভাবছেন, তা নয়। আমার নিজের শরীরটাই ভাল ঠেকছেনা।

বাড়িতে ফিরে এসে ইচ্ছা করেই রুদ্রনারায়ণের ঘরের পাশ দিয়ে গেলেন তিনি। আগের দেখা ঘটনাটি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না দিব্যনারায়ণ। অপর কাউকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে আভিজাত্যবোধে বাঁধছে। তাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। হাতে নাতে ধরে ফেলতে হবে রুদ্রনারায়ণের দুষ্কর্মের সহচরীটিকে।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে পূবের বারান্দা ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চললেন দিব্যনারায়ণ। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বারান্দার থামের কাছে অল্প অল্প জল পড়ে রয়েছে।

বিশাল তিন মহলা বাড়ি তাদের। দোতলার বারান্দায় সারি সারি ঘর। অনেকগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোন এককালে ব্যবহৃত হয়েছে, পরে আর তা হয় নি। অব্যবহৃত ঘরে তালা লাগানো। দিব্যনারায়ণ নিজেও অনেক ঘরে কি আছে, ভাল করে জানেন না।

রুদ্রনারায়ণের ঘরের পাশে এসে নারীকণ্ঠের ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। রুদ্রনারায়ণও জড়ানো গলায় কি সব বলছে যেন।

বারান্দার দিকের দুটি জানলাই বন্ধ। দরজা মনে হোল বন্ধ। একবার ইচ্ছে হোল, দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন। দুজনকে হাতে নাতে তাহলে ধরে ফেলা যায়। বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই উৎপাটিত হোক্। তাকে আর বাড়তে দেবেন না তিনি।

কিন্তু অস্বস্তি হোল। ওরাই শুধু অপ্রস্তুত হবে না, তিনিও যথেষ্টই অপ্রস্তুত হবেন।

একটুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলাটা কার, বোঝার চেষ্টা করলেন দিব্যনারায়ণ। বন্ধ দরজা জানলা ভেদ করে অতি খাদে বলা কথার আওয়াজ শুনে কণ্ঠস্বরের অধিকারী কে, তা বোঝা সম্ভব নয়।

একটু চিন্তিতভাবেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। বাগান থেকে জুঁইফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে বৃষ্টিভেজা বাতাসে। জুঁইফুলের গন্ধ তার খুব প্রিয়। অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যের জন্য জুঁই ফুলের গন্ধ তার কাছে প্রহসন বলে মনে হোল।

দিব্যনারায়ণের বুকের ভেতর থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উদ্গত হয়। নিজের ঘরের সামনে এসে দেখেন, দরজা আধখোলা। ঘরে ঢুকে বিদ্যুৎপ্রভাকে দেখতে পেলেন না। বিরক্ত হলেন দিব্যনারায়ণ। বিদ্যুৎপ্রভা বড় অবাধ্য। তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন তিনি। তার কথা না শুনে নিশ্চয়ই নীচে চলে গেছে রান্না ঘরের কাজে। অথচ তিনি নিজে রামুর মাকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, মেজ বৌদির জ্বর হয়েছে। তার খাবার যেন ওপরে দিয়ে যায়।

দিব্যনারায়ণ একবার ভাবলেন নীচে গিয়ে বিদ্যুৎপ্রভাকে ডেকে আনবেন। তাকে তিরস্কার করবেন অবাধ্যতার জন্য। পরক্ষণেই ভাবলেন, সেটা অশোভন দেখাবে। তার বিধবা বৌদি এমনিতেই বিদ্যুৎপ্রভাকে সহ্য করতে পারেন না। বৌদি গৌরাঙ্গী, দীর্ঘকায়, রূপবতী। রূপের জন্য তার যথেষ্টই গর্ব ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভার রূপের কাছে সেই রূপও ম্লান হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎপ্রভাকে প্রথম থেকেই তাই সহ্য করতে পারেন না তিনি।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকেন না দিব্যনারায়ণ। তার মধ্যেও তার চোখে ধরা পড়েছে বৌদির ঈর্ষা। ঠারেঠোরে যেসব কথা মাঝে মাঝে তিনি বলেন, তা নির্দোষ বলে মনে হয়না।

বিদ্যুৎপ্রভা তার কাছে তা নিয়ে নালিশ করলে তিনি অবশ্য অন্য কথা বলেন। মেয়েলী ঝগড়াবিবাদে তিনি জড়িয়ে পড়বেন কেন-? এ বাড়ির পুরুষ অভিভাবক তিনি। তাকে সবাই মেনে চলবে। এমন কি দাদার বিধবা বা তার ছেলে মেয়েরাও। আশ্রিত কুটুম্বদের ক্ষেত্রেও সেই এক কথা প্রযোজ্য।

দিব্যনারায়ণ জানেন, সামনাসামনি নিজেকে সব ব্যাপারে জড়াতে নেই। তাতে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তিত্বের ওজন ঠিক রাখার জন্য দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন।

দিব্যনারায়ণ ঘর থেকে বেড়িয়ে সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে তার ঠাণ্ডা আমেজ। কিন্তু দিব্যনারায়ণের মন বড় অশান্ত। ভোরবেলায় দেখা স্বপ্ন কেমন এক অমঙ্গলের আভাস দিচ্ছে। অবিবাহিত রুদ্রনারায়ণের ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ তিনি কিছুতেই

মেনে নিতে পারছেন না। আজ দু'বার তিনি তার ঘরে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি টের পেয়েছেন। সে একই স্ত্রীলোক, না দুজনে আলাদা, তা তিনি জানেন না।

এ বাড়ির অনেক বদনাম। তার পিতামহ ও জ্যাঠামশায় অনেক গুমখুন করেছেন। মদ্যপানের প্রতি আসক্তি এ পরিবারের বৈশিষ্ট্য। বাড়িতে হুইস্কীর রঙের একটি ঘর পর্যন্ত রয়েছে মদ্যপানের জন্য। বাইজী নাচের জন্যও রয়েছে আলাদা একটি ঘর। জমিদারী ঐতিহ্যের রীতিবহির্ভূত নয় সেসব। যে কোন জমিদার পরিবারেই স্বাভাবিক ওসব।

কিন্তু অবিবাহিত যুবকের ঘরে রমণীর আনাগোনা, রমণীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ কি তার মধ্যে পড়ে? ভ্রূকুঞ্চন করেন দিব্যনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণ তার সহোদর ভাই। সংসারের হাল ধরার জন্য বাবা দাদা বর্তমান নেই। সে যত দোষই করুক, তাকে গুরুদণ্ড দিতে পারবেন না। কিন্তু তার মঙ্গলের জন্যই অন্যভাবে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে স্ত্রীলোকটিকে যেভাবে সম্ভব সরিয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে রুদ্রনারায়ণকে না জানিয়েই।

তার এই ভাইটি ছোটবেলা থেকেই বেয়াড়া ধরনের। পড়াশোনায় খারাপ ছিল না। কিন্তু একটু বড় হয়েই কি যে হোল! পড়াশোনায় অমনোযোগী হোল। বেশীদূর পড়তে চাইলনা। অনেক বলে কয়েও তার মতিগতির পরিবর্তন করা গেলনা। তিনি বা তার দাদাও বেশিদূর পড়াশোনা করেননি। তারা চেয়েছিলেন, অন্ততঃ রুদ্রনারায়ণ পড়াশোনাটা যেন ঠিকমত চালিয়ে যায়।

রায়েদের পরিবারে বহু শিক্ষিত মানুষ আছে। সান্যালদের পরিবারেও শিক্ষিত মানুষ একেবারে বিরল নয়। সাহেব সুবোদের সঙ্গে কারবার তাদের। অথচ তাদের পরিবারেই রয়েছে শিক্ষার ঘাটতি। বিদেশে পাড়ি দিলে সেখানকার হাল-চাল, বাজারদর এগুলি ভাল করে যাচাই করে আসা যায়। ব্যবসা চালাতে সুবিধা হয়। রুদ্রনারায়ণের কোন চাড় নেই। সে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়।

শুধুমাত্র অসৎ সংসর্গে মিশে ছেলেটা অন্যরকম হয়ে গেল। আগে পড়াশোনায় ভাল ছিল। ওর অনর্গল ইংরাজী বলার ক্ষমতা দেখলে তাক লেগে যাবে। অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। দৌড় ওটুকুই। ব্যবসার ব্যাপারে ওর কাছে কোন রকম সাহায্য পাওয়ার আশা বাতুলতা মাত্র।

স্ত্রীলোকের প্রতি রুদ্রনারায়ণের প্রচণ্ড আসক্তিও অল্প বয়স থেকেই চোখে পড়েছে দিব্যনারায়ণের। তিনি ভাইয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। রূপেগুণে ঘরে সর্বাংশে ভাল পাত্রী তার চোখে পড়ছেনা। তবে আর বেশিদিন দেরি করা যাবে না। পরিস্থিতি যাতে আরও ঘোরালো হয়ে না ওঠে, তার জন্য তাকে তৎপর হতে হবে। অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে রুদ্রনারায়ণকে সংসারী করবেন তিনি।

বিনোদিনীর কথা আবার মনে পড়ে গেল দিব্যনারায়ণের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে হোল, বিনোদিনীর সঙ্গে বড়ই দুর্ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুর আগেও তার সঙ্গে

দেখা করেন নি। এত সবের পরও তাকে শেষবারের মত চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিল বিনোদিনী। কিন্তু তার কি করার আছে? বিনোদিনীর ভাগ্যে যা লেখা ছিল, তাই হয়েছে। তিনি নিমিত্ত মাত্র। বিনোদিনীর কথা তিনি একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। স্বপ্নে দেখা না পেলে তার কথা মনেও স্থান দিতেন না। বিস্মৃত অতীতকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সামনে টেনে আনার বিলাসিতা তার স্বভাবে নেই।

কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে মনটা কেমন কু গাইছে। বড় বাজারের যে দোকানগুলি থেকে মাল কেনা হয়, তাদের জিনিষ কখনই খারাপ হয় না। এ পর্যন্ত তাদের পাঠানো মাল বিদেশ থেকে বাতিল হয়ে ফেরৎ আসে নি।

হঠাৎ কি অন্যরকম কিছু ঘটতে পারে? স্বপ্নে তো কত কিছুই দেখা যায়। বাস্তবে তার কিছুই ঘটেনা। ভালমন্দ কত স্বপ্নই তো পরে কোথায় কোন অতল শূন্যতার গহ্বরে তলিয়ে যায়। এক সময়ে স্মৃতি থেকেও হারিয়ে যায় তার রেশ। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সাধারণ আর দশটা মানুষের মত বিচলিত বোধ করছেন কেন তিনি?

মন থেকে সজোরে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান দিব্যনারায়ণ। হঠাৎ তার চোখ পড়ে বিদ্যুৎপ্রভার দিকে। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে সে এদিকে।

বিদ্যুৎপ্রভা প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। একটু পরে তাকে দেখতে পেয়ে কেমন ভীত নিষ্প্রভ দেখাল তার মুখ। কাছে দাঁড়িয়ে দিব্যনারায়ণ স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন সেটি।

একটু কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

—কোথায় গিয়েছিলে?

থতমত খেয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রভা। আমতা আমতা করতে থাকে সে।

—আমি…আমি…আমি…

জোরে ধমক লাগান দিব্যনারায়ণ।

—আমাকে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমাকে কি বলেছিলাম? এরপর আর কোনদিন যদি এমন অবাধ্য হতে দেখি, তাহলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না।

॥ দুই

কয়েকদিন পরেই "রিচার্ডসন এণ্ড উইলিয়াম" কোম্পানির বড় সায়েব ডেকে পাঠালেন দিব্যনারায়ণকে। দিব্যনারায়ণের মন কু গাইতে লাগল। সাহেবের ঘরে ঢুকে সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে দিব্যনারায়ণ বুঝতে পারলেন, কোন একটা অঘটন ঘটেছে।

তাকে বসতে বলেই সোজাসুজি তার অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন সাহেব।

—লুক বাবু, অহি ট্রাস্ট ইউ। বাট হিয়ার ইজ আ ব্যাড নিউজ ফর আ—জ। সাম স্যাক্স্ কণ্টেনিং দ্যা মাস্টার্ড হ্যাড হোল্স্ ইন দেম। এ্যাণ্ড ইউ ক্যান ওয়েল আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হোয়াট দ্যা আউটকাম হ্যাজ বিন। দে হ্যাভ রিজেক্টেড দ্যা গুড্স্। দিস ইজ টু ব্যাড। ইট ইজ গোয়িং টু হ্যাভ অ্যাডভার্স এফেক্ট অন আওয়ার গুডউইল।

অভাবিত সেই সংবাদ শুনেও বিস্ময় প্রকাশ করলেন না দিব্যনারায়ণ। বড় বাজারের 'প্রভুদয়াল আগরওয়াল এ্যাণ্ড সন্স'—এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তাদের। তার বাবা শুধু খরিদ্দারই ছিলেন না। প্রভুদয়ালের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তার।

দিব্যনারায়ণ বরাবর বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। মালপত্রের তদারকী করেছেন। কুইণ্টল কুইণ্টল মাল প্রভুদয়ালের বিশাল গুদামে রাখা হোত। যথাসময়ে সেগুলি জাহাজে বোঝাই হয়ে বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিত। এ পর্যন্ত অনুরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

কিভাবে সর্ষের বস্তায় ছিদ্র হোল, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। বস্তার কাপড়ে কোন ত্রুটি থাকতে পারে। হয়ত বা বস্তাগুলি অনেক পুরনো ছিল, কিংবা অন্য কোন কারণে বস্তায় ছিদ্র হয়েছিল। তবে কারণ যাই হোক্, এভাবে মাল ফেরৎ আসাটা লজ্জার বিষয়।

স্বপ্নটার কথা মনে ছিল বলেই দিব্যনারায়ণ বিস্মিত হলেন না। কোন একটা দুর্ঘটনা যে ঘটবে, তার আভাস তো তিনি আগেই পেয়েছেন। বজ্রাহত হবার কারণ ঘটলেও সহজভাবেই গ্রহণ করলেন তিনি সব দায়টুকু।

দুঃখপ্রকাশ করে সাহেবকে বললেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, কেন এরকম ঘটনা ঘটেছে। পরে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তিনি কথা দিচ্ছেন, অতঃপর এরকম হবে না। মাল কেনা থেকে সুরু করে জাহাজে মাল বোঝাই করা পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছুর তদারকী করবেন। সাহেবের কাছে বারবার অ্যাপলজি চাইলেন দিব্যনারায়ণ।

সাহেবের সঙ্গে ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি মিটে গেল, দিব্যনারায়ণের মনের মধ্যে তার জের কিন্তু তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল না। বাইরে প্রকাশ না করলেও ভেতরে ভেতরে খুব দমে গেলেন। ভাইপোকে তিনি ঐ ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অতবড় ব্যবসা, পুরোপুরি একা চালানো সম্ভব নয়। রুদ্রনারায়ণের নামে ব্যবসা, অথচ সে শুয়ে বসে দিন কাটায়। সে খাদ্যলোভী, ভোগী, অলস। তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না।

দিব্যনারায়ণ তাই দাদার ছেলের ওপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার পরিণতি যদি এমন হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসা কোথায় এসে দাঁড়াবে?

দিব্যনারায়ণ ঠিক করলেন, আজ তিনি রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা বলবেন। দায়িত্ব

তার একার নয়। তার বোঝা কম বেশি রুদ্রনারায়ণকেও বইতে হবে। চিরদিন একভাবে চলে না।

দিব্যনারায়ণের ব্যবসা সম্পর্কিত অনেকগুলি কাজ ছিল। কিন্তু তার কোথায়ও যেতে ইচ্ছা করল না। ড্রাইভার শচীনকে বললেন গাড়ি সোজা বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে। শচীন অবাক হয়ে গেল। বেরোবার সময় দিব্যনারায়ণ বলেছিলেন, বেশ অনেকগুলি জায়গায় তাকে যেতে হবে। গাড়িতে বেশি করে তেল ভরে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু মেজ দাদাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, তার মনটা ঠিক নেই।

বহুদিনের পুরনো লোক সে। কর্তার আমল থেকে এ বাড়ির গাড়ি চালাচ্ছে। দিব্যনারায়ণকে বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে। সে জানে, কর্তৃত্বপরায়ণতা মেজ দাদাবাবুর জন্মগত। 'যো হুকুম' না মানলে মুশকিল। মনে তার প্রশ্ন উঁচিয়ে এলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না। গাড়ি নিয়ে এল বাড়ির সামনে।

দিব্যনারায়ণ বাড়িতে ঢুকে সোজা ওপরে উঠে গেলেন। রুদ্রনারায়ণের ঘরের সামনে এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলেন। রুদ্রনারায়ণ দরজা খুলে দিল। ঘরে পা দিয়েই বজ্রাহত হয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। খাটের ওপর বসে আছে বিদ্যুৎপ্রভা। আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলেন। সন্দেহের কারণ নেই। তার চোখ ভুল দেখছে না। যা অভাবিত, যা তার কল্পনাতীত, তাই ঘটেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এত তাড়াতাড়ি তার ফিরে আসার কথা নয়। রুদ্রনারায়ণ ও বিদ্যুৎপ্রভা তাই প্রস্তুত ছিল না। তিনি আজ নিঃসংশয়। অনেকদিন ধরেই চলেছে এই ব্যভিচার। পরপর ছবির মত মনে পড়ল বেশ কয়েকদিনের ঘটনা। রুদ্রনারায়ণের ঘরে মেয়েলী গলায় ফিসফিসানী, বিদ্যুৎপ্রভার অস্বাভাবিক আচরণ।

মনে পড়ল, অনেক সময়েই হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎপ্রভাকে ঘরে দেখতে পেতেন না তিনি। মাঝরাতে কতদিন ঘুম ভেঙ্গে গেছে! স্ত্রীকে বিছানায় দেখতে পাননি। কিন্তু রূপসী স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি তাকে অন্ধ করে রেখেছিল, বুদ্ধিহীন করে রেখেছিল। চক্ষুষ্মান হয়েও তার চোখে কিছু ধরা পড়ে নি।

মুহূর্তের মধ্যে দিব্যনারায়ণের মনে সমস্ত ভাবনা ছাড়িয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল একটি দুর্ভাবনা। পারিবারিক এই কলঙ্কের কথা আর কে জানে?

ভাইয়ের দিকে ফিরেও তাকালেন না তিনি। তাকে যা বলতে এসেছিলেন, তা বলা হোল না। দিব্যনারায়ণ বিদ্যুৎপ্রভার দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে আদেশ করলেন 'ঘরে এসো।'

ভীত, সন্ত্রস্ত বিদ্যুৎপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন দিব্যনারায়ণ। বিদ্যুৎপ্রভা কাঁপছিল। একটি শ্লোক মনে পড়ল দিব্যনারায়ণের। দুষ্টা ভার্যা কালনাগিনীর সমান। দিব্যনারায়ণের মনে হোল, বিদ্যুৎপ্রভারা সুবর্ণনাগিনী, স্বর্ণনাগিনী। স্বর্ণকান্তি দেখিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। পরে মৃত্যুবিষ ঢেলে দেয় সর্বশরীরে। সাপকে কখনও ছেড়ে দিতে নেই।

বিদ্যুৎপ্রভাকে একটিও প্রশ্ন করলেন না দিব্যনারায়ণ। কোন জবাবদিহি চাইলেন না তার কাছে। বন্দুকে গুলি ভরা ছিল। শুধু টেপার অপেক্ষা। পলকের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভার নিষ্প্রাণ দেহটা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

পরবর্তী করণীয় কাজগুলি নির্বিঘ্নে সমাধা করলেন। বহুদিনের পুরনো ভৃত্য জগমোহনকে ডেকে তার সাহায্যে গায়ের গয়না সব খুলে রাখলেন। পরে ধরাধরি করে একটি বস্তায় পোরা হোল সেই লাশ।

মাঝরাতে জগমোহনকে নিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন জঙ্গলের কাছে। সঙ্গে শাবল ছিল, টর্চ ছিল। তার নির্দেশমত যা করার, সব করল জগমোহন। মাঝ জঙ্গলে মাটিতে অনেক নীচে গর্ত খুঁড়ে পুতে রাখা হোল সেই লাশ। পরে গর্ত বুজিয়ে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর ফেলে দেওয়া হোল গাছের ডালপালা, শেকড়বাকড়।

এই জঙ্গল তাদের সম্পত্তি। বেশ কিছুদিন যাতে কেউ এদিকে না আসে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে যদিও বা মাটি খুঁড়ে কেউ সেই কঙ্কাল বার করে, তাহলেও বিদ্যুৎপ্রভাকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

বাড়িতে কানাঘুষো হোল। দিব্যনারায়ণের তা বুঝতে অসুবিধা হোল না। কিন্তু তার কঠিন গাম্ভীর্য ও অনমনীয় দৃঢ়তার সামনে মুখ ফুটে মনের প্রশ্ন ব্যক্ত করার সাহস হোল না কারুরই।

দিব্যনারায়ণ তার মা, বৌদি এবং নিকটাত্মীয়দের বললেন, তিনি বিদ্যুৎপ্রভাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন পরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। কখন পাঠালেন, কেন পাঠালেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন গুঞ্জরিত হতে থাকল। কিন্তু প্রকাশ্যে তা নিয়ে দিব্যনারায়ণের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করতে কারুরই ইচ্ছা হোল না।

দীর্ঘদিন এসব ঘটনা চাপা থাকে না। বিদ্যুৎপ্রভার বাড়ি থেকে খবর এল, সে সেখানে যায়নি। তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন দিব্যনারায়ণ। তিনি অবলীলাক্রমে বললেন, যে ব্যক্তির সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রভাকে পাঠিয়েছিলেন, তারও খবর মিলছেনা। হয়ত পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

থানা পুলিশ করতে রাজী হলেন না দিব্যনারায়ণ। তার যুক্তি, পরিবারের দুর্নাম হবে তাতে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কে, সেই প্রশ্ন করতেও সাহস হোল না কারুর।

সকলেই বুঝল, ব্যাপারটা গোলমেলে। তবে যা ঘটেছে, তার দায় পুরোপুরি দিব্যনারায়ণের। বেশি কৌতূহল প্রকাশ করলে দিব্যনারায়ণের রোষবহ্নিতে পড়তে হবে। তার পরিণতি ভাল না হওয়ারই সম্ভাবনা। তাছাড়া যে ঘটনার প্রতিকার হবেনা, তার জন্য অকারণ জল ঘোলা করেই বা কি লাভ?

অতএব বিদ্যুৎপ্রভার বাপের বাড়িও চুপ করে গেল। যথানিয়মে কিছুদিন পর ব্যাপারটা থিতিয়ে গেল। কানাঘুষোও বন্ধ হয়ে গেল। মাঝেমাঝে অত্যুৎসাহী কোন ব্যক্তি হয়ত হঠাৎ কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তা নিয়ে কোনরকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের আর আশঙ্কা ছিলনা।

বিদ্যুৎপ্রভার মৃত্যুর পর কিছুদিন দিব্যনারায়ণ একটু যেন ঝিমিয়ে রইলেন। ব্যবসার ব্যাপারেও তেমনভাবে মন দিতে পারলেন না। বাইরে থেকে কোন হেরফের চোখে পড়ল না। কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায় না। দিব্যনারায়ণের আত্মবিশ্বাস যেন কোথায় টোল খেয়েছিল।

বিদ্যুৎপ্রভার জন্য তিনি কোন মমতা বোধ করেন না। বরং একদিন যে সেই অসতী দুষ্টা স্ত্রীকে আদর করেছেন, তাকে জড়িয়ে ধরে অনেক মধুর প্রিয়বাক্য শুনিয়েছেন, তার জন্য ঘৃণা বোধ হয় নিজের প্রতি। বিদ্যুৎপ্রভাকে বিষবৎ সর্পবৎ পরিত্যজ্য জ্ঞানে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু একটি কথা ভেবে মনস্তাপ হয় তার। মনে যে প্রশ্নটি উঁচিয়ে ওঠে, তার জবাব দেওয়ার জন্য কেউ নেই। বিদ্যুৎপ্রভা জীবিত থাকলে একমাত্র সেই তার উত্তর দিতে পারত। রুদ্রনারায়ণের অসুন্দর চেহারা সত্ত্বেও, বিদ্যুৎপ্রভা কি দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি?

দিব্যনারারণের গাত্রবর্ণ নিঃসন্দেহে রুদ্রনারায়ণের তুলনায় নীরস। তাকে বড়জোর শ্যামবর্ণ বলা চলে। রুদ্রনারায়ণের গায়ের রঙ খুব ফর্সা। কিন্তু অন্যসব দিকেই সে নিঃসন্দেহে খাটো। সকলের মুখেই বরাবর শুনে এসেছেন একথা দিব্যনারায়ণ।

রুদ্রনারায়ণ তার মত দীর্ঘাকৃতি, সুষম কাঠামোর অধিকারী নয়। যথেষ্টই খর্বাকৃতি সে। তার শরীর এই বয়সেই বেশ মেদবহুল হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত ভোজনপ্রিয়তা আর আলস্যপ্রিয়তা তার চোখেমুখে কেমন এক ভোঁতা স্থূলতা এনে দিয়েছে।

মায়ের অতি আদরের নাড়ুগোপাল এই ভাইকে দিব্যনারায়ণ কোনদিনই সমকক্ষ মনে করেননি। ভাইকে তিনি যথেষ্টই ভালবাসেন। কিন্তু সে শুধু বয়সে ছোট, সহোদর ভাই বলে! অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতার কারণেও তার প্রতি এক ধরনের সস্নেহ প্রশ্রয় স্থান পেয়েছে মনে।

পিতৃবিয়োগের পর স্বাভাবিক কারণেই ভাইয়ের প্রতি টান বেড়ে গিয়েছে। অভিভাবকসুলভ স্নেহ ও মমতা বোধ করেন তিনি ভাইয়ের প্রতি।

কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভা? সে কি করে আকৃষ্ট হয়? রুদ্রনারায়ণকে তো পুরোপুরি পুরুষ বলেই মনে করা শক্ত। 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' বোধহয় একেই বলে। বিদ্যুৎপ্রভা শুধু গাত্রবর্ণ দেখেই হিতাহিতবোধবর্জিত হোল? এ প্রশ্ন তিনি কাকে করবেন?

বিদ্যুৎপ্রভার মৃত্যুর পর এই প্রথম তিনি বিনোদিনীকে মনে মনে স্ত্রীর স্থান দিলেন। ভাবলেন, তার প্রথমা স্ত্রী রূপে না হোক, স্বভাবে সতীলক্ষ্মী ছিল। অহমিকাঘোরে সেই দেবীকে তিনি নির্বাসন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তার জন্যই নিশ্চয় আজ এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তাকে।

তিনি কাকে দোষ দেবেন? ভাগ্যকে, না তার নিজের চরিত্রকে? ভাগ্যের দ্বারাই কি চালিত হয় চরিত্র? অথবা চরিত্রই নিয়ন্ত্রিত করে ভাগ্যকে?

কিছুদিন ধরে এই সব প্রশ্ন বড় বেশি করে হানা দিচ্ছে তার মনে। মাঝেমাঝে ভাবেন, কোন একজনকে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়ে তার কাছে এসব প্রশ্নের জবাব চাইবেন। একটু পরেই সেই ইচ্ছা মিলিয়ে যায়।

আজন্ম যে ব্যক্তিত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন, তাকে অনাবৃত করে নিজের নগ্নতা দেখাতে লজ্জা বোধ করেন দিব্যনারায়ণ। মনের প্রশ্ন মনের মধ্যেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু গভীর রাতে তার অবুঝ মন মাঝেমাঝে আর্ত চিৎকার করে—'বিদ্যুৎপ্রভা, তুমি কি দেখে ভুললে?' কখনও বা প্রথমা স্ত্রীকে স্মরণ করেন—'তুমি নিশ্চয় আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলে। আমার সংসার তাই এভাবে ভেঙ্গে গেল। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারলেনা, বিনোদিনী?'

দিব্যনারায়ণ ভায়ের কথাও চিন্তা করেন। রুদ্রনারায়ণ নারীসঙ্গলোলুপ। তার উচিত ছিল, ভায়ের জন্য পাত্রী ঠিক করা। তাহলে হয়ত এই অনর্থ ঘটতনা। তিনি ভেবেও রেখেছিলেন, তার জন্য পাত্রী খুঁজবেন। কিন্তু সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল।

তবে যাই ঘটুক, ভাইকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না। এক স্ত্রী গেলে আরেক স্ত্রী মিলবে। কিন্তু সহোদর ভাই চলে গেলে আর সেই ভাই মিলবে না। ভাইকে শোধরানোর দায়িত্ব তার। তিনি সে চেষ্টা করবেন।

দিব্যনারায়ণ রুদ্রনারায়ণকে একদিনের জন্যও ঐ ব্যাপারে কিছু বললেন না। তিনি চাননা, ঘটনাটা পাঁচকান হয়। আকাশের দিকে মুখ করে থুতু ফেললে সে থুতু নিজের মুখেই পড়ে। বিদ্যুৎপ্রভাকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারতেন। বিনোদিনীকে তো বিনা দোষে পিত্রালয়ে রেখে এসেছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভাকেও পিত্রালয়ে রেখে আসা যেত। কিন্তু ব্যাপারটা চাপা থাকত না। আসল ঘটনা জানাজানি হোত। তিনি সেই সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছেন।

রুদ্রনারায়ণ ভীরু, কাপুরুষ স্বভাবের। সে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু নিজের প্রেম, নিজের অধিকার দাপটের সঙ্গে ঘোষণা করার বীরত্ব বা পৌরুষ তার নেই।

সেদিন সে চোরের মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুৎপ্রভার অন্তর্ধানের পরও দাদার সামনে এসে কোন প্রশ্ন করার সাহস হয়নি তার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিব্যনারায়ণের মনে হোল—'ক্লীব, একেবারে ক্লীব এই রুদ্রনারায়ণ। অতবড় সাংঘাতিক কাণ্ডের যে নায়ক, সে কি করে ওরকম নির্বিকার থাকে?'

বাইরে থেকে দিব্যনারায়ণের আচরণে কোন তারতম্য দেখা গেল না। রুদ্রনারায়ণও আগের মতই স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে লাগল। কিছুদিন পর চেষ্টা করে আবার পুর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন ব্যবসায়ে দিব্যনারায়ণ।

নিজের বিয়ের কথা আর ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন, রুদ্রনারায়ণের বিয়ে

দেবেন। কিন্তু মায়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হোল তাকে বিয়েতে। তার মা-ই দেখেশুনে মোটামুটি সুশ্রী চেহারার বউ নিয়ে এলেন তার জন্য।

বউয়ের চেহারা বিনোদিনীর চেয়ে ভাল, তবে বিদ্যুৎপ্রভার চেয়ে শতগুণে, সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। শুভদৃষ্টির সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরকম তুলনার কথা মাথায় এল দিব্যনারায়ণের। সব কিছু ভুলে গেলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বিদ্যুৎপ্রভার অনিন্দ্য গৌরকান্তি, পদ্মপলাশ চোখের অপরূপ চাহনী। সৌন্দর্যপিয়াসী মন নিঃশব্দে রোদন করে উঠল।

কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। দিব্যনারায়ণ আত্মসংযম জানেন। পিতার কাছেই তার পাঠ নিয়েছেন। পিতার অনেক গুণই তিনি পাননি। শুধু তিনি কেন, তাদের তিন ভাইয়ের কেউই পিতার গুণাবলীর অধিকারী হননি।

বোনেদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাদের স্বভাবের সব দিক প্রকট হতে পারেনি তার কাছে। তবে তার ছোট দুই বোন প্রায় বারমাসই পিত্রালয়ে থাকে। তাদের স্বভাব যে আদৌ বাবার মত নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

চরিত্রমাহাত্ম্যে বাবা সকলের চেয়ে আলাদা। তাদের বংশের গৌরব। দিব্যনারায়ণ বিশ্বাস করেন "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।" বাল্যে শেখা শ্লোক কৈশোরে ও যৌবনে পিতার চরিত্রগুণে অর্থময় হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র পিতা। মাতার স্থান তার অনেক নীচে।

দেবতুল্য মানুষ ছিলেন পিতা। তার দানধ্যানের তুলনা মেলেনা। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা করা চলে। তিনি যেভাবে আপ্রাণ পরিশ্রম করে শুধু দাদার ঋণ শোধ করা নয়, পৈত্রিক হৃত সম্পত্তিরও পুনরুদ্ধার করেছিলেন, তা অবিশ্বাস্য মনে হবে অনেকের কাছেই।

দিব্যনারায়ণের ধারণা, অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তার হৃদযন্ত্রের ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। পঞ্চান্ন বছর বয়সেই সব ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়েছে। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার হোল, জমিদারীর বহু তালুক তিনি নিঃশর্তে দান করেছিলেন বহুজনকে। বহু প্রজাকে নিয়মিতভাবে সাহায্য করতেন। খাজনা বাকি পড়লে সরকার মশায়ের ওপর নির্ভর না করে নিজে খবরাখবর নিতেন। যদি দেখতেন, বাস্তবিকই কোন অসুবিধার সম্মুখীণ হয়েছে কোন প্রজা, তাহলে তার খাজনা এক কথায় মকুব করে দিতেন।

মধ্যম পুত্র হয়েও দিব্যনারায়ণ বাবার সবচেয়ে আদরের পাত্র ছিলেন। বাবা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন তার ওপর। অন্য দুই ভাই বাবার কোন গুণই পাননি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বরং তাদের মিল বেশি পাওয়া যায়।

দাদা আদিত্যনারায়ণ মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সেটুকুই মিল তার। কিন্তু অনুজ রুদ্রনারায়ণ জ্যাঠামশায়ের চেহারা না হোক্, স্বভাবটি প্রায় পুরোপুরি পেয়েছে। এক অর্থে জ্যাঠামশায়ের থেকেও নিকৃষ্ট স্বভাবের বলা চলে তাকে। জ্যাঠামশায়ের উচ্ছৃংখলতা অনেকটা খোলামেলা ছিল।

কলকাতার এক বিখ্যাত রাজপরিবারের বউকে নিয়ে তিনি পালিয়ে যান। ভোগ-বিলাসে পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে তাদের পিতার স্কন্ধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তবু তার মধ্যে চোরাগোপ্তা ভাবটা যেন অনেক কম ছিল। প্রচলিত অর্থে বীরত্ব আখ্যা দেওয়া যায়না তাকে। কিন্তু 'তামাকও খাব, ডুডুও খাব' ভাবটা তার মধ্যে ছিল না। ভণ্ডামির মুখোশ পরে তলে তলে নোংরামি চালিয়ে যেতে তিনি চাননি।

দিব্যনারায়ণ জ্যাঠামশায়কে স্বচক্ষে দেখেননি। তাদের দোতলায় হলঘরে পিতামহের অয়েলপেণ্টিং-এর সঙ্গে জ্যাঠামশায়েরও প্রমাণ সাইজ বিশাল অয়েলপেণ্টিং রয়েছে। বিশাল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে তারে বাঁধা সেই অয়েলপেণ্টিং কোন্ শিল্পীর আঁকা, তিনি জানেননা। কিন্তু ভারী জীবন্ত দেখায় ছবিটা। জ্যাঠামশায়ের চেহারায় উচ্ছৃংখলতা সত্ত্বেও জমিদারসুলভ আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। রুদ্রনারায়ণের চেহারার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। লোকে বলে, জ্যাঠামশায়ের চেহারার সঙ্গে দিব্যনারায়ণের চেহারার মিল বেশি।

স্বভাবে অবশ্য আদৌ জ্যাঠামশায়ের মত নন তিনি। দিব্যনারায়ণ তা ভাল করেই বোঝেন। তার বাবাকে কোনদিন জ্যাঠামশায়ের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধাভরে কোন শক্ত কথা বলতে শোনেননি। দিব্যনারায়ণের তা দেখে আশ্চর্য লাগত। ওরকম ভ্রাতৃভক্তি লক্ষ্মণের মধ্যেই দেখা যায়।

জ্যাঠামশায় যদি রামের তুল্য হতেন, তাহলে দিব্যনারায়ণের কিছু বলার ছিলনা। মায়ের কাছে, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে বাবার কষ্টের কথা শুনে জ্যাঠামশায়ের প্রতি মনে মনে এক ধরনের বিরূপতা গড়ে উঠেছিল। বাবার অকাল-মৃত্যুর জন্যও তিনি দায়ী করেন নিরুদ্দেশ জ্যাঠামশাইকে।

চল্লিশ লক্ষ টাকার ঋণের সঙ্গে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ও কন্যার দায়িত্বও তিনি কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে যান। তার বাবা তাদের আদরের সঙ্গে প্রতিপালন করেছেন। শুধু তার জ্যাঠতুতো দিদিকে নয়, তার দুই মেয়েকেও যোগ্য ঘরে বরে বিয়ে দিয়ে পিতৃব্যের দায়িত্ব ষোল আনা পালন করেছেন। নিজের সন্তানদের থেকে পার্থক্য করার কথা চিন্তা করেননি।

জ্যাঠামশায়ের প্রতি যত রাগই থাক্, বাবার কর্তব্যপরায়ণতা ও ভ্রাতৃভক্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি দিব্যনারায়ণ। তিনি জানেন, সর্বাংশে তিনি পিতার যোগ্য পুত্র হতে পারবেননা। পিতার অসামান্য উদারতা, মমতা ও ক্ষমাশীলতা তার চিন্তার বাইরে। তবু পিতার প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগের জন্যই পিতার কোন কোন আদর্শকে অনুসরণের চেষ্টা করেন।

তিনি জানেন, অকালমৃত দাদার বিধবা ও তার পুত্রকন্যাদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও অপরাধী ব্যাভিচারী রুদ্রনারায়ণের প্রতি সব কিছু সত্ত্বেও যে সস্নেহ প্রশ্রয় তিনি না দেখিয়ে পারেন না, তার উৎস আর কেউ নয়, তার উৎস তার পিতা.

তার উৎস তার 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গঃ' আদর্শ। মানুষ যাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে, তার কিছু কিছু প্রভাব অজ্ঞাতসারেই পড়ে যায় তার চরিত্রের ওপর।

দিব্যনারায়ণ বোঝেন, মানুষের চরিত্রের অনেক গলিঘুঁজির কিনারা পাননা তিনি। বিনোদিনীকে তিনি বুঝতে পারেননি। বিদ্যুৎপ্রভাও শেষ পর্যন্ত তার কাছে রহস্যময়ীই থেকে গেল। কিন্তু নিজের কোন কোন আচরণের হঠাৎ হঠাৎ ব্যাখা খুঁজে পান। সে ব্যাপারে তার নিজের কৃতিত্ব যে খুব উল্লেখযোগ্য, তা বলা চলে না। তার মায়ের মুখে, নিকট আত্মীয়স্বজনের মুখে শোনা কোন কোন মন্তব্যও তাকে সাহায্য করেছে বৈকি সেই ব্যাপারে।

তৃতীয়া স্ত্রীকে দেখে ক্ষণিকের জন্য যে হতাশা বোধ করেছিলেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন দিব্যনারায়ণ। মনকে পুরোপুরি বশে আনা খুব সহজ নয়। অনেক চেষ্টা করেও দিব্যনারায়ণ খুশীর জোয়ারে ভাসতে পারলেন না। বিদ্যুৎপ্রভার স্খলনও তার সৌন্দর্যের স্মৃতিকে ম্লান করতে পারলনা।

সুরবালা রূপসী না হলেও নিঃসন্দেহে সুশ্রী। তবু তাকে দেখে দিব্যনারায়ণের মন মাঝেমাঝেই বিষণ্ন হয়ে যায়। যে চোখ জোরালো আলো দেখে অভ্যস্ত, সেই চোখে মিটমিটে আলো ভাল লাগার কথা নয়। তবু আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে দিব্যনারায়ণ সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে যান। স্ত্রীকে আদরে না ভাসিয়ে দিন, তাকে বিনোদিনীর মত অনাদর করলেন না।

সংসারের আর দশজন মানুষের মত নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন দিব্যনারায়ণ। ব্যবসা নিয়ে আগের থেকে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একবারের জন্য হলেও যে অপবাদের ভাগী হয়েছিলেন, তা ধুয়ে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর যেন তিনি। এখন তিনি আরও অনেক রকম মাল সরবরাহ করছেন। ভাইপোর ওপর কিংবা কর্মচারীদের ওপর বেশি নির্ভর না করে নিজেই সেসবের তদারকি করছেন।

সংসারে বিদ্যুৎপ্রভার মত রূপসী স্ত্রীর অভাব ভুলতে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিজেকে বেশি করে জড়িয়ে ফেললেন দিব্যনারায়ণ। মদ্যপানের রেওয়াজ তাদের বাড়িতে পিতামহের আমল থেকেই রয়েছে। দিব্যনারায়ণও অল্প বয়স থেকেই মদ্যপানে অভ্যস্ত। দাদার মত মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস তার ছিলনা। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ধকল সামলাতে মদ্যপানের মাত্রা তিনি বাড়িয়ে দিলেন।

দিব্যনারায়ণ বুঝতেন, মারা গিয়েও বিদ্যুৎপ্রভা তাকে রেহাই দিচ্ছেনা। সেই দুষ্টা নারী যখন তখন নিঃশব্দে তার সামনে এসে দাঁড়াত। পায়ে মল বাজিয়ে তার সামনে ঘুরে ফিরে বেড়াত। তার দিকে পদ্মপলাশ চোখের অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত। দিব্যনারায়ণের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে চাইত না।

বৎসরান্তে সন্তান জন্মাল। পুত্রসন্তান। সেই সন্তানের মুখ দেখে দিব্যনারায়ণের বুকের জ্বালা অনেকখানিই জুড়োল। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

বিদ্যুৎপ্রভা তাকে সন্তান দিতে পারেনি। পুত্রের জননী হয়ে সুরবালা বিদ্যুৎপ্রভাকে হারিয়ে দিল। সন্তান নিয়ে আদিখ্যেতা করলেন না বটে, কিন্তু দিনে একবারের জন্য অন্ততঃ পুত্রমুখ দর্শন না করলে তার ভাল লাগত না।

সময়ের সাথে একটু একটু করে আগের বঞ্চনা, আগের কষ্ট ভুলে গেলেন তিনি। সংসার ও ব্যবসায়ের দ্বৈত দায়িত্ব বহন করার চাপ আর যেন গুরুভার বোধ হোত না। সুরবালার প্রতিও শারীরিক তাগিদের অতিরিক্ত এক ধরনের স্নেহ ও মমতা বোধ করতে লাগলেন দিব্যনারায়ণ। মনে হোল, রূপে না হোক্, স্বভাবে সুরবালা বিদ্যুৎপ্রভার চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেয়। আরও মনে হোল, আবার যে তিনি বিদ্যুৎ-প্রভার মত অতি রূপসী মেয়েকে বউ করে আনেননি, তা একরকম ভালই হয়েছে। সৌন্দর্যের অনেক জ্বালা। পরপুরুষের মতিভ্রম ঘটায়। সংসারে নারীশরীরলোলুপ পুরুষের অভাব নেই। সুরবালাকে নিয়ে সেরকম সমস্যা দেখা দেবে না।

অন্তরীক্ষে বিধাতাপুরুষ বুঝি আর একবার মুখ টিপে হেসেছিলেন। মায়ের নির্দেশে বেনারসে কুলগুরুর কাছে যেতে হোল দিব্যনারায়ণকে। দিব্যনারায়ণের অভিপ্রায় ছিল, আশে পাশে আরও কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করে তবে তিনি কোলকাতায় ফিরবেন। পত্র মারফৎ সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলেন বাড়িতে। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। কলকাতার বাইরে গিয়েও মনকে নির্ভার দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে পারলেন না। ব্যবসার কথা ভেবে মন উচাটন হোল। বাড়ির জন্যও মন কেবলি উড়ু উড়ু করতে লাগল। অতএব কার্যতঃ তিনি নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগেই ফিরে এলেন কোলকাতায়।

নীচে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে দিব্যনারায়ণ উঠে গেলেন ওপরে। দেড় বৎসরের পুত্রের মুখ দর্শনের তীব্র ইচ্ছা অনুভব করেছিলেন তিনি।

ঘরের দরজা বন্ধ দেখে জোরে ধাক্কা দিলেন দিব্যনারায়ণ। কেউ দরজা খুলল না। দিব্যনারায়ণ মনে করলেন, সুরবালা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার জোরে ধাক্কা দিলেন। একটু পরে দরজা খুলে দিল রুদ্রনারায়ণ। দাদাকে দেখে দারুণ ত্রাসে চোরের মত দ্রুতপদে পালিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। একবার নয়—বারবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর কার হয়েছে? তার জন্মলগ্নে গ্রহবৈগুণ্যের কোন্ দোষে এমনটি ঘটছে? বিধাতা তাকে বারবার কেন এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন? এতো তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

বিদ্যুৎপ্রভার আগুনের মত রূপ সুরবালার নেই বলে তিনি যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। একবার ঘর পুড়তে দেখেও শিক্ষা হোল না তার?

মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করে নিলেন দিব্যনারায়ণ। আর কোন হঠকারিতা নয়। গতবার তাকে কম হ্যাপা পোয়াতে হয়নি। প্রকাশ্যে তার মুখের ওপর কেউ কিছু বলেনি ঠিকই। কিন্তু ঠারে ঠোরে অনেক কিছু শুনতে হয়েছে। মনে

মনে চোর হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। বাইরের লোক তো বটেই, ঘরের লোকেও তাকে মনে মনে সন্দেহ করে আসামী করে রেখেছিল।

দিব্যনারায়ণ জানেন, তার মা, বৌদি এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তাকে নির্দোষ ভাবে নি। বিদ্যুৎপ্রভার মৃত্যুর মধ্যে যে তার হাত আছে, সে ব্যাপারে তারা নিঃসংশয়। কারণটা অবশ্য তাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হয়নি বলেই ধারণা তার। তবে তিনিও চাননা, সঠিক কারণটা তারা অনুমান করে।

অসতী স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়ার বড় লজ্জা। কোথায় যেন পড়েছিলেন, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর স্বামীর মাথায় দুটি শিঙ গজায়। অসম্মানের লজ্জা তিনি নিজে যথেষ্টই ভোগ করছেন। অপরের কাছে তা প্রকট করে নিজেকে আরও ছোট করে না-ই বা তুললেন!

বাইরে থেকে কোন কিছু কেউ টের পেলনা। কিন্তু দিব্যনারায়ণ নিজেকে অনেকখানি সরিয়ে নিলেন সংসার থেকে। সুরবালার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন।

সুরবালা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দিব্যনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চাইছে। তিনি তাকে সে সুযোগ দিলেন না। অনেক রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকতেন—সুরবালার সঙ্গে এক শয্যায় শুতেন না। তিনি স্পষ্ট করে সুরবালাকে জানিয়ে দিয়েছেন, অসতী স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শোবেন না। সে যেন মাটিতে আলাদা শয্যায় তার শিশুপুত্রকে নিয়ে শোয়। নিজের সন্তানের দিকেও তাকাতে ইচ্ছা হোত না দিব্যনারায়ণের।

সন্তানের সঙ্গে তার মুখের যদি মিল না থাকত, তাহলে হয়ত বা তাকেও বিসর্জন দিতেন। কিন্তু সন্তানটি পুরোপুরি তার ছাঁচে গড়া। তাকে কোন মতেই অপরের সন্তান বলে মনে করা সম্ভব নয়।

তবু তার মন অশান্ত হয়। পুত্রমুখ দর্শনের সেই আনন্দ আর ফিরে পান না। দুশ্চরিত্রা মায়ের গর্ভজাত সন্তান তার কাছে বাড়তি জ্বালা বলে মনে হয়।

রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ববৎ রইল। গতবারের মত এবারও অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু জানালেন না দিব্যনারায়ণ। কিন্তু পরিবর্তন দেখা গেল সুরবালার মধ্যে। উন্মাদ হয়ে গেল সে। অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদের মত চিৎকার করে, মাথার চুল ছেঁড়ে, মশারীতে আগুন লাগিয়ে দিতে যায়।

সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েটি হঠাৎ কেন উন্মাদ হয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারে না। দিব্যনারায়ণের মা প্রমদাসুন্দরী প্রমাদ গুণলেন। তিনি নিজে দেখেশুনে ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন ছেলের। মেয়ের বংশে কেউ পাগল ছিল বলে শোনেননি। শুনলে তার অমন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে কখনই এই মেয়ের বিয়ে দিতেন না। তাছাড়া দু'তিন বছরের মধ্যে কোনদিন কোন রকম অস্বাভাবিকতার নিদর্শন চোখে পড়েনি।

প্রথমেই তার মনে হলো, বিনোদিনী ও বিদ্যুৎপ্রভার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ বাড়ির আনাচে কানাচে। সুরবালার সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন তাদের

সহ্য হচ্ছে না। তাকে পাগল করে তারা তাদের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করছে।

দিব্যনারায়ণকে তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে বললেন। বলবনা বলবনা করেও নিজের আশঙ্কা ও সন্দেহ ব্যক্ত করে ফেললেন।

দিব্যনারায়ণ পাত্তা দিলেন না। বিরক্তভাবে মায়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন তিনি।

—শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলেই কি পাগলামি সেরে যায়? তাহলে পৃথিবীতে আর পাগল থাকত না।

প্রমদাসুন্দরী তবু পীড়াপীড়ি করেন।

—আমার কথাটা রাখ, বাবা। অন্ততঃ কুলগুরুকে আসতে বলি। তিনি এসে যা বিধান দেবেন, তাই করা হবে। কত বড় বংশ আমাদের কুলগুরুর। তুই তো জানিস না। অনেক শক্তি ধরেন ভোলা মহারাজ। কর্তা কতবার বিপদে পড়ে ওঁকে স্মরণ করেছেন। উনি এসে মুশকিল আসান করে দিয়েছেন। শ্বশুরমশায়ও ভোলা মহারাজের বাবা শিবকালী মহারাজকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। অসুবিধায় পড়লেই ওঁর শরণাপন্ন হতেন। তিনি যা বিধান দিতেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

চুপ করে শুনে গেলেন দিব্যনারায়ণ। হাঁ না কিছুই বললেন না। প্রমদাসুন্দরী ছেলেকে চেনেন। সত্য কথা বলতে কি, কর্তাকেও তিনি অতখানি ভয় করতেন না, যতখানি ভয় করেন এই ছেলেকে।

বড় আর ছোট ছেলের থেকে আলাদা ধাতুতে গড়া এই ছেলে। অল্প বয়সেই কেমন রাশভারী ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। বাপের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আর ছেলেও বাপকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছে। কোনদিন বাপের অবাধ্য হয়নি। প্রথম স্ত্রীকে পছন্দ হয়নি। তবু বাবা অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেনি। যতদিন বাবা জীবিত ছিলেন, ততদিন বিনোদিনী এ সংসারে ঠাঁই পেয়েছে। বাপের মৃত্যুর পরই বউকে বাপের বাড়ি দিয়ে এসেছে। আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেনি।

তিনি বোঝেন, কর্তা যদি আরও কয় বছর বেঁচে থাকতেন, তাহলে সংসারের হাল অন্য রকম হোত। যথাসময়ে বিনোদিনীর গর্ভে সন্তান জন্মাত। শ্বশুরের আদরের বউকে অস্বীকার করতে পারতনা ছেলে। ভালই হোত তাহলে। বিনোদিনীর রঙ নীরস ছিল। কিন্তু স্বভাবে সে ছিল লক্ষ্মীমন্ত। তিনিও প্রথমে স্বামীর পছন্দের তারিফ করতে পারেন নি। পরে বিনোদিনীর শান্ত, সুশীল, নম্র ব্যবহারে তার মনও দ্রবীভূত হয়েছিল। বিনোদিনীর চেহারাও পরে তত খারাপ মনে হয়নি। সুঠাম গড়ন ছিল বিনোদিনীর। মুখশ্রী মিষ্টি ছিল। কিন্তু সেসব ভেবে আর লাভ কি? দুঃখে কষ্টে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল নাকি বিনোদিনী। মেয়েটার অকালমৃত্যুর কারণ যে তার ছেলে, তা তিনি বোঝেন।

প্রমদাসুন্দরীর ক্ষমতা ছিলনা সেই ঘটনাকে প্রতিহত করার। ছেলে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না ঠিকই। কখনই রুক্ষ কথা বলে না। কর্তব্য পালনেও ত্রুটি করে না। কিন্তু বাপের প্রতি অগাধ ভালবাসার সমুদ্রে মায়ের জন্য দু'এক ফোটা বিন্দুর বেশি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা যে নেই, তা তিনি ভালভাবেই বোঝেন। মাঝেমাঝে ছেলের কঠিন গাম্ভীর্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, পরশুরামের মত এই ছেলেও বুঝি বাপের নির্দেশে তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না। অথচ সংসারে তার কর্তৃত্বে কোন আঁচড় পড়তে দেয় না সে। বউদের, মেয়েদের, দাসদাসীদের ওপর মায়ের কর্তৃত্ব রয়েছে অব্যাহত।

তবু যখনি ছেলের সঙ্গে মতান্তর ঘটে, তখনই প্রমদাসুন্দরীর মনে এসব চিন্তা হানা দেয়। বিদ্যুৎপ্রভার মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয়, তা বুঝতে অক্ষম নন তিনি। কে বিদ্যুৎপ্রভাকে খুন করেছে বা করিয়েছে, তা বুঝতেও অসুবিধা হয় না তার। ছেলের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণেও কোথায় যেন কুণ্ঠাবোধ করেন তাই। তিনি যে কর্তাকে বলে ছোট ছেলের নামে ব্যবসার নামকরণ করিয়েছেন, তার মূলেও তো সেই ভয় কাজ করেছে।

অবশ্য দিব্যনারায়ণ ভাইকে খুবই ভালবাসে। পারলে বুক দিয়ে আগলে রাখে। তবু কখন কি হয়, বলা যায় না। তিনি বোঝেন, এই ছেলে তার সবচেয়ে গুণবন্ত। আবার সকলের চেয়ে বেশি কঠিন হৃদয়েরও অধিকারী। তিনি মা। তার বুকের দুধ দিয়ে একটু একটু করে বড় করে তুলেছেন ছেলে মেয়েদের। কিন্তু নিজের গর্ভজাত এই সন্তানকে একটু বড় হওয়ার পর থেকেই সমীহ করে এসেছেন। তার নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যকে ভয় পেয়েছেন। মা ছেলের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি দুজনের মধ্যে।

প্রমদাসুন্দরী ছেলেকে পীড়াপীড়ি করতে সাহস পান না। যাবার সময় ক্ষীণ স্বরে বলেন—'যা ভাল বুঝবি, করবি। আমি তো মেয়েমানুষ। এ বাড়ির পুরুষরা তো মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করেনি কোনদিন। বংশের ধারা আমি বদলাব কি করে?'

প্রমদাসুন্দরী চলে যাওয়ার পর দিব্যনারায়ণের ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল। পরপর দুটি মেয়েমানুষ তাকে অনেক খেল দেখিয়ে গেছে। মেয়েমানুষের প্রতি আর তার আস্থা নেই। মনুসংহিতায় মেয়েমানুষকে সকালে সন্ধ্যায় কেন অগ্নিশুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, তা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এখন অনেক প্রবাদ প্রবচনের ব্যাখ্যা খুঁজে পান তিনি। "উড়বে নারী, পুড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"—দিব্যনারায়ণ ভাবেন, এতটুকু অসত্য নেই কথাটার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত নারীকে বোঝা যায় না।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নারীকে বাদ দিয়ে হয় না। নারীর ভূমিকা তাই অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নারীর চাপল্য, নারীর লঘুতা বহু অনর্থ ঘটায়। ঋষিরা

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তারা তাদের দূরদর্শিতা দিয়ে নারীর যে মূল্যায়ন করেছেন, তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

দিব্যনারায়ণ অন্যমনস্ক হয়ে যান। পুরুষের মনও কম রহস্যময় নয়। ঘুরে ফিরে বিদ্যুৎপ্রভার মুখ, তার অনিন্দ্য মধুর কণ্ঠস্বর, তার চপল হরিণীর মত চলন মনে পড়ে যায়। তিনি পরপর তিনবার দারপরিগ্রহ করেছেন। দুজনের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সুরবালার গর্ভে তার একটি সন্তান জন্মেছে। কিন্তু সেই পাপিষ্ঠা সুন্দরীকে আজও তিনি ভুলতে পারেননি। তার অশুচি শরীর পরিত্যজ্য বোধে জঞ্জালের মত ফেলে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তার অনুপম রূপযৌবনের স্মৃতি এখনও দাহ সৃষ্টি করে মনে।

নিজেকেই বুঝে উঠতে পারেননা তিনি। নিজের ওপর রাগ হয়। ব্যভিচারিণীর প্রতি আসক্তি কি ব্যভিচারের লক্ষণ নয়? বংশের ধারা কি তিনিও অতিক্রম করতে পারছেন না?

দিব্যনারায়ণ উঠে দাঁড়ান। মন বড় অশান্ত হয়েছে। সুরবালার জন্য কোন মায়ামমতা বোধ করছেন না। বিদ্যুৎপ্রভাকে যথোচিত শাস্তি দিয়েছেন। সুরবালাকেও শাস্তি পেতে হবে। সে যে গর্হিত অন্যায় করেছে, তার ক্ষমা নেই, তার ক্ষমা হয় না। যত তাড়াতাড়ি তার চোখের সামনে থেকে এই পাপ বিদায় হয়, ততই মঙ্গল।

মাকে সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়। অনেক কথা বুকে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছেন।

দিব্যনারায়ণের ঠোঁটে ক্রুর হাসি খেলে গেল। তার ডান হাত যা করবে, বাঁ হাতকেও তা জানতে দেবেন না। ঈশ্বরের দয়ার ওপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার শিক্ষা তার রপ্ত হয়নি। শরীরে মনে যথেষ্ট শক্তি ধরেন দিব্যনারায়ণ। সেই শক্তির যথাযথ প্রয়োগে পিছপা নন তিনি।

মা যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তা তিনি বুঝেছেন। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে তিনি অপারগ।

রাত অনেক হয়েছে। দিব্যনারায়ণ শোবার ঘরে গিয়ে আলমারী খুলে একটি চাবির গোছা নিয়ে এলেন। সুরবালা নীচে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। রক্ষের কথা, তার শিশুপুত্রটি এখন মায়ের হেফাজতে। বর্তমানে মা-ই তার দেখাশোনা করেন।

ওপরে নীচে ঘরের সংখ্যা বড় কম নয়। সব ঘর খোলা থাকে না। মাঝেমাঝে দিব্যনারায়ণ তালা খুলে একেকটি ঘরে ঢোকেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের আস্বাদ নেন। তার মনে এক স্বপ্নময় আবেশ তৈরি হয়।

পিতৃ পিতামহের অয়েল পেণ্টিংগুলির তাকিয়ে মোহগ্রস্ত হন তিনি। মধ্যরাতে সেগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। দিব্যনারায়ণ তাদের চোখে, তাদের ওষ্ঠে, তাদের চিবুকে অনেক অব্যক্ত বক্তব্য খুঁজে পান। নিশাচর প্রেতাত্মার মত ঘরে ঘরে

ঘুরে বেড়ান। পূর্বপুরুষদের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে নিজের মনে যে সব প্রশ্ন উদ্বেল হয়ে ওঠে, সেগুলি তুলে ধরেন।

সব সময়ে সেগুলি নিরুচ্চার থাকে না। মাঝেমাঝে জোরে জোরে তিনি তার প্রশ্ন, সংশয় কিংবা কৌতূহল ব্যক্ত করেন। নিস্তব্ধ রাতে নিজের কণ্ঠস্বরই কেমন অপার্থিব শোনায় নিজের কানে। নিজেকেই তখন অন্য মানুষ বলে মনে হয় দিব্যনারায়ণের। মনে হয়, তিনিও বুঝি মৃতদের জগৎ থেকে জীবিতদের জগতে ফিরে এসে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন।

আজ মন্মেুথের মত তালা খুলে যে ঘরে ঢুকলেন, সেখানে দরজার মুখোমুখি দেয়ালে চোখে পড়ে অষ্টম এডওয়ার্ডের বিশাল জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

দিব্যনারায়ণের মনে অনেক প্রশ্ন আছে এই ছবিটি নিয়ে। প্রেমের জন্য রাজমুকুট ত্যাগ করেছিলেন এই যুবরাজ। সেই প্রেম ছিল পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম। মিসেস সিম্পসনের প্রতি ভালবাসার মূল্য হিসাবে ধরে দিয়েছিলেন তার প্রাপ্য রাজমুকুটটি। পরস্ত্রীর প্রতি এই ভালবাসা কিভাবে মেনে নিলেন তার পূর্বপুরুষরা?

অবশ্য তাদের পরিবারে পরস্ত্রীসংসর্গ গতানুগতিক ঘটনা। তার জ্যাঠামশায় তো সে ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কলকাতার বিশিষ্ট রাজপরিবারের এক সুন্দরী কুলবধূকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুর্বলতা এক জিনিষ, আর তাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা আরেক জিনিষ। আর শুধু কি সমর্থন বলা চলে? অষ্টম এডওয়ার্ডের আদর্শকে যেন পুজো করা হয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে রুষ্ট হয়ে ওঠেন দিব্যনারায়ণ। অষ্টম এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে মনে হোল, তার পরিবারকে যেন নিয়ন্ত্রিত করছেন এই ব্যক্তি। তার অশুভ প্রভাব যেন বিস্তার করে চলেছেন পরিবারের ওপর। দিব্যনারায়ণ ঠিক করলেন, কালই সরিয়ে ফেলবেন এই ছবি। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় রাখবেন না একে।

কিন্তু অষ্টম এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। কেমন নেশাগ্রস্তের মত অপলকে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অষ্টম এডওয়ার্ড তাকে আকৃষ্ট করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বিচিত্র এক ভয়ের শিরশিরানি টের পেলেন দিব্যনারায়ণ। অষ্টম এডওয়ার্ড স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাকে উৎখাত করার ধৃষ্টতা দেখে জবাবদিহি চাইছেন।

এক রকম ভূতগ্রস্ত মানুষের মত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দিব্যনারায়ণ। দরজায় তালা লাগিয়ে তবে তার বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ করলেন। অষ্টম এডওয়ার্ড পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়ে বসেছেন। তার সাধ্য কি তাকে উৎখাত করেন?

কিন্তু অসতী স্ত্রীকে তিনি বেশিদিন সংসারে রাখবেন না। তার সংসার করার বাসনা চুকেবুকে গেছে। ভাঙ্গা মন জোড়া দেওয়া সহজ নয়।

অতঃপর তিনি এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাবেন লণ্ডনে। উইলিয়াম সাহেবের

সঙ্গে কথা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে। শিগগিরই পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করে রওনা হবেন তিনি। চিরতরে ত্যাগ করবেন দেশ, দেশবাসী ও সংসার।

দিব্যনারায়ণের ঠোঁটে ফুটে ওঠে দৃঢ় সংকল্পের ভঙ্গী। একটু আগের অসহায় ভঙ্গী মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। অতীত থেকে চোখ সরিয়ে ভবিষতের দিকে তার দুচোখ নিবন্ধ করে দৃঢ় সুষম পদক্ষেপে একটা একটা করে ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙ্গতে থাকেন দিব্যনারায়ণ ঘোষাল।

॥ তিন ॥

কয়েক দিন পরেই এক দুর্ঘটনা ঘটল। সুরবালা বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হোল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার লাশ উদ্ধার হোল ঝিলের নীচে থেকে।

ইদানীং সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। উন্মত্ত অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেই ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, না কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তা নিয়ে কিছু কথা চালাচালি হোল ঠিকই। তবে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুর মত সে ব্যাপারটাও ধামাচাপা পড়ে গেল।

থানার ও. সি. দিব্যনারায়ণের বন্ধু। অতএব কেউ তা নিয়ে গোলমাল বাঁধাতে সাহস করল না। মনের মধ্যে উদগত প্রশ্ন বা সন্দেহ মনেই রয়ে গেল। আর দশটা দুর্ঘটনার মত, আর দশটা অপঘাত মৃত্যুর মত সামান্য আলোড়ন তুলে এই ঘটনাটাও থিতিয়ে গেল এক সময়ে।

দিব্যনারায়ণের ব্যবহারে কোন তাপ উত্তাপ দেখা গেলনা। অনেকেরই মনে হোল, তিনি যেন অনেক স্বস্তি বোধ করছেন। পাগল স্ত্রীর সংসর্গ ভাল লাগার কথা নয়। দীর্ঘদিন তার জের বয়ে বেড়াতে দিব্যনারায়ণের ভাল লাগবে কেন?

দিব্যনারায়ণের চরিত্রের কাঠিন্য কারুরই অজানা নয়। তিনি যে সহজে বিচলিত হননা, তা তার পরিবারের সকলেই জানে। পরপর তিনবার পত্নীবিয়োগের ধাক্কা সহ্য করেও তিনি যে অটল থেকে যাবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু খুব কাছে থেকে যারা দেখল, তাদের মনে হোল, একটু যেন পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে তার মধ্যে। বিদ্যুৎপ্রভার মৃত্যুর পরও এতখানি আলগা দেখা যায়নি তাকে।

দিব্যনারায়ণের মা তার ঘোরতর সংসারী ছেলের মধ্যে সংসারনির্লিপ্ত উদাসীনতা লক্ষ্য করে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই ছেলে সংসারের হাল ধরে রয়েছে। ছোট ছেলে আদুরে গোপাল। তাকে স্নেহ করা যায়। তার ওপর নির্ভর করা যায় না। এই ছেলে সংসারবিরাগী হলে সকলের সমূহ বিপদ।

সুরবালা একটি শিশুপুত্র রেখে গিয়েছে। তাকে মানুষ করার জন্যও ছেলের

আবার সংসারী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ছেলের ভাবগতিক দেখে সাহস হয়না তাকে সেকথা বলতে। মনে মনে প্রমদাসুন্দরীর কেমন একটু ভয়ও যেন ধরে গিয়েছে। বউভাগ্য ভাল নয় তার ছেলের। পরপর তিনবার যার ভাগ্যে বউ টিঁকলনা, চতুর্থবারে তার ভাগ্যে অন্যরকমটা ঘটবে, এমন কথা ভরসা করে ভাবতেও পারেন না।

তবু বিষয় আশয়ের কথা ভেবে, কর্তার অসম্পূর্ণ কাজের কথা ভেবে, ছেলের কথা ভেবে ও সংসারের আর পাঁচ জনের কথা ভেবে তাকে ছেলের পুনর্বিবাহের কথা ভাবতে হয়।

ছেলেকে না জানিয়েই লোক মারফৎ পাত্রীর খবরাখবর সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি। তার দুই বিবাহিতা কন্যা স্বামী পুত্র কন্যা সহ তার কাছেই থাকে। তাদেরও সাহায্য নিলেন।

মেয়েরা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে একাধিক সম্বন্ধ নিয়ে এল। প্রমদাসুন্দরী সেগুলির মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত পাত্রী নির্বাচন করে ছেলেকে জানালেন। কিন্তু ছেলে অনড়। তার এক কথা। সে আর বিবাহ করবে না। সংসার করার আর বাসনা নেই তার। মা যেন রুদ্রনারায়ণের জন্য পাত্রী খোঁজেন। তার স্ত্রী এসে হাল ধরুক সংসারের।

প্রমদাসুন্দরী মাতৃহারা শিশুপুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ছেলেকে। কিন্তু ছেলে সমান নির্বিকার। সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব নেই। মা আছেন, বউদি আছেন, বোনেরা আছে, রুদ্রনারায়ণের বিবাহ দিলে তার স্ত্রী আসবে। তার সন্তানের দেখাশোনা করার লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়।

আর সৎমা এসে সতীনের ছেলেকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরবে, এতখানি আশাই বা করছেন তিনি কোন যুক্তিতে? সৎমায়ের অন্য রকম আচরণের কথা তো তার অজানা থাকার কথা নয়?

প্রমদাসুন্দরী তবু কাকুতিমিনতি করেন। তার পাষাণহৃদয় ছেলের মন অত সহজে টলার নয়। স্বামীহারা স্ত্রীলোকের জোর কতখানি কমে যায়, তা প্রমদাসুন্দরী বোঝেন না, এমন নয়। তবু সন্তানের ওপর মায়ের দাবি বা অধিকারের জোরে বিধবা স্ত্রীলোক সংসারে তার কর্তৃত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

প্রমদাসুন্দরীর দুর্ভাগ্য। তার জীবিত দুটি ছেলের মধ্যে একটি হাবাগবা, অকর্মণ্য, অলস, আত্মসুখপরায়ণ। অপরটি সর্বাংশে উপযুক্ত হয়েও ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার আঁচলের শাসন মানার নয় এই ছেলে।

কোনদিনই মায়ের অনুগত ছিলনা সে। তার সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে বাবার প্রতি। কর্তার সঙ্গে ঝগড়া হলে ছোটবেলায় ছেলে বাপের পক্ষ নিত। তার সঙ্গে বাপের হয়ে ঝগড়া করত। বড় হয়ে প্রকাশের ধারা পালটেছে। কিন্তু বাপের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রমদাসুন্দরী। আদর্শবান পুরুষ ছিলেন তার স্বামী। তিনি স্বামীর যোগ্য নন। তবু মনে মনে যোগ্যতম পুত্রটির ভালবাসা পাবার

জন্য লোভ ছিল বৈ কি। অস্বীকার করতে পারবেন না, তার জন্য স্বামীর প্রতি এক ধরণের ঈর্ষাও বোধ করতেন।

আজ স্বামী জীবিত থাকলে এ সংসার অন্য রকম হোত। অনেক অশান্তির হাত থেকে বেঁচে যেতেন তিনি। তার সাবালক উপযুক্ত পুত্র তাকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করতে পারত না।

শাসন না করেও কর্তা তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে জানতেন। প্রমদাসুন্দরী তা জানেন না। তার জ্বালা তাকে ক্রমাগত সহ্য করে যেতে হচ্ছে।

প্রমদাসুন্দরী স্থির করেন, তিনি নিজে আর ছেলেকে কোন অনুরোধ করবেন না। জামাইদের দিয়ে বা মেয়েদের দিয়ে চেষ্টা করবেন ছেলেকে বোঝাতে।

ঘটকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হোল। দিব্যনারায়ণকে সোজাসুজি সে ব্যাপারে কিছু বলা হোল না। বাড়িতে ঘটকদের আনাগোনা চলতে থাকল। মেয়েপক্ষ থেকে লোকজনের আনাগোণারও বিরাম নেই।

দিব্যনারায়ণ অনুমান করেন, তার জন্য সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলছেনা। নিজে থেকে উপযাচক হয়ে প্রশ্ন করতে বাঁধে।

তাছাড়া পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নন তিনি। রুদ্রনারায়ণের জন্য সম্বন্ধ দেখতে বলেছিলেন মাকে। পুরোপুরি নিঃসংশয় না হয়ে কিছু করতে পারেন না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অস্থির বোধ করেন, দুর্বল বোধ করেন দিব্যনারায়ণ। কেবলি মনে হয়, চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। তিনি তার বিরাট শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একাকী কিছু করতে অপারগ। তাকে বধ করার জন্য সকলে মিলে উঠে পড়ে লেগেছে।

কিন্তু তিনি দিব্যনারায়ণ। সহজে হার মানবেন না। তাকে আত্মরক্ষার জন্য "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতি অনুসরণ করতে হবে।

কোন নারীর সঙ্গে নিজের জীবনকে আর জড়াবেন না। নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার। "পুড়বে নারী, উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই" কথাটা যে কতবড় সত্য, তা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—পুন্নাম নরকের ভয় তার নেই। শিশুপুত্রটি তাকে নরকভোগ থেকে বাঁচাবে। তবে কেন আবার জ্বলন্ত অগ্নিতে সাধ করে আত্মাহুতি দেবেন?

দিব্যনারায়ণ আপ্রাণ চেষ্টায় বিদেশ যাত্রার সব ব্যবস্থা দ্রুত সমাধা করে ফেললেন। বাড়িতে কাউকে কিছু জানালেন না। তিনি জানেন, জানালে বাধা আসবে। নানা ছলছুতোয়, নানা ওজুহাতে তাকে নিবৃত্ত করা হবে। তার পরমাত্মীয়রাই তার সাধে বাদ সাধবেন।

তিনি মাকে বললেন, তার মন ভাল লাগছেনা। বেনারসে গিয়ে কয়েক দিন কাটিয়ে আসবেন। ছেলের মানসিক অশান্তি মায়ের অজানা নয়। তিনি সরল বিশ্বাসে মেনে নিলেন।

দিব্যনারায়ণ বোম্বাই রওনা হলেন। নিয়তি কেন বাধাতে? অদৃষ্ট পুনরায় তার সঙ্গে প্রতারণা করল। তার লণ্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা কিভাবে যেন জেনে ফেলল বাড়ির লোকেরা। খবরটা কে তাদের কানে তুলে দিয়েছিল, জানতে পারলেন না তিনি। পরবর্তীকালে মাঝেমাঝেই তার মনে কৌতূহল হয়েছে সেটি জানতে। কিন্তু অপরের কাছে নিজের কৌতূহল প্রকাশ করবেন কিংবা নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন, তেমন পাত্র দিব্যনারায়ণ নন।

বুদ্ধিতে কিংবা কৌশলে যে তাকে টেক্কা দিয়েছে অপর কেউ, তা তার পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়। অন্তরের কৌতূহল তাই অন্তরেই চেপে রেখেছেন বরাবর। তাকে বাইরে প্রকাশ করে অপরের কাছে করুণা বা কৃপার পাত্র হতে চাননি।

তবে প্রতিপক্ষ যে তার থেকেও বেশি বুদ্ধি ধরে মগজে, তা বহুদিন পর্যন্ত হজম করতে পারেননি দিব্যনারায়ণ। বিলেত যাওয়া হয়নি বলে যতটা দুঃখ পেয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন তাকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে বলে।

অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, যাত্রার পূর্বমুহূর্তে তার এক ভগ্নীপতি পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয় সেখানে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে তাকে নেমে আসতে বলা হোল জাহাজের ডেক থেকে। বিস্মিত হতচকিত দিব্যনারায়ণ শুনলেন, তার বিরুদ্ধে রয়েছে চুরির অভিযোগ। তিনি রুদ্রনারায়ণ এণ্ড কোং-এর তহবিল তছরূপ করে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছেন।

দিব্যনারায়ণের কাকুতিমিনতি, অনুরোধ উপরোধ, তর্জনগর্জন—সব নিষ্ফল হোল। বোম্বাই-এর অফিসার অনমনীয়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তিনি নিরুপায়। যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তারা যদি লিখিতভাবে অভিযোগ প্রত্যাহার করে, তাহলে দিব্যনারায়ণ ছাড়া পেতে পারেন। অন্যথা তাকে তার করণীয় করে যেতে হবে।

দিব্যনারায়ণের ভগ্নীপতি পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি একবার তার দিকে তাকালেন। ভগ্নীপতি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করলেন দিব্যনারায়ণ। সেই সঙ্গে তীব্র লজ্জা আর অপমানে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন তিনি।

যাত্রীদের সামনে আর সেই নাটক বেশিক্ষণ চলতে দিতে চাইলেন না। প্রতিবাদ নিরর্থক জেনে মালপত্র নিয়ে নেমে এলেন দিব্যনারায়ণ।

একটু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিল। দিব্যনারায়ণের চোখের সামনে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে তার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল দূরে বহুদূরে।

বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল তখনও। পুলিশ অফিসারটি হাতজোড় করে দিব্যনারায়ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তার বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য। ভগ্নীপতি তার হাত ধরে বারবার মিনতি করেন, তাকে ভুল না বোঝার জন্য। শাশুড়ী ঠাকরুণের নির্দেশ মেনেই ঐ অন্যায় আচরণ

করেছেন। তিনি নিরুপায়। আরও বললেন, দিব্যনারায়ণকে নিবৃত্ত করার অন্য কোন পন্থা না থাকায় তাদের বাধ্য হয়ে ওরকম চরম পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে।

নির্বাক থেকে সব শুনে গেলেন দিব্যনারায়ণ। তাকে দেখে তার ভাবান্তর টের পেলনা কেউ। বুকের ভেতরের অস্থিরতা আর দাপাদাপি বাইরে বেরোতে দিলেন না তিনি। অপরের সামনে নিজের পরাজয়ের লজ্জা জাহির করে নিজের অপমান ডেকে আনবেন, তেমন পাত্র দিব্যনারায়ণ নন।

তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন, অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা একভাবে না একভাবে ঘটবেই ঘটবে। ব্যক্তি বা পরিস্থিতি নিমিত্ত মাত্র। বিদেশ যাত্রা তার অদৃষ্টে নেই। হাজার ছোটাছুটি করলেও তা সম্ভব হবে না। দোষ যদি কাউকে দিতে হয়, তাহলে তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেবেন। ভাগ্যে না থাকলে পোড়া শোলমাছও জীবন্ত হয়ে ছুটে পালায়।

দিব্যনারায়ণ শুধু বুঝতে পারলেন না, কিভাবে তার পরিকল্পনার কথা বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেল। আত্মসম্মানবোধ তার কাছে সবচেয়ে দামী জিনিষ। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই মূল্যবান সম্পদ খোয়াতে রাজী নন তিনি। তার কাছে তাই অজ্ঞাত রয়ে গেল সেই ব্যাপারটি।

কিন্তু দিব্যনারায়ণ অনেকটা ঠান্ডা মেরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বেশি দাপাদাপি ছোটাছুটি করে কিছু হয় না। সেই কারণেই পরবর্তীকালে খানিকটা যেন নীরব দর্শক, নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন।

প্রমদাসুন্দরীর মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গুরুদেব বামাখ্যাপার সাক্ষাৎ শিষ্য। নিরুপায় হয়ে তিনি মহাদেব মহারাজার শরণাপন্ন হলেন। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তাকে কাকুতিমিনতি করলেন, একদিন তার বাড়ি এসে ছেলের হাত দেখার জন্য, কোষ্ঠী বিচার করার জন্য।

মহাদেব মহারাজ সেই অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। আতিথ্য গ্রহণ করে দুই দিন থেকে গেলেন তাদের বাড়ি। ভাল করে দিব্যনারায়ণের হাত দেখলেন, তার কপাল লক্ষ্য করলেন। সবশেষে ঠিকুজী কোষ্ঠী নিয়ে ভাল করে বিচার করে দেখলেন।

প্রমদাসুন্দরী আশ্বস্ত হলেন গুরুদেবের কথা শুনে। দিব্যনারায়ণের পুনর্বার দার পরিগ্রহের যোগ রয়েছে। এবার তার বিবাহজীবন সুখের হবে, শান্তিপূর্ণ হবে।

প্রমদাসুন্দরী শুনলেন, দিব্যনারায়ণের চতুর্থ স্ত্রী শান্ত, সুশীলা ও ধার্মিক স্বভাবের হবে। তার গর্ভে দিব্যনারায়ণের ঔরসে সাতটি সন্তান জন্মাবে।

মহারাজ আরও বললেন, দিব্যনারায়ণের পাত্রীটি পাওয়া যাবে নৈহাটির এক ভট্টাচার্য বাড়িতে।

প্রমদাসুন্দরীর কান্নাকাটি শুনে মহারাজের মন দয়ার্দ্র হোল। তিনি কথা দিলেন,

স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সেই সুশীলা পাত্রীটির সঙ্গে দিব্যনারায়ণের বিবাহ দেবেন।

সেবারের মত বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মহারাজ। কিন্তু অল্প কয়েক দিন পরেই দিব্যনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে নৈহাটির রামসদয় ভট্টাচার্যের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

পূর্ববঙ্গ থেকে এই পরিবারটি চলে এসেছে এখানে এক রকম সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। কায়ক্লেশে দিন গুজরান হয় তাদের। মহারাজ মহারাজ কোনরকম ভনিতা না করে রামসদয় বাবুকে স্পষ্ট ভাষায় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

তিনি দিব্যনারায়ণের বংশ পরিচয়, আর্থিক অবস্থা, তার তিন বার দার পরিগ্রহ করার কথা অকপটে জানালেন রামসদয় বাবুকে। কোন কিছুই লুকোলেন না।

সব কিছু জানাবার পর রামসদর বাবুকে প্রশ্ন করেন, তিনি তার বিবাহযোগ্যা কন্যাটির সঙ্গে দিব্যনারায়ণের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কিনা।

রামসদর ভট্টাচার্য যে অযাচিত ঐ প্রস্তাবে খুবই উৎফুল্ল হয়েছেন, তা তার কথা শুনেই বোঝা গেল। হাতজোড় করে বিনীত ভঙ্গীতে তিনি তার সম্মতি জানালেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দিলেন।

—আমার কোন আপত্তি নেই, মহারাজ। আমি সহায়সম্বলহীন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। কন্যার বিবাহের জন্য আমি বড়ই উদ্বিগ্ন। আমার পক্ষে এরকম সম্বন্ধ আশাতীত। তবে আমার স্ত্রী ও কন্যার মতামত না জেনে আমি মনস্থির করতে পারছিনা। পাত্র ইতিপূর্বে তিনবার দার পরিগ্রহ করেছে। আর আমার কন্যার তুলনায় তার বয়সও কিছুটা বেশি।

জবাবে মহারাজ যা বলেন, তা শুনে রামসদয় বাবু কেন, দিব্যনারায়ণও চমকে যান।

মহারাজ সহাস্যে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করেন।

—আপনি কোন ওজুহাতে আপনার কন্যাকে নিয়ে আসুন এখানে। সে এসে নিজে দেখুক। তাকে বিবাহ ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার মতামত জেনে নিন।

দিব্যনারায়ণ খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। ওরকম প্রস্তাব তার কাছে কল্পনাতীত। মহারাজ যে অতখানি আধুনিক হতে পারেন, তা তিনি স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস করতে পারতেন না।

দিব্যনারায়ণ নির্বাক ছিলেন। মুখ বুজে সব কিছু শুনে গিয়েছেন। তার জীবনদেবতা তার কাছে এই মন্ত্র জপ করে চলেছিলেন—'নিয়তি কেন বাধ্যতে', 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

রামসদয় ভট্টাচার্য প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটু কিন্তু কিন্তু

করেছিলেন। পরে মহারাজের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝে কন্যাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে বলেন।

দিব্যনারায়ণের ভাবী পত্নী দেবিকারানী কোন রকম সন্দেহ করেনি। দ্বিধাসংকোচহীনভাবে পিতার জন্য জলের গ্লাস হাতে নিয়ে প্রবেশ করে ঘরে। তার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখে মহারাজের চোখ জুড়িয়ে গেল। দিব্যনারায়ণ চেয়েও দেখলেন না। সেই কিশোরী অপরিচিত দু'জন ব্যক্তিকে দেখে অবাক হোল। মহারাজ লক্ষ্য করলেন, মেয়েটি তাদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। অবশ্য তা মুহূর্ত কালের জন্য। তার পিতা তাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখলেন না।

অতঃপর জলের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোল ঘটনাপ্রবাহ। চকিত দৃষ্টিপাতে দিব্যনারায়ণকে মনে ধরল সেই কন্যার। দিব্যনারায়ণের উচ্চবংশ, ধনদৌলত ও আভিজাত্য তার অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স ও তিন বার দার পরিগ্রহের ত্রুটি ঢেকে দিল। কন্যাপক্ষ লুফে নিল সেই প্রস্তাব। তাছাড়া পাত্রপক্ষ উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসেছিল ও তাদের কোন রকম দাবি দাওয়া ছিলনা। অতএব এক শুভলগ্নে দিব্যনারায়ণের সঙ্গে ভট্টাচার্য পরিবারের সুশীল শান্ত স্বভাবের লাবণ্যময়ী সুন্দরী কিশোরীটির বিবাহের কথা পাকা হয়ে গেল।

চতুর্থবারের বিবাহেও ধুমধামের কমতি হোল না। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বরবেশে রওনা হলেন দিব্যনারায়ণ। বাদ্যি বাজনা, আলো, বাজি কোন কিছুরই ঘাটতি থাকতে দিলেন না প্রমদাসুন্দরী। বরং ধুমধামের মাত্রা একটু যেন বেশিই দেখা গেল এবার। চতুর্থ বারের এই বিবাহ যে হেলাফেলার বিবাহ নয়, তা বোঝাতেই প্রমদাসুন্দরীর এই সবিশেষ প্রয়াস।

বিয়ের অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হোল। ফুলশয্যার অনুষ্ঠানে কিন্তু চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করা হোল না।

মহাদেব মহারাজ একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার অনেক পরে গভীর রাতে মহারাজ নববিবাহিত বরকনেকে নিয়ে বাড়ির পিছনের বাগানে উপস্থিত হলেন। দিব্যনারায়ণের নববিবাহিতা কিশোরী পত্নী তখন ঘুমে ঢুলছিল।

প্রমদাসুন্দরীর নির্দেশে লোকজনেরা যজ্ঞের কাঠ, ঘি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ পূর্বেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। মহারাজের আদেশ ছিল, অপর কোন ব্যক্তি সেখানে যাবে না।

মধ্যরাতে ঘুমে ঢুলুঢুলু অবস্থায় সেই কিশোরীর চোখে পড়েছিল, কয়েকটি অল্পবয়সী গেরুয়া পরা কুমারী মেয়ের আনাগোনা। মহারাজের নির্দেশ পালন করছিল তারা। এটাসেটা এনে দিচ্ছিল।

যজ্ঞের ধোঁয়ায় যে ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে ভাল করে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কেমন এক ধোঁয়াটে অস্পষ্ট কুয়াশা ঘেরা জগতের হাতছানি টের পাচ্ছিল সেই কিশোরী। তার অবোধ অনভিজ্ঞ মনে বিস্ময় থই পাচ্ছিলনা।

অন্তরাতে সেই মেয়েরা কোথা থেকে এল, কেন এল, আবার কোথায় চলে গেল, তা ভেবে পাচ্ছিল না সে।

গভীর রাতে নির্জন জনমানবশূন্য বাগানের গা ছমছম করা অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া, মহারাজের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ তাকে কেমন ভয়বিহ্বল করে তুলছিল।

মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিল সে। প্রত্যুষে শেষ হল যজ্ঞ। মহারাজ দিব্যনারায়ণকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, অতঃপর আর কোনদিন তিনি মদ্যপান করবেন না। দিব্যনারায়ণের কিশোরী স্ত্রীটিও রেহাই পেলনা। তাকে শপথ করতে হোল, সে কোনদিন মাংস পেঁয়াজ খাবে না।

বর কনে দুজনকেই আশীর্বাদ করলেন মহারাজ। তাদের বিবাহিত জীবন যেন নির্বিঘ্নে সুখে অতিবাহিত হয়, এই আশীর্বাদ করে তাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন তিনি।

মহারাজের নির্দেশে দিব্যনারায়ণ যন্ত্রচালিতবৎ সব কিছু করে গেছেন। কোন কিছু খতিয়ে দেখার বা বিবেচনা করে দেখার অবকাশ পাননি। তার জীবনের ঘটনাবলী তাকে অদৃষ্টবাদী করে তুলেছিল। আড়ালে সুতো টেনে টেনে যে শক্তি তাকে পুতুল নাচ নাচাচ্ছিল, তাকে অগ্রাহ্য করার, কিংবা প্রতিহত করার সাধ্য তার ছিল না।

পুরুষকার, ইচ্ছাশক্তি, কৌতূহল এবং তার সঙ্গে দীর্ঘদিনের রূপতৃষ্ণা সেই শক্তির পায়ে মাথা নত করেছিল। কনে দেখার সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখার তাগিদও তিনি বোধ করেননি। শুভদৃষ্টির সময় জড়বৎ যা করার করেছেন। তার চিন্তা, চেতনা ও অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ফুলশয্যার দিন তো তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল যজ্ঞানুষ্ঠানের দিকে, মন্ত্রোচ্চারণের দিকে।

তার পরেও বেশ কয়েকটা দিন ঘোরের মধ্যে ছিলেন দিব্যনারায়ণ। বাড়ি ভর্তি লোক। প্রমদাসুন্দরী কোন দিকে ত্রুটি রাখেননি। আত্মীয় কুটুম্ব, দাসদাসী পরিবৃত উৎসবের বাড়িতে রমরমার কোন কমতি ছিলনা। বৃহৎ বনেদী পরিবারের কর্তা দিব্যনারায়ণ বহুবিধ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন।

স্ত্রী হিসাবে যে কিশোরী তার গৃহে পদার্পণ করেছে, তার সম্পর্কে কোন রকম আবেগ বা কৌতূহল তার মনে স্থান পায়নি। মেয়েটির চেহারাও ভাল করে লক্ষ্য করেন নি। অতিথি অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর যখন উৎসবের রঙ ফিকে হয়ে আসল, তখন তিনি যেন নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এলেন। কর্তব্য দায়িত্ব ইত্যাদি বোঝাগুলো ঘাড় থেকে নামিয়ে অনেকটা হাল্কা হলেন।

এতদিন সুখ দুঃখ, রাগ অভিমান ইত্যাদি অনুভূতিগুলো যেন অসাড় হয়ে ছিল। সেগুলির সাড় ফিরে আসতেই আবার তিনি পুরনো চোখে সব কিছু দেখতে পেলেন।

অনেক রাত্রে শয়নঘরে এসে ক্লান্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেন। নতুন বউয়ের সঙ্গে তাই কোন পরিচয় হয়ে ওঠেনি।

একদিন তার অন্যমনস্কতা কেটে গেল মাসতুতো এক দিদির কথায়। এলাহাবাদে থাকেন তার এই দিদিটি। নতুন বউকে দেখে ভারী খুশি তিনি। উচ্ছ্বাসে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে অসতর্ক এক মন্তব্য করে বসেন।

—কি সুন্দর বউ হয়েছে, মাসী। ঠিক যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। যাই বল, তোমার এই বৌ কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর। এত সুন্দর আমার অন্যদের লাগেনি। মনে হচ্ছে, সামনে যেন দেবী প্রতিমা দেখছি।

দিব্যনারায়ণ তার মায়ের ঘরে এসেছিলেন কি একটা কাজে। নতুন বৌ সেখানে উপস্থিত ছিল। আর ছিল তার অন্য দুই বোন ও একটি ভাগনী।

অজ্ঞানুতেই দিব্যনারায়ণের দৃষ্টি পড়ে দেবিকারানীর দিকে। মুহূর্তের জন্য স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি। তারও মনে হোল একই কথা। নাট-মন্দিরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। দেবী প্রতিমার মতই দুর্লভ পবিত্রতার রেণু দিয়ে গড়া যেন তার মুখটি, শরীরটি।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের উচ্ছ্বাসের রাশ টেনে ধরলেন দিব্যনারায়ণ। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। তারও সেই অবস্থা। সৌন্দর্য দেখে আর তিনি মুগ্ধ হবেন না। সৌন্দর্যপিপাসা তার জীবনে অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছে।

সুরবালাও সুশ্রী ছিল। তার সুশ্রী সুন্দরী স্ত্রী দুটি কল্যাণময়ী হয়ে দেখা দেয়নি। মহারাজ স্বয়ং তার জন্য পাত্রী নির্বাচন করেছেন। তার আশীর্বাদ নিয়ে সুরু হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবন। আশা করা যায়, আর কোন অঘটন ঘটবে না। তার কোষ্ঠী ভাল করে বিচার করে সেরকম রায়ই দিয়েছেন মহারাজ।

তবু পুরনো ক্ষত এখনও শুকোয়নি। মাঝেমাঝে তা যন্ত্রণা দেয়, কষ্ট দেয়। অতীতকে ভুলে যেতে চান দিব্যনারায়ণ। সন্তর্পণে তাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে চান।

কিন্তু তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। সুরবালার সন্তান রয়েছে। সেই সন্তানকে নিয়েই সুরু হবে তাদের দাম্পত্য জীবন। আর রয়েছে স্মৃতি। বড় নাছোড়বান্দা সে। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় তাকে এড়িয়ে যাওয়া।

দিব্যনারায়ণের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উদ্গত হয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস। অন্যমনস্ক-ভাবে শ্লথ পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে যান নিজের ঘরের দিকে। অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। আবার তাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে ব্যবসার কাজে।

তিনি রুদ্রনারায়ণ নন। আত্মপর হয়ে থাকলে তার চলবে না। বিশাল সংসারের গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে। আমৃত্যু সেই দায়িত্বের বোঝা তাকে বহন করে যেতে হবে। স্বয়ং বিধাতাপুরুষই বুঝি অন্যথা চাননা। সংসার তার কাছে 'কমলি নেহি ছোড়তা'।

॥ চার ॥

দেবিকারানীর কাছে শ্বশুরবাড়ির সব কিছুই বড় অদ্ভুত লাগে। নৈহাটিতে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হোত তাদের। বাবা যজমানী করে যা পেতেন, তাই দিয়ে কোনরকমে চলত সেখানকার সংসার। সে শুনেছে, পূর্ববঙ্গে এককালে তাদের পূর্বপুরুষের জমিদারী ছিল।

নিজে সে অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েছে আগে। শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য, ধনগরিমা, কৌলিন্য ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে তার সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয়নি।

শ্বশুরবাড়ির সেই বিশাল থামওয়ালা তিনমহলা দোতলা বাড়ি দেখে দেবিকারানী যেন হকচকিয়ে গেল। বিশাল সিংদরজা, নাটমন্দির, ভিয়েন ঘর, নৈবেদ্য ঘর, ভোগের ঘর, বিশাল উঠান, পুকুর, বাগান, ইত্যাদি দেখে নিজের চোখকেই যেন নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলনা। এ কোথায় সে এসে পড়ল! বিয়ের পর ননদরা তাকে ঝিল, বাঁশবন, বিভিন্ন মহাল দেখিয়ে আনল। যত দেখে, তত যেন অস্বস্তি বোধ করে দেবিকারানী। তার মনে হয়, এখানকার সব কিছুর সঙ্গে সে বড় বেমানান।

পরিবারের লোকজনকে তার ততোধিক বিচিত্র মনে হোল! তাদের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, কোন কিছুই তার পরিচিত লোকজনেদের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনার সঙ্গে মেলে না। অনেককেই তার মনে হয় রহস্যময়, জটিল, দুর্বোধ্য।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিষয়ে সে নিঃসংশয় হোল। এদের দাম্ভিকতা গগনচুম্বী। দরিদ্র মানুষদের প্রতি এদের মনে রয়েছে প্রচণ্ড অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা। পাড়ায় দুটি পরিবার ধনে মানে কৌলিন্যে সমগোত্রীয়। তাদের সঙ্গে এদের যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক রয়েছে, তা অন্যদের সঙ্গে নেই। এদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়। রায় ও সান্যাল পরিবারকে বাদ দিলে অন্য লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারে এরা অনেকটা দূরত্ব মেনে চলে। ভাবে ভঙ্গীতে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়।

দূর দূর মহাল থেকে প্রজারা আসে নতুন বৌ দেখতে। তাদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোকজনেদের ব্যবহার লক্ষ্য করে দেবিকারানীর অস্বস্তি হয়।

সে নিজে দরিদ্র পরিবার থেকে এ বাড়িতে বধূ হয়ে এসেছে। নিজেকে সে প্রজাদের সমগোত্রীয় ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারে না। তাদের অপমান তার বুকে বাজে।

দেবিকারানী দেখে, ছোটদের মধ্যেও সেই অহমিকা ও দাম্ভিকতার ভাব সংক্রামিত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়, এ বাড়িতে সে বড় বেমানান।

অনেক কিছুই তার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ননদদের প্রত্যেকেরই ভাল ঘর

বরে বিয়ে হয়েছে। তাসত্ত্বেও, শাশুড়ী ছোট দুই মেয়েকে অধিকাংশ সময়ই নিজের কাছে রাখেন। তারা স্বামী, পুত্র কন্যা সর্মভিব্যাহারে মাসের পর মাস পিত্রালয়ে পড়ে থাকে। পরিবারের সকলেই তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে।

স্বামীর চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী সে। ইতঃপূর্বে তিন বার দার পরিগ্রহ করেছেন স্বামী। বয়সেও অনেকটাই বড়। স্বামীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা তার ভাল লেগেছিল। বিয়েতে তাই সে অমত করেনি।

আর কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার কথাটা বেশি করে ভেবেছিল বলেই কোনরকম দ্বিধা আসেনি তার মনে সে ব্যাপারে।

কিন্তু এ বাড়িতে আসার কিছু দিনের মধ্যেই অনেক কথা কানে আসল। আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, পাড়াপ্রতিবেশীর মারফৎ এ বাড়ির অনেক ঘটনা, অনেক ইতিহাস তার জানা হয়ে গেল।

সপত্নীদের মৃত্যুকে জড়িয়ে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে আছে, তার আভাস পেয়ে সে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। এসব তার কল্পনারও অতীত।

সে যত দেখে, যত শোনে, ততই তার মনে হয়, এ কোথা থেকে কোথা এসে পড়েছে? স্বামীর সম্পর্কে ঠারে ঠোরে নানা কানাঘুষা কানে আসে। কেমন এক গা ছমছমে ভয় আচ্ছন্ন করে তার চেতনা। স্বামীর নিস্তাপ শীতল কাঠিন্য অস্বস্তি জাগায় মনে।

প্রথম কিছুদিন দিবানারায়ণ তার সঙ্গে একেবারেই বাক্যালাপ করেননি। অনেক রাত্রে শুতে আসতেন ঘরে। আবার প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে চলে যেতেন। স্বামী দেবিকারানীর কাছে একরকম অপরিচিতই ছিলেন।

পরে স্বাভাবিকভাবেই যখন কথাবার্তা সুরু হোল, তখনও তার ভয় কাটল না। রাশভারি, গম্ভীর স্বভাবের স্বামী গাম্ভীর্য বজায় রেখেই কথা বলতেন। হাসি ঠাট্টার ধার ধারতেন না।

দেবিকারানী তাই কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারলনা স্বামীর কাছে। সব চেয়ে বড় কথা, স্বামীর সম্পর্কে শোনা কথার প্রভাব মন থেকে মুছে ফেলা সহজ ছিল না। দেবিকারানীর বুক সব সময়েই দুরুদুরু করত। এতটুকু বেচাল হলেই হয়ত বা স্বামীর হাতে প্রাণটা চলে যাবে।

অপর পক্ষে রুদ্রনারায়ণের স্থূলকায় নাদুসনুদুস চেহারা ও ভাবভঙ্গী তার মধ্যে বিতৃষ্ণা জাগাত। দেবরটির গায়ে পড়া স্বভাব তার চোখ এড়ায়নি। তার সম্পর্কেও অনেক কিছু শুনেছে সে। স্বয়ং শাশুড়ীও তাকে আগলে আগলে রাখেন।

একদিন স্বামী তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

—হাবুলের সঙ্গে অকারণে আমি যেন তোমায় কথা বলতে না দেখি।

এর বেশি খোলসা করে বলার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীর অভাব হয়নি। টুকরো টুকরো আলোচনা, মন্তব্য, ইত্যাদি শুনে তার কিশোরী মনও অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে।

পরিবেশেরও একটা প্রভাব আছে। শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে অল্পকালের মধ্যেই তার নিষ্পাপ অনভিজ্ঞতা কেটে গেল। জীবনের কোন কোন জটিল ছবি একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শোনা কথাগুলিকে জোড়া দিয়ে যা বোঝার, বুঝে ফেলল। অল্পদিনের মধ্যেই তার বয়স যেন অনেকটা বেড়ে গেল।

শ্বশুরবাড়িতে দেবিকারানীর বধূ জীবনের সূচনা হয়েছিল রহস্যময় যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। মহাদেব মহারাজ মধ্যরাত্রে যে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, তাতে সাহায্য করেছিল কয়েকটি সুন্দরী কিশোরী। গৈরিক বসন পরিহিতা সেই মেয়েরা কোথা থেকে আবির্ভূত হোল, আর যজ্ঞানুষ্ঠানের পর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার রহস্য ভেদ করতে পারেনি দেবিকারানী।

গুরুদেব তাদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন কৌতূহল প্রকাশ করতে। তার নির্দেশ ছিল, অন্ততঃ পাঁচ বছর তারা যেন সে ব্যাপারে নীরবতা পালন করে। গভীর রাত্রে বাগানের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞ তার তন্দ্রালু চোখে অলৌকিক, অপার্থিব ও বিচিত্র লেগেছিল।

কয়েক মাস পর আরেকটি বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করল দেবিকারানী। শ্বশুর-বাড়িতে গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর পূজা হয় একতলায় বিশাল নাটমন্দিরে। পূজার তখন আর কয়েক দিন বাকি। পূজা উপলক্ষে কুলগুরু বেনারস থেকে কলকাতায় এসেছেন। তার যথোপযুক্ত পরিচর্যার ভার রয়েছে দুই বধূর উপর।

নাটমন্দিরে এসেই চরম রুষ্ট হয়ে উঠলেন মহারাজ।

—একি অনাচার! এখানে পূজা হবে কি করে? মন্দির তো অশুচি হয়ে গেছে। কার এত সাহস? কে অপবিত্র করেছে এই মন্দির?

দেবিকারানী ভয়ে ভয়ে তাকায় বড় জায়ের দিকে। তার অবস্থাও তথৈবচ। নিঃশব্দে ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে তারা গুরুদেবের দিকে।

অতঃপর প্রমদাসুন্দরী ও অন্যদের কানেও গেল সেই কথা। গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরেন প্রমদাসুন্দরী। কাতর মিনতি জানান তার কাছে।

—মহারাজ, জানিনা কি হয়েছে? আপনি আমাদের বাঁচান এই ঘোর বিপদ থেকে। পুজোর আর বেশি বাকি নেই। এত বছর ধরে বংশে পুজো চলে আসছে। কোনদিন কোন কারণেই বন্ধ হয়নি। আপনি তা ভাল করেই জানেন। পুজো বন্ধ হতে পারেনা। আপনি বিধান দিন, কিভাবে মন্দিরের দোষ কাটবে? আপনি যেমন আদেশ করবেন, তেমন করা হবে।

গুরুদেবের মুখ কঠিন দেখায়।

—সে তো অবশ্যই, মা। কিন্তু অপরাধীদের প্রায়শ্চিত্ত দরকার। আমি আজ রাত্রেই এই নাটমন্দিরে যজ্ঞ করব। তোমরা স্বচক্ষে দেখবে, কারা অপরাধী। তাদের অপরাধের স্বরূপ ও গুরুত্ব বুঝতে দেরি হবে না তোমাদের।

মধ্যরাত্রে যজ্ঞের আয়োজন করা হোল। বাচ্চারা কিছু জানল না। দাসদাসীদেরও কিছু বলা হোল না। তারা যে যার মত ঘুমিয়ে পড়ল। যজ্ঞানুষ্ঠানের

সময় উপস্থিত থাকলেন প্রমদাসুন্দরী, দিব্যনারায়ণ, দুই বৌ আর বাড়ির দুই মেয়ে।

যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় মন্ত্রোচ্চারণের পরে পরেই সকলের সামনে প্রত্যক্ষ হোল এক বিচিত্র দৃশ্য। স্বচক্ষে না দেখলে সেই ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হোতনা কারুরই।

চিৎকার করতে করতে উপস্থিত হয় অস্পষ্ট দুই ছায়ামূর্তি। উপস্থিত সকলেই চিনতে পারে তাদের। একজন রুদ্রনারায়ণ ও অপরজন প্রমদাসুন্দরীর দৌহিত্রী। তার সেজ মেয়ের বড় মেয়ে। যন্ত্রণায় মেঝেতে পড়ে কাতরাতে থাকে তারা। আছাড়ি পাছাড়ি করতে থাকে। অবশ্য বেশিক্ষণ তাদের কষ্ট পেতে হয় না। মহারাজ মন্ত্রোচ্চারণ করে জল ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে যায় তারা।

তাদের স্থানত্যাগের নির্দেশ দিয়ে যজ্ঞের বাকি কাজ সম্পন্ন করেন মহারাজ।

অভাবনীয় এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। মামা ভাগনীর মধ্যে ব্যভিচার? তাও আবার এই পবিত্র নাটমন্দিরে?

প্রমদাসুন্দরী হতবাক। কেমন পুত্রকে পেটে ধরেছেন তিনি? মুহূর্তের জন্য একথাও মনে হোল, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই বুঝি ভাল। এত লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

দেবিকারানীর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। এরকম ঘটনা কোন সংসারে যে ঘটতে পারে, তা তার কাছে কল্পনারও অতীত। সবচেয়ে অবাক লাগল, এ বাড়ির লোকেরা ঐ ব্যাপারটা নিয়ে যত না চিন্তিত, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত বাইরের লোকজনের কাছে যেন তা প্রকাশ না পায়, তা নিয়ে।

অতঃপর প্রমদাসুন্দরী ও দিব্যনারায়ণ উঠে পড়ে লাগলেন রুদ্রনারায়ণের জন্য পাত্রী খুঁজতে। কয়েক মাসের মধ্যেই মোটামুটি সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রুদ্রনারায়ণের।

বড় জা প্রথম থেকেই দেবিকারানীকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি। দেবিকারানী ভেবেছিল, ছোট জায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়তো খারাপ হবে না। কিন্তু তার সেই আশা পূরণ হোলনা। দেবিকারানী দেখল, বড় জায়ের সঙ্গেই ছোট জায়ের বেশি ভাব। তার সংসর্গই পছন্দ করছে সে। শ্বশুরবাড়ির অনেকের মত ছোট জাও কেন যেন তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

জবরদস্তি করে সম্পর্ক তৈরী করায় বিশ্বাসী নয় দেবিকারানী। সে বুঝল, তার নিয়তিই তাকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইছে। সাধ্য কি তার, অন্য রকম করে?

ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে সেও বিচ্ছিন্ন থেকে নিজের কর্তব্য করে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। এদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও নীচতা অসহ্য লাগত। তার দুই জা-ই যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে। তার মত দরিদ্র পরিবার থেকে কেউ আসেনি। তবু তাদের অনুদারতা ও স্বার্থপরতা

দেবিকারানীর ভাবনাচিন্তার বাইরে। তাদের আলাপ আলোচনা ও মানসিক গতিপ্রকৃতি দেখেও বিদ্রোহী হয়ে উঠত তার মন।

স্বামী বা শাশুড়ী কেউই পছন্দ করেন না, সে বাপের বাড়ি যায়। অতএব সে পাট তার চুকে গেল। বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে এখানে—সেটাও তাদের পছন্দ নয়। দেবিকারানীর কাছে বাপের বাড়ীর অস্তিত্ব মুছে গেল। সেখানকার প্রভাবও একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল সেই সঙ্গে।

অনিবার্য নিয়মেই শ্বশুরবাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল তার জীবন। প্রতিবাদের প্রশ্নই ওঠেনা। দেবিকারানী অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করল ভাগ্যের হাতে।

স্বামীর সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হতে লাগল, ততই তার সঙ্গে নিজের অমিল টের পেতে লাগল সে। দাম্ভিক, কর্তৃত্বপরায়ণ, রুক্ষ, নিষ্ঠুর স্বভাবের স্বামীর সান্নিধ্যে সব সময়েই বেসুরো বাজে তার মন। কোনমতেই তার কাছে সহজ হতে পারে না।

বাড়ির অন্যদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খুব আঁট হোলনা। দুই জা, ভাসুর পো, ভাসুর ঝি, ননদ, ভাগ্নে, ভাগনী—কেউই তার আপন আত্মীয় পরিজনের মত নয়। তাদের মানসিকতা, আচার ব্যবহার, চিন্তাভাবনা সব একেবারে অন্যরকম।

তার মন জুড়িয়ে গেল সতীনের শিশুপুত্রটিকে দেখে। শ্বশুরবাড়িতে তার শান্তির আশ্রয়, তার আনন্দের নির্ঝর হয়ে উঠল ঐ শিশুটি। সতীন কাঁটা কথাটা লোকে কেন ব্যবহার করে, ভেবে পায়না দেবিকারানী। মাতৃহীন ছেলেটিকে তার প্রথম মাতৃত্বের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করতে থাকে সে।

তার গর্ভজাত নয় বলে বাৎসল্য বোধ কিছু কম অনুভব করলনা সে সতীনের ছেলের প্রতি। বরং সে যে বিমাতা, এই চেতনা তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে বেশি করে সজাগ ও সচেতন করে তুলল।

কিছুদিনের মধ্যেই সেই ছেলে তার অত্যন্ত নেওটা হয়ে পড়ল। স্বামী তো বটেই, শাশুড়ী ও পরিবারের অন্য মানুষজনেরাও রীতিমতো বিস্মিত হোল। দিব্যনারায়ণ মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না। তার চেনাজানা মানুষদের থেকে অনেকটা আলাদা বলে মনে হোল স্ত্রীকে।

বিয়ের পর অনেকদিন পর্যন্ত খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছে দেবিকারানীর। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব দৃশ্য চোখে পড়ত। দেখতে পেত শাড়ীপরা এক মহিলাকে—তার মুখ চোখে পড়ত না। পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত দুটি পা—ঘরের মেঝে স্পর্শ করতনা—শূন্যে থাকত পা দুটি। ভয়ে কাঠ হয়ে যেত দেবিকারানী। মনে মনে ঠাকুরের নামজপ করত। একটু পরে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যেত অলৌকিক সেই দৃশ্য।

সন্তান হওয়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত বিছানার কাছে কড়মড় করে হাড় চিবানোর

আওয়াজ এসেছে তার কানে। কুলগুরুকে সে কথা জানানোর পর তিনি মন্ত্রপূত তাবিচ ধারণ করতে দিলেন। অতঃপর সেই উৎপাত বন্ধ হোল।

বিয়ের দু'বছরের মাথায় এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে দেবিকারানীর গর্ভে। পরে তিন চার বছরের ব্যবধানে একে একে আরও চার পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

দেবিকারানীর গর্ভজাত প্রথম পুত্রটি দিব্যনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয় হোল। পিতার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেলেন তিনি তার সেই সন্তানের। দিব্যনারায়ণের মনে হোল, পিতাই তার মায়া ত্যাগ করতে না পেরে আবার জন্ম নিয়েছেন পুত্ররূপে তার সংসারে।

দেবিকারানী সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তার সন্তানদের প্রতি। তবে তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল সতীনের পুত্রটির ওপর। তার প্রতি স্নেহ মায়া মমতা যেন একটু বেশিই বর্ষিত হোত।

দুই পুত্রের পর এক কন্যা হয় দেবিকারানীর। কন্যাটির গাত্রবর্ণ বাপের মত—নিকষ কালো। মুখচোখও সাধারণ। দিব্যনারায়ণ একেবারেই দেখতে পারতেন না তাকে। দেখে দুঃখ হোত দেবিকারানীর। পরম মমতায় আগলে আগলে রাখতেন মেয়েটিকে।

কিন্তু কন্যাটি বেশিদিন বাঁচেনি। মাত্র চার বছর বয়সে বাড়ির পিছনে পুকুরে ডুবে মারা যায় সে। দেবিকারানীর জ্বর হয়েছিল। তিনি শুয়েছিলেন বিছানায়। ভাসুরের এক ছেলের সঙ্গে মেয়েকে নীচে দালানে খাবার খেতে পাঠান। খাওয়া শেষ হতে দাদার সঙ্গে পুকুরের পাশ দিয়ে বুঝি সে যাচ্ছিল। তখনই ঘটে যায় সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

দেবিকারানীর তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ দুই ছেলের উচ্চকিত উল্লাসের আওয়াজে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকান। অজ্ঞাত ভয়ে দুর দুরু করে তার বুক।

তিনি শোনেন, তার সেজ ছেলে মেজ ছেলেকে বলছে—'দেখ মেজদা, পুকুরে একটা কত বড় মাছ ভেসে উঠেছে। কি মজা।'

কথাটা শেষ করে সে সশব্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

তখনই দেবিকারানীর খেয়াল হয়, তার কন্যাটি খাওয়া শেষে ওপরে উঠে আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করা হোল মেয়ের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল পুকুরে। কি করে সে জলে পড়ে গেল, তার রহস্য উদ্ধার হোল না। সে নিজেই অসাবধানে পড়ে গেছে, না তাকে তার দাদা ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছে, তা জানা গেল না।

দেবিকারানী আছাড়ি পিছাড়ি করে তার শিশু কন্যাটির জন্য কাঁদলেন। তিনি দেখলেন, দিব্যনারায়ণ অনুতপ্ত। নিজেকে অপরাধী মনে করছেন তিনি। কন্যার প্রতি অবহেলাই কন্যাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন।

দেবিকারানী বুঝেছেন, ঐ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সন্তাপের অন্ত ছিল না তার স্বামীর। তিনি চেয়েছিলেন, সেই হারানো কন্যা ফিরে আসে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত কন্যা তখনই আসেনি। পরপর আরও দুটি পুত্রের পর আবার এক কন্যার জন্ম দেন দেবিকারানী।

দিব্যনারায়ণ চেয়েছিলেন, তার মৃত কন্যার অনুরূপ হয় নবজাত শিশুটি। কিন্তু তার প্রত্যাশা মিথ্যা করে দিব্যনারায়ণের কন্যাটি পায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তার সঙ্গে মানানসই সুন্দর মুখশ্রী। পিতার খুব আদরের হয়ে ওঠে এই কন্যা। অনুতপ্ত পিতৃহৃদয় আগের কন্যার প্রতি অবহেলা ও অনাদর সুদে আসলে শোধ করে দিতে চেয়েছিল। মেয়ে হয়ে ওঠে এক কথায় নয়নের মণি। এই কন্যার পরে জন্ম নেয় আরেকটি পুত্র।

এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও সংসারের প্রতি আসক্তি বোধ করতেন না দেবিকারানী। স্বভাবে ও মানসিকতায় তিনি ছিলেন উদাসী, নির্লিপ্ত। দিব্যনারায়ণ বংশমর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তারই ইচ্ছায় দেবিকারানীকে ভাল ফরাসডাঙ্গার শাড়ি, তার সঙ্গে গা ভর্তি দামী গয়নাগাটি পরে থাকতে হোত। তবু তার মুখে দেখা যেত নির্লিপ্ত এক উদাসীনতা।

—আমার সবগুলি সন্তানও যদি সন্ন্যাসী হয়, তাহলেও দুঃখ করবনা। মনে করব, আমার তা পরম সৌভাগ্য।

এসব কথা পছন্দ করতেন না শাশুড়ী। ননদরাও ক্ষুব্ধ বিস্ময় প্রকাশ করত। দেবিকারানীর মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগত তাদের মনে। বিধবা বড় জা আর ছোট জায়ের কাছে থেকে বক্র কটাক্ষ পাওনা হোত। দিব্যনারায়ণেরও সন্দেহ হোত, তার স্ত্রীটি পুরোপুরি সুস্থ কিনা ?

দাসদাসী বা সরকার মশাইয়ের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে পারতেন না দেবিকারানী। সরকার মশাই একেবারেই পছন্দ করতেন না তাকে। নানাভাবে জব্দ করতে চেষ্টা করতেন। এক রকম তটস্থ হয়ে থাকতে হোত তাকে সে কারণে।

বিশাল তিনমহলা বাড়িতে দেবিকারানী ছিল মনেপ্রাণে একেবারে নিঃসঙ্গ। স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠে না। বয়োজ্যেষ্ঠ রাশভারী গম্ভীরপ্রকৃতি স্বামী দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। তার সঙ্গে ব্যবসা, সংসার বা অন্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা বা পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

তা সত্ত্বেও, পরিবারের সর্বেসর্বা কর্তার ঘরণী দেবিকারানী তার দুই জায়ের কাছে ছিল ঈর্ষার পাত্র। তাদের সঙ্গে তাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল না।

দুই ননদ প্রায় বারোমাসই পিত্রালয়ে থাকতেন। বাড়ির মেয়ে হিসাবে তাদের আধিপত্য বিয়ের পরও কমেনি। দেবিকারানীকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। সেই অবজ্ঞা টের পেতেন দেবিকারানী। তিনিও আপন বলে তাদের কাছে টেনে নিতে উৎসাহী হলেন না।

সংসারের লোকগুলির সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন তার যত আলগাই হোক্ না কেন,

দাসদাসী, ঠাকুর চাকর, আশ্রিত পরিজনবহুল বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে তার ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা ছিলনা।

দিব্যনারায়ণ দায়িত্ববান কর্মনিষ্ঠ পুরুষ। তিনি প্রত্যাশা করতেন, তার স্ত্রী সংসারের দায়দায়িত্ব যথোচিত পালন করবে। বৌদি অসম্ভব শুচিবায়ুগ্রস্ত। তার ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়ে চলেছিল, তার ফলে কোন কাজেই তার ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যেত না। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী পরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি কন্যার জন্ম দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতএব কি স্বামী, কি শাশুড়ী, সকলেই দেবিকারানীর ওপরে নির্ভর করতেন। বিশাল সংসারের সেই গুরু দায়িত্বের নাগপাশে হাঁসফাঁস অবস্থা ছিল দেবিকারানীর।

বিয়ের বার বছর পর সামান্য রোগভোগে শাশুড়ী মারা গেলেন। তখন থেকেই সংসারে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেল। শাশুড়ী খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হিসাবে তার একটা প্রভাব ছিল। কেউ তাকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। চলনে বলনে খুব দাপটে ছিলেন না বলে যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তার প্রভাব তেমন করে কেউ টের পায়নি। সেটা টের পাওয়া গেল তার মৃত্যুর পর। একান্নবর্তী পরিবারের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল। শিগ্‌গিরই তা ভেঙে পড়ল দিব্যনারায়ণের অসহায় চোখের সামনে। তার পতন রোধ করার সাধ্য হোলনা দিব্যনারায়ণের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুটি ঘটনায় দারুণ ধাক্কা খেলেন দিব্যনারায়ণ। একটি তার বিধবা বউদির 'মারণ উচাটন' ইত্যাদি তুকতাকের সাহায্যে তার প্রাণনাশের চেষ্টা আর অপরটি রুদ্রনারায়ণ ও তার দাদার ছেলেদের তরফে তিনি ব্যবসা জমিদারির আয়লব্ধ টাকা তাদের বঞ্চিত করে সব একা লুটেপুটে খাচ্ছেন বলে তার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন।

দেবিকারানীর খাস ঝি মঙ্গলা একদিন দেবিকারানীকে বলল, তার বড় জা তার স্বামীকে প্রাণে মারার জন্য তুকতাক করছে। শুনে বিশ্বাস হোলনা দেবিকারানীর। মঙ্গলা তখন মা কালীর নামে শপথ করে বলল, সে দেখেছে, বড় বউদিমণি তার ছোট মেয়ের ছোট ছেলেকে দিয়ে রাত বারটার পর পুকুর ঘাট থেকে ঘটি করে জল আনায়। সেই জল নিয়ে উত্তরের লম্বা ঘরে ঢুকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ফুল নিয়ে কিসব মন্ত্র পড়ে। মেজদার নামোচ্চারণ করে বলে—'মর, মর, মর।'

দেবিকারানীর কাছে সেই খবর পেয়ে দিব্যনারায়ণের প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। পরে লোক লাগিয়ে জানতে পারলেন, সব একেবারে নির্জলা সত্যি। তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যার প্রলেপ নেই।

দিব্যনারায়ণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কাদের জন্য তিনি এত পরিশ্রম করছেন? যাদের তিনি বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন, দাদার মৃত্যুর পরও যাদের এতটুকু অনাদর হতে দেননি, তারা তলে তলে তার মৃত্যুকামনা করছে? বউদি

নাকি মাতৃসমা। তার এই আচরণ? দিব্যনারায়ণের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই? মনে মনে তার সর্বনাশ চাইছেন? শয়তানের সঙ্গে যার সম্পর্ক, সেই রাক্ষসীর সঙ্গে এক সংসারে একান্নে থাকার কোন অর্থ হয়? কোন আপস নয়। দিব্যনারায়ণ স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়ভঙ্গীতে বউদিকে জানিয়ে দিলেন, তিনি তার কার্যকলাপ টের পেয়েছেন। তার সঙ্গে আর একসঙ্গে থাকবেন না।

পৃথগন্ন হয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ দাদার সংসার থেকে। কিছুদিন যেতে না যেতে ছোট ভাইও ছলছুতো করে আলাদা হয়ে গেল। একটি সংসার ভেঙ্গেচুরে তিন টুকরো হয়ে গেল।

এখানেই শেষ হোল না ব্যাপারটা। দিব্যনারায়ণ আরেকটি ধাক্কা খেলেন রুদ্রনারায়ণ ও তার দাদা আদিত্য নারায়ণের দুই পুত্রের কাছে। তারা শলাপরামর্শ করে দিব্যনারায়ণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। তাদের অভিযোগ, দিব্যনারায়ণ ব্যবসাসূত্রে লব্ধ আয় থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করছেন। অর্জিত অর্থের সিংহভাগ একাই আত্মসাৎ করছেন।

তলে তলে কবে থেকে তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তা দিব্যনারায়ণ টের পাননি। যখন টের পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অনিবার্য ভাঙ্গন রোধ করার আর কোন উপায় নেই।

বেদনাহত চিত্তে দিব্যনারায়ণ উপলব্ধি করলেন, সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। স্নেহ, মায়া, মমতা কিংবা দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধ—এসব সংসারের সকলকে বশীভূত করতে সমর্থ নয়।

তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষের মন হিসাবের বাইরে কাজ করে। অঙ্কের নির্ভুল সূত্রে তাকে বোঝা যায় না। তিনি একান্নবর্তী সংসারের পুরুষ অভিভাবক হিসাবে সংসারের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেননি। তার প্রতিদানে সংসারের সব কটি লোক তাকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে কিংবা তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে, তা আশা করা যায় না।

রুদ্রনারায়ণের মত অক্ষম অপদার্থ লোকের কাছেও তার কর্তৃত্ব অসহ্য ঠেকেছে। তার মনেও কর্তৃত্বের লোভ জেগে উঠেছে। তার ভাইপোরাও প্রভাবিত হয়েছে। তাদের মনেও অসন্তোষ, সন্দেহ জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

এই পরিবারের বুনিয়াদ তিনি অটুট রাখবেন কি করে? আর জোড়াতালি দিয়ে তা রেখেই বা লাভ কি?

দেবিকারানী চেয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে বিবাদ মিটিয়ে নিতে। তার ইচ্ছা, দিব্যনারায়ণ ভাই, ভাইপোদের অনুরোধ করেন, তারা যেন মামলা তুলে নেয়।

দিব্যনারায়ণ রাজী নন। তিনি সে পথে হাঁটবেন না। সংগ্রামী মানুষ তিনি। সংগ্রাম করতে ভয় পাবেন কেন? তিনিও দৃঢ়সংকল্প, মামলা লড়ে যাবেন। তিনি

জানেন, তিনি অন্যায় করেননি। তার বিরুদ্ধে পিতৃপিতামহের সম্পত্তি ও ব্যবসার সিংহভাগ আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণসহ খণ্ডন করবেন।

তিনি রুদ্রনারায়ণ নন। তিনি তার ভাইপোদের মত নন। ব্যবসার প্রয়োজনেই, কাজের প্রয়োজনেই প্রতিটি পাই পয়সার হিসাব রেখে দিয়েছেন। মুখে'রা জানেনা সে কথা। জানলে অতখানি ধৃষ্টতা দেখাত না।

মামলা তার অভিপ্রেত নয়। মামলা মকদ্দমা অর্থনাশী, সর্বনাশা। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? মামলা তাকে লড়তেই হবে। তার ভবিতব্য তাই।

যথাসময়ে মামলার রায় বেরুল। দিব্যনারায়ণের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হোল। জজ রায় দিলেন, পিতার আমল থেকে ব্যবসা দেখে এসেছেন দিব্যনারায়ণ। সবকিছু পরিচালনা করেছেন, দেখাশোনা করেছেন দিব্যনারায়ণ। অন্য কেউ নয়। ব্যবসার সঙ্গে অন্যদের কোন সম্পর্ক নেই। অন্ততঃ তার কোন প্রমাণ তার সামনে নেই। অতএব ব্যবসায়ের মাধ্যমে লব্ধ অর্থে তাদের কোন অধিকার নেই।

বিভেদবোধ মানুষকে সর্বনাশের কিনারায় ঠেলে দেয়। দিব্যনারায়ণের ভাই ও ভাইপোদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হোল না। তারা যেন ক্ষেপে উঠল। দিব্যনারায়ণকে হেট না করে নিরস্ত হবে না তারা।

এবার তারা সম্পত্তির অধিকার নিয়ে, জমিদারির সূত্রে লব্ধ আয়ের অধিকার নিয়ে মামলা দায়ের করল তার বিরুদ্ধে। হাইকোর্ট থেকে রিসিভার নিয়োগ করা হোল। বছরের পর বছর ধরে সেই মামলা চলল। মামলা চালাতে গিয়ে বিক্রি করা হোল ধানী জমি, বাগান, ঝিল। মামলা চালানোর ওজুহাতে অজগরের মত গ্রাস করে নিল রিসিভার পিতৃপিতামহের বহু সম্পত্তি।

ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ছিদ্রপথে সর্বনাশের সাপ এসে দংশন করল ঘোষাল পরিবারের একান্নবর্তী ঐতিহ্য, তার ঐশ্বর্যবৈভব, তার রমরমা, তার চাকচিক্য।

সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ হোল। বিশাল তিনমহলা বাড়ি তিনভাগে ভাগ করা হোল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল একটি করে মহাল। বাকি সব ঝাঁঝরা হয়ে গেল। অসহায় দর্শক হয়ে দিব্যনারায়ণ সাক্ষী রইলেন সেই ধ্বংসকাণ্ডের। অনিবার্য ভবিতব্যকে প্রতিহত করবেন তিনি কিভাবে?

॥ পাঁচ ॥

সময়ের অপ্রতিরোধ্য শক্তি রুখবে কে? সংসারের চাকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে দেবিকারানী নিজেও একদিন ভুলে গেলেন, তিনি নৈহাটির ভট্টাচার্য পরিবারের মেয়ে। ছয় পুত্র ও এক কন্যার প্রতিপালন, দিব্যনারায়ণের দেখাশোনা

অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়ন, উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ দায়িত্বপালনের মধ্যে কিভাবে সময় পার হয়ে যায়।

দাসদাসীর সংখ্যা কম নেই এ বাড়িতে। কিন্তু তাদের ওপর সব কিছু পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাদের পরিচালনা করতে হয়, তাদের নির্দেশ দিতে হয়। তা না হলে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে কিভাবে?

ছেলেমেয়েদের ঝঞ্চাট ঝামেলাও বড় কম নয়। তারা একেক জন একেক রকমের। তাদের পছন্দ অপছন্দ, মেজাজ মর্জি ও রুচিতে ঠেকা দিতে গিয়ে দেবিকারানী হিমসিম খেয়ে যান।

দিব্যনারায়ণ সংসারের বোঝাটা ক্রমশঃ যেন তার ঘাড়ের ওপর বেশি করে চাপাচ্ছেন। যতদিন সংসার একান্নবর্তী ছিল, ততদিন দিব্যনারায়ণ অনেকখানি বোঝার সামাল দিয়েছেন। সম্পত্তি ভাগাভাগির পর দিব্যনারায়ণ ছেলেমেয়েদের কাছে থেকেও নিজেকে একটু একটু করে সরিয়ে নিচ্ছেন।

দেবিকারাণী তা টের পান। কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, তার কারণটা কি? মাঝেমাঝে তার মনে হয়, দিব্যনারায়ণ কি ছেলেমেয়েদের কাছে থেকেও বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার আশংকা করছেন? সেটা ঠেকানোর জন্যই কি নিষ্ঠুরতা ও ঔদাসীন্যের বর্ম পরে থাকছেন? অনেক ভেবেও কোন নিশ্চিত উত্তর খুঁজে পাননা তিনি।

কারণ যাই হোক্, মাঝেমাঝে সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলার মাত্রা এমন বেড়ে যায় যে, দেবিকারানীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ছেলেমেয়েদের মরণাপন্ন অসুখেও স্বামীকে বিচলিত হতে দেখা যায়না। দেবিকারানী ভেবে পাননা, তার স্বামীটি কোন ধাতু দিয়ে গড়া।

স্বামীর জনপ্রিয়তা দেখেও বিস্মিত হন দেবিকারানী। বহু বছর ধরে একাদিক্রমে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রয়েছেন স্বামী। নির্বাচনে জয় তার সুনিশ্চিত।

শুধু কি তাই? তার কঠিন স্বভাব ও রাশভারি গাম্ভীর্য সত্ত্বেও প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় দিব্যনারায়ণ। দেবজ্ঞানে প্রজারা তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাদের অন্ধ আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করে দেবিকারানীর বিস্ময়ের সীমা থাকেনা।

ঠারে ঠোরে কত কথাই তো তার কানে এসেছে। তিনি শুনেছেন, প্রয়োজনে পথের কাঁটা সরাতে মানুষ খুন করতেও পিছপা নন দিব্যনারায়ণ। ঢ্যাটা প্রজাদের শায়েস্তা করতে তার নাকি জুড়ি নেই।

উৎসবে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রজাদের দিব্যনারায়ণের প্রতি অপার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে দেবিকারানী তার হিসাব মিলাতে পারেন না। কেবলি গরমিল হয়ে যায় হিসাবে।

এমন দুর্বোধ্য চরিত্র জীবনে আর দুটি দেখেননি দেবিকারানী। এত বছরের

বিবাহিত জীবন। তবু স্বামীর চরিত্রের তল খুঁজে পাননা যেন। কঠিন, উদাসীন ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন স্বামীটিকে কিছুতেই নিজের একান্ত আপন জন বলে ভাবতে পারেন না।

প্রথম থেকেই দেবিকারানীর মনে হয়েছে, স্বামী যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তার সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখে চলেছেন। আগে অভিমান হোত। মনে হোত, স্বামীর স্বভাবে কোথায় একটা ঘাটতি আছে। কখনও আবার অন্য চিন্তা মনে আসত। মনে হোত, স্বামী তাকে সমপর্যায়ের বলে মনে করেন না। তার পিতৃকুলের দারিদ্র্যই হয়ত বা সেই অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের কারণ।

দেবিকারানী শুনেছিলেন, দিব্যনারায়ণের দ্বিতীয় স্ত্রী ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। তিনি ভাবতেন, সেই স্ত্রীর রূপের জৌলুশের স্মৃতি তার রূপকে ম্লান করে দিচ্ছে দিব্যনারায়ণের চোখে। কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারতেন না। দিব্যনারায়ণের আপাতকঠিন স্বভাবের অন্তরালে রূপজ মোহের ব্যাপারটা চোখে পড়ত না।

নারীঘটিত দুর্বলতা নেই দিব্যনারায়ণের স্বভাবে। কিন্তু দেবিকারানী ভাল করেই বোঝেন, স্বামী তার প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পিত নন। সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বুঝে গিয়েছেন তিনি। বুঝেছেন, দিব্যনারায়ণ যতটুকু দেবেন, ততটুকু নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কানাকড়ি মূল্যও নেই দিব্যনারায়ণের কাছে। স্বামীকে সর্ব ব্যাপারে মেনে চলতে হবে। নিজের মত খাটাতে গেলে তার পরিণাম আদৌ ভাল হবে না।

বয়সে দিব্যনারায়ণ অনেকটাই বড় তার থেকে। কিন্তু দেবিকারানী বোঝেন, বয়সের পার্থক্যই ব্যবধানের একমাত্র কারণ নয়। আসল পার্থক্য রয়েছে স্বভাবে, রুচিতে, আদর্শে।

এসব বুঝেছেন তিনি দিনে দিনে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে। যতদিন শাশুড়ী জীবিত ছিলেন, ততদিন দিব্যনারায়ণ তার মেজাজ মর্জি রুচি সেভাবে আরোপিত করেন নি। দেবিকারানীকে তখন নিয়ন্ত্রিত করেছেন তার শাশুড়ী। দিব্যনারায়ণের কর্তৃত্বের জোর টের পেয়েছেন তিনি শাশুড়ীর মৃত্যুর পর।

তখনই প্রকট হোল তার ইচ্ছা অনিচ্ছা আর রুচির সঙ্গে দিব্যনারায়ণের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও রুচির অমিল। তাদের মধ্যে সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন থেকে।

সাজসজ্জার ব্যাপারে দেবিকারানী অত্যন্ত উদাসীন। পিতৃকুলের প্রভাব পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তার পিতৃকুলে কেউই পোষাকের পারিপাট্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। দেবিকারানীও সেজে গুজে থাকার তাগিদ বোধ করেন না। কিন্তু স্বামীর তা পছন্দ নয়। স্ত্রীকে বসনভূষণে উদাসীন দেখে দিব্যনারায়ণ বিরক্ত হন। তাকে স্মরণ করিয়ে দেন, যে পরিবারে সে বধূ হয়ে এসেছে, সেই পরিবারের একটা মর্যাদা আছে, আভিজাত্য

আছে। অতএব দেবিকারানী বাধ্য হন ফরাসডাঙ্গার দামী শাড়ি পড়ে থাকতে, আপাদমস্তক ভারী ভারী দামী অলংকার পরে থাকতে।

দেবিকারানীর আপত্তি, অনিচ্ছা খড়কুটোর মত ভেসে যায় দিব্যনারায়ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের স্রোতে। তিনি বোঝেন, স্বামী তাকে ভালবেসে সাজাতে চাননা—তিনি চান নিজের আভিজাত্য ও মর্যাদা বজায় রাখতে। চান, সুসজ্জিতা সালংকারা স্ত্রী বহন করবে স্বামীর ঐশ্বর্যগরিমার ভার।

দেবিকারানীর অন্তরাত্মা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য খাটাতে সাহস পাননা। এই অসম্মান তাকে পীড়িত করে, বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে উপায় কি তার?

কর্মঠ মানুষ দিব্যনারায়ণ। ব্যবসার কাজে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজে সদাব্যস্ত তিনি। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব দেবিকারানীর ওপর। দিব্যনারায়ণ অনেক সময়ই রীতিমত আলগা আলগা থাকেন। ছেলেমেয়েদের মরণাপন্ন অসুখেও বিচলিত হতে দেখা যায় না তাকে। মিউনিসিপ্যালিটির কোন মিটিং থাকলে ছেলেমেয়েদের অসুখের ব্যাপারটাও গৌণ হয়ে যায়। তার নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা দেখে বিস্ময় বাগ মানে না দেবিকারানীর।

কিন্তু দেবিকারানী বোঝেন, তার তুলনায় দিব্যনারায়ণের চারিত্রিক প্রভাব ছেলে-মেয়েদের ওপর অনেক বেশি। বহু ঘটনার মধ্যে প্রকট হয়ে পড়ে সেই ব্যাপারটা। 'নরানাং মাতুলং ক্রমঃ' উক্তির যথার্থতা প্রমাণ হয় না তার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে।

আশ্চর্যের কথা, তার সতীনপুত্রটি অন্যদের থেকে বেশি করে তার ছায়ায় মানুষ হয়ে উঠছে। মাতৃহারা ছেলেটির প্রতি তার অপার বাৎসল্য শত ধারায় প্রবাহিত হয়। ছেলেও মায়ের একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছে। বহুদিন পর্যন্ত সে জানতই না যে, সে দেবিকারানীর আপন গর্ভজাত সন্তান নয়। দেবিকারানীও কখনই ভাবেন না, হিরণ্ময় তার আপন পুত্র নয়। অন্য ছেলেমেয়েরাও হিরণ্ময়কে আপন ভাই বলেই মনে করে। দেবিকারানীর শিক্ষা অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে কার্যকর হয়েছে।

কিন্তু তিনি ধাক্কা খেলেন হিরণ্ময়ের বিয়ের সময়। প্রিয় পুত্রের জন্য নিজে দেখেশুনে পাত্রী নির্বাচন করতে চাইলেন দেবিকারানী।

দিব্যনারায়ণ তার সব উৎসাহের আগুনে জল ঢেলে দিলেন।

স্ত্রীকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি।

—তুমি ঠিক করবে ওর বিয়ে? তাহলেই হয়েছে! হিরুর বিয়ে আর এ জন্মে হবে না। ওর বিয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আছি, আমার বোনেরা আছে। আমরা ওর বিয়ের কথা ভাবব। তুমি তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

দেবিকারানীর কাছে অপ্রত্যাশিত এই আঘাত। যাকে তিনি গর্ভজাত সন্তানের স্নেহে যত্নে আদরে বড় করে তুলেছেন, তার ওপর কোন দাবি থাকবে না? তার

ওপর কোন অধিকার নেই তার? এতদিন দিব্যনারায়ণ এই ছেলের দায়িত্বভার পুরোপুরি তার ওপর সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। আজ হঠাৎ একি মনোভাব প্রকাশ করছেন? তিনি কি প্রত্যক্ষ করেননি, দেবিকারানী হিরণ্ময়কে নিজের সন্তানদের চেয়েও অনেক বেশি মমতা দিয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ করেছেন? এতদিন পর এভাবে রূঢ়ভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সে তার গর্ভধারিণী মা নয়?

স্বামীর নিষ্ঠুরতা দেখে স্তম্ভিত দেবিকারানী। মনে হোল, এই মানুষটি চিরকাল দুর্বোধ্য রয়ে যাবেন তার কাছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলেন না তিনি। অত্যন্ত অভিমানে ও দুঃখে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

তার কেবলি মনে হতে লাগল, স্বামীর হাতে পুতুলের মত নেচেছেন তিনি এতদিন। যতটুকু দরকার, ততটুকু নাচিয়েছেন দিব্যনারায়ণ। এখন তাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন। তাই সুতো টেনে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করে একপাশে সরিয়ে রাখতে চাইছেন।

এ সংসার দিব্যনারায়ণের। দেবিকারানী বহিরাগত। আসল কর্তৃত্ব দিব্যনারায়ণের হাতে। প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করেছেন স্বামী। একথা আগে বোঝেন নি, তা নয়। কিন্তু এবার তার খুব লাগল। হিরুকে নিজের ছেলের মত পরম স্নেহে যত্নে মানুষ করেছেন বলে নয়। তিনি যে বিমাতার চোখে হিরুকে দেখেন না, তার জন্য বুঝি এক ধরনের সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদও বোধ করতেন মনে মনে। সেটি ধাক্কা খেল দিব্যনারায়ণের আচরণে।

দেবিকারাণী সংসারে আসক্ত নন। সংসারে আছেন বলেই সংসারকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু সেই সংসার তার স্নেহ ভালবাসা মমতাকে যে এমন ভাবে অপমান করতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল হিরণ্ময়ের। দেবিকারানী আলগা আলগা ভাবে তার যতটুকু করণীয় করে গেলেন। নতুন বউকে আপন জন বলে মেনে নিতে পারলেন না।

হিরণ্ময় ভেতরের ব্যাপার কিছু জানল না। কিন্তু মায়ের নিরাসক্ত ভাব তার দৃষ্টি এড়ালনা। তার সন্দেহ হোল, বিয়ের ব্যাপারে বাবার সঙ্গে মায়ের মতান্তর হয়েছে। রাশভারী বাবাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায় না। মাকেই জিজ্ঞাসা করল। দেবিকারানী স্পষ্ট করে হাঁ না কিছুই বললেন না। হিরণ্ময় যেন ধাঁধায় পড়ে গেল।

বিয়ের পরও পরিস্থিতির উন্নতি হোল না। দীপার সঙ্গে দেবিকারানীর সম্পর্ক উষ্ণ, আন্তরিক হোলনা। রান্নাঘরে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে বচসা বাঁধে দুজনের মধ্যে। দেবিকারানীর একমাত্র কন্যা সরস্বতী বয়সে খুবই ছোট। তার কাছেও মায়ের আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকে। তারও মনে হয়, মা যেন বড় বউদির

প্রতি প্রসন্ন নন। অন্য সকলের প্রতি মায়ের আচরণ অন্যরকম। এই বৈপরীত্য দেখে অবাক হয়ে যায় সে।

ঠাকুর মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে যায়। রান্নাঘরের দায়িত্ব পড়ে তখন দেবিকারানী ও দীপার ওপর। কিন্তু বেশিক্ষণ দুজনে একসঙ্গে রান্নাঘরে থাকতে পারে না। একটু পরেই সুরু হয় বচসা। দীপাও সৎশাশুড়ীকে ছেড়ে কথা কয় না। দেবিকারানী গলা চড়ান না। ঠাণ্ডা গলায় কঠিন ভাবে দীপাকে সমুচিত জবাব দেন।

—তোমার এখানে থাকার দরকার নেই। তুমি ওপরে যাও। যা করার, আমি করব। ঝগড়াবিবাদ আমার পছন্দ নয়।

এমন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে সেই আদেশে যে, তাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনা দীপা। বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘর ছেড়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় সে।

এসব খুঁটিনাটি ঘটনা চোখে পড়ে সরস্বতীর। দেবিকারানী ঘৃণাক্ষরেও তার সমস্যার কথা দিব্যনারায়ণকে জানান না।

হিরণ্ময়ের কাছে অনেক কথাই চলে আসে। দীপা তার অসহিষ্ণুতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে। স্বামীর বিমাতাপ্রীতি তার অসহ্য ঠেকে। সৎশাশুড়ীর দোষত্রুটি বিস্তারিতভাবে স্বামীর কানে তোলে।

হিরণ্ময় পাত্তা দেয় না। তা দেখে তেতে ওঠে বউ।

—বুঝিনা, বাবা, সৎমায়ের ওপর এত টান কেন? নিজের মা হলেও নয় বুঝতাম। মা যেন সাক্ষাৎ দেবী। নিজেকে তো ভুগতে হয় না? দিব্যি ভাল মানুষটি সেজে থাকা যায়। বউ কষ্ট পেলে কি এসে যায়? বউ মরলে বরং শান্তি।

একেক সময় শান্ত স্বভাবের হিরণ্ময়েরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। রেগে তেরিয়া জবাব দেয় সে দীপাকে।

—তুমি মরবে কেন? মরব আমি। রোজ রোজ কেন এই অশান্তি, বুঝিনা। মাকে কি নতুন করে চিনতে হবে? তুমি সৎমা বলছ কাকে? আমাকে উনি জন্ম দেননি ঠিকই। কিন্তু এতদিন ধরে যিনি আমাকে পরম স্নেহে যত্নে আদরে মানুষ করে তুলেছেন, তাকে আমি সৎমা বলে ভাবি কি করে?

পরে স্ত্রীর মুখভাব লক্ষ্য করে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

—কি আছে? মায়ের কথামত চললেই তো আর অশান্তি হয় না। একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর। আমি জানি, মা অবুঝ নন।

দীপা নরম হয় না।

—তুমি বুঝবে না। আমার এখানে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা হয় না। কেন, তুমি আলাদা বাসা করে থাকতে পার না? সৎমা, সৎ ভাই বোনের সংসারে

কি এত সুখটা পাচ্ছ, শুনি? বাবা ছাড়া এখানে তোমার নিজের জন কে আছে?

হিরণ্ময় অপ্রয়োজন বোধে সে কথার জবাব দেয়না। পাশ ফিরে শুয়ে দীপাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে।

সুখে দুঃখে এভাবেই চলতে থাকে দেবিকারানীর সংসার। ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে। তারা দেবিকারানীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দেবিকারানী চিন্তা করেন, এরা তার গর্ভজাত। তার নিজের রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। তবু এরা কত অন্যরকম। এদের ইচ্ছা অনিচ্ছা চিন্তা-ভাবনা তার ইচ্ছা অনিচ্ছা চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলেনা। এদের একেক জনের প্রকৃতি একেক ধাতুতে গড়া। হিরণ্ময় তার গর্ভজাত না হয়েও মানসিকতার বিচারে তার অনেক কাছের—অথচ এদের সঙ্গে তার অমিল কত বেশি! তিনি এদের গর্ভধারিণী। এদের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। মায়ামমতার বেড়িতে বাঁধা তিনি এদের সঙ্গে। কিন্তু প্রত্যুষ যেভাবে দিনের আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয়—সেভাবেই তিনি এদের দেখে বুঝেছেন, এরা কেউ তার পছন্দমত পথে হাঁটবে না।

এসব ভেবে মাঝেমাঝে এক অব্যক্ত দুঃখে তার মন ভারী হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে যে সখ্য তৈরি হয়নি—তা সন্তানদের সঙ্গে তৈরি হতে পারত। কিন্তু তার অদৃষ্টে তা নেই।

শ্বশুরকুলে তিনি বরাবর একা, নিঃসঙ্গ। সন্তানরা কোনদিন তার চিন্তার শরিক হবে না। হিরণ্ময়ের মত অতখানি অনুগত আর কেউ নয়। সেই হিরণ্ময়ের ওপর অধিকার তাকে ছাড়তে হয়েছে। তার বউয়ের স্বার্থে।

সরস্বতীকে মনের মত গড়ে পিটে তুলতে চাইলেন। সেও বাপের ধারাই অনুসরণ করবে দেখা যাচ্ছে। বাপ তার কাছে আদর্শ। তবু সে মায়ের কাছা-কাছি থাকে। পুত্রদের কাছে যা প্রকাশ পায়না, সরস্বতীর কাছে তা প্রকাশ পায়।

তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে যান দেবিকারানী। সরস্বতীর পর্যবেক্ষণ শক্তি, ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাজ্জব করে দেয় তাকে। বড় বউদির সঙ্গে মায়ের বচসাবিবাদ লক্ষ্য করে সেই ছোট মেয়ে যখন মাকে তিরস্কার করে, মায়ের দোষদুটি ধরে দেয়, তখন দেবিকারানী হার স্বীকার না করে পারেন না।

সাত আট বছরের সরস্বতীকে ন্যায় অন্যায়ের চুলচেরা বিচার করতে দেখে দেবিকারানীর বিস্ময় যেন তল খুঁজে পায় না। অনেক সময় তার ছোট মুখে বড় কথা এঁচোড়ে পাকামি বলে মনে হয়। অথচ তার অন্তর্নিহিত যুক্তির ভার ঝেড়ে ফেলা যায় না। দেবিকারানী মনে মনে শঙ্কিত বোধ করেন। এই মেয়ে কোন ঘরে যাবে? সেখানে কি মেনে নেবে এসব?

সরস্বতীর স্বভাবে কোথায় যেন কোমলতার একটু অভাব আছে। বড়

কাটাকাটা রুখা রুখা কথা বলে। বংশগৌরবের সচেতনতা তাকে কিছুটা দাম্ভিক ও উন্নাসিকও করে তুলেছে। মেজাজটিও পেয়েছে বাপের মত।

মাঝে মাঝে মেয়েকে অপলক চোখে লক্ষ্য করেন দেবিকারানী। ফুটফুটে সুন্দর এই মেয়ে তার রূপের পুরোটা না হোক, অনেকটাই পেয়েছে। কিন্তু চলনে বলনে তার মধ্যে যে আভিজাত্য গরিমা প্রকাশ পায়, তার মধ্যে বাপের আদল যেন খুঁজে পান তিনি।

বুকের মধ্যে মাঝেমাঝে কেমন এক ভয়ের শিরশিরানি টের পান। দিব্যনারায়ণ পুরুষ। তার পক্ষে যা মানিয়ে যায়, তা কি মানাবে সরস্বতীর পক্ষে? সরস্বতীর জীবনে অবাঞ্ছিত সমস্যা ঘনিয়ে আসবে না তো?

মেয়ে তার বাপের অতি আদরের। ধনী পিতার অর্থকৌলিন্যে অনেক কিছুই কেনা যায়। কিন্তু সুখ শান্তি? তিনি এ সংসারে এসে যে ভাবে মানিয়ে চলেছেন, তা কি পারবে সরস্বতী? না পারলে তার পরিণাম কি হবে?

অন্য চিন্তাও মনে আসে বৈ কি। তাদের কন্যাভাগ্য ভাল নয়। প্রথম কন্যাটিকে শিশুবয়সেই হারিয়েছেন তারা। সরস্বতীর জন্য তাই তার মনে বড় ভয়। গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর কাছে সর্বসময় প্রার্থনা জানান—'মা, আমার এই মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখ। ও দীর্ঘজীবী হোক, সুখী হোক, সার্থক হোক।'

আট পেরিয়ে নয় বছরে যখন পাড়ি দিয়েছে সরস্বতী, তখন সে গুরুতর হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হোল। যমে মানুষে টানাটানি চলল। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। দিব্যনারায়ণ পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন দেবিকারানী। সংসারের অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে মেয়ের রোগশয্যায় উৎকণ্ঠিত প্রহর গুনতে লাগলেন। জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশ্যে সকাতর প্রার্থনা জানতে লাগলেন তিনি একভাবে—'মা গো, দয়া কর। আমার মেয়েটিকে কেড়ে নিওনা। ওকে বাঁচিয়ে রাখ।'

অসুস্থ মেয়ের শয্যাপার্শ্বে একদিন ঘুমিয়ে পড়ে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলেন দেবিকারানী। নয় বছরের সরস্বতী সালংকারা হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। চন্দনচর্চিত তার মুখ। বাড়ি ভর্তি লোকজন গমগম করছে।

স্বপ্নে সব কিছু যথাযথভাবে আসেনা। এলোমেলো হিজিবিজি অসংবদ্ধ টুকরো টুকরো অনেক দৃশ্য দেখলেন দেবিকারানী। সেগুলির সঙ্গে সরস্বতীর বিয়েটাকে মেলানো যায় না। কিন্তু তন্দ্রার ঘোর কেটে যেতে দেবিকারানীর সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করল সরস্বতীর সালংকারা বধূবেশ। তার মনে হোল, স্বপ্নটার মধ্যে অবশ্যই কোন নির্দেশ আছে। তিনি শুনেছেন, গোত্রান্তর হলে মৃত্যুর ফাঁড়া কেটে যায়। জগদ্ধাত্রী কি তার আকুল মাতৃহৃদয়ের কাছে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন?

দেবিকারানী তাকিয়ে দেখলেন, অসুস্থ মেয়ের চোখেমুখে মৃত্যুর কালো ছায়া।

নিঃশ্বাস অত্যন্ত ধীরে ধীরে পড়ছে। আর কিছু ভাবতে পারলেননা তিনি। জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে গৌরীদান করবেন। গোত্রান্তরিত হলে মেয়ের আর জীবনসংশয় থাকবে না।

আশ্চর্যের কথা, এরপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল সরস্বতী। ডাক্তারও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বাড়ির সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ক্রমশঃ হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল মেয়ে আবার আগের মত।

দেবিকারানী তার প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেননি। কিন্তু কচি মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাবার কথা চিন্তা করলেই তার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যায়। দিব্যনারায়ণের কাছে মুখ খোলার সাহস হয় না। ছেলেদের কাছেও বলতে সংকোচ হয়।

মেয়ে হাঁচলে কাশলেও দেবিকারানীর বুকে খিল ধরে যায়। বুক ধড়ফড় করে কেবলি। প্রতিজ্ঞা পালনে অপারগ হলে মেয়ের জীবননাশ হবে না তো? তবু নিজের মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না। মেয়ের রোগশয্যায় উদ্বেগপীড়িত মনে যে সঙ্কল্প ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না। নতুন এক যন্ত্রণার আবর্তে হাকুপাকু করেন দেবিকারানী।

ঠিক এই সময়ে বিচিত্র এক যোগাযোগ ঘটল। দেবিকারানী যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, তখন তার করণীয় নির্ধারণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল একটি ঘটনা।

সান্যালদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধুত্ব ঘোষালদের। বিমলচন্দ্র সান্যাল দিব্যনারায়ণের বয়োজ্যেষ্ঠ। উভয়ের মধ্যে তা সত্ত্বেও রয়েছে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ঘোষালদের জমিদারী আভিজাত্য সান্যালদের নেই। বিমলচন্দ্রের পিতা প্রফুল্লচন্দ্র অতি সামান্য অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে বসেন। প্রথম জীবনে মাথায় মোট বয়ে ফেরি করতেন তিনি। অক্লান্ত পরিশ্রমী মানুষটি পরে তার সুফল লাভ করতে সুরু করেন। হরেক রকমের মালের ব্যবসা আরম্ভ করে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেন।

পরিশ্রমী চরিত্রবান পিতার একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্র অল্প বয়সেই কুসঙ্গে পড়ে নানা বদভ্যাসের শিকার হন। অল্প বয়সে বিবাহের বন্ধনে বেঁধেও পুত্রের মতিগতি ফেরাতে পারেননি পিতা। অবাধ বেশ্যাসংসর্গের মাশুল দিতে হয় বিমলচন্দ্রকে। দুরারোগ্য সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন তিনি। রোগের যন্ত্রণা অনেক সময়েই অসহ্য বোধ হোত।

অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদিক, সব রকমের চিকিৎসা প্রয়োগ হোল। কিন্তু রোগের নিরাময় হোলনা। একদিন রোগের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে দিব্যনারায়ণের শরণাপন্ন হন। দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধুত্বের সূত্রে দিব্যনারায়ণের

কুলগুরু ভোলা মহারাজের অলৌকিক শক্তিমাহাত্ম্যের অনেক কাহিনী তার জানা ছিল।

দিব্যনারায়ণের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে সকাতর মিনতি জানান বিমলচন্দ্র।

—রাখাল ভাই, আমায় বাঁচাও। রোগের যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না। চিকিৎসার তো ত্রুটি করিনি। অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদিক, সবই তো করলাম। ফল তো কিছুই হোল না। এখন তুমিই আমার শেষ ভরসা। তুমি আমায় বাঁচাও, ভাই।

দিব্যনারায়ণ অবাক হলেন।

—আমি কি করবো? আমি সখের হোমিওপ্যাথী করি। আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে আপনাকে সারিয়ে তোলা? কতটুকুই বা জানি আমি?

বিমলচন্দ্র নাছোড়বান্দা।

—তোমাকে চিকিৎসা করতে কে বলছে? চিকিৎসা করে কিছু হবেনা। তোমার কাছে কতদিন তোমাদের কুলগুরুর অলৌকিক শক্তির কথা শুনেছি। তুমি আমার জন্য ওঁর কাছে ওষুধ চাও। আমার মন বলছে, উনিই পারবেন আমাকে নিরাময় করতে।

দিব্যনারায়ণ অতখানি নিঃসংশয় ছিলেন না। তবু অগ্রজতুল্য বন্ধুর অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। বন্ধুর কথামত বেনারস রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজের কাছে আনুপূর্বিক সব বিবৃত করে নিয়ে এসেছিলেন জড়িবুটি শিকড়। কলকাতায় ফিরে বন্ধুকে সমর্পণ করেছিলেন সেগুলি।

মহারাজের কয়েকটি নির্দেশ ছিল। সেগুলি বন্ধুকে জানান দিব্যনারায়ণ। বিমলচন্দ্রকে মদ্যপান ছাড়তে হবে। বেশ্যাসংসর্গ ছাড়তে হবে। বিমলচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন সেগুলি। অতঃপর রোগমুক্ত হন তিনি। বন্ধুর সঙ্গে সখ্যের বাঁধন দৃঢ়তর হয় তার ফলে। কৃতজ্ঞ বিমলচন্দ্র দিব্যনারায়ণকে বলেন, তিনি তার উপকার চিরকাল স্মরণ করবেন। প্রতিশ্রুতি দেন, যথাসময়ে সাধ্যমত তার প্রতিদান দেবেন।

সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে সেই প্রতিদান দিতে চাইলেন একদিন বিমলচন্দ্র। সরস্বতীর আরোগ্যলাভের দু'তিন মাস পরে একদিন সকালবেলায় হঠাৎ তার আগমন ঘটল ঘোষাল বাড়িতে। বয়স হয়েছে বিমলচন্দ্রের। আর রোগভোগের দরুন অনেকটাই ভেঙ্গে গেছে শরীর। তিনি খবর পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সিংদরজার সামনে শ্বেতপাথরের রোয়াকে। জগবন্ধু তাকে বসার জন্য মোড়া টেনে এনে দিয়ে খবর দিতে চলে গেল ভেতরে।

আজকাল তাসের আড্ডা বসে না। দিব্যনারায়ণ বা বিমলচন্দ্র কেউই তেমন তাগিদ বোধ করেন না। তবে দিব্যনারায়ণ মাঝে মাঝে সান্যাল বাড়ি গিয়ে অগ্রজ-তুল্য বিমলচন্দ্রের খোঁজখবর নিয়ে আসেন।

জগার কাছে খবর পেয়ে বিস্মিত হলেন দিব্যনারায়ণ। সকালবেলায় বিমলচন্দ্র

নিজেই যখন তার তার কাছে চলে এসেছেন, তখন কারণটি অবশ্যই গুরুতর হবে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসেন দিব্যনারায়ণ। বিমলচন্দ্রের পাশে রাখা আরেকটি মোড়ায় বসেন।

তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় তার প্রশ্নে, তার কণ্ঠস্বরে।

—কি ব্যাপার, দাদা? আপনি নিজে এলেন কেন? খবর পাঠালে আমিই যেতাম। আপনার শরীর ভাল না। এই কষ্ট করার দরকার ছিল না।

বিমলচন্দ্র হাসেন।

—না হে। আমার আসা দরকার বলেই এসেছি। যে কারণে এসেছি, তার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠানো চলে না। আমি তোমার কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি। যদি রাখ, তাহলে নিশ্চিন্ত হই।

দিব্যনারায়ণ কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন বিমলচন্দ্রের দিকে।

বিমলচন্দ্র খোলসা করে বলেন তার আসার কারণ। তিনি দৌহিত্রের জন্য সরস্বতীকে ভিক্ষা চাইছেন। এক ঢিলে দুই পাখি বধ করার ইচ্ছা তার। নাতির জন্য সদ্বংশজাত সুন্দরী কন্যা নেবেন, আর দিব্যনারায়ণের কাছে রাখা তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। রোগ নিরাময়ের জন্য দিব্যনারায়ণের কাছে ঋণী তিনি। কন্যাদায় থেকে তাকে উদ্ধার করে ঋণশোধ করবেন, এই তার বাসনা।

হতবাক হয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। এমন প্রস্তাব অকল্পনীয়। বর দিতে চেয়ে বিমলচন্দ্র তাকে প্রকারান্তরে অভিশাপ দিচ্ছেন। সরস্বতীর বয়স মাত্র নয় বৎসর। গৌরীদান প্রথা এখন অচল। মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শেখাবেন। ভাল করে মানুষ করে তুলবেন। পরে যথাসময়ে সুপাত্র খুঁজে তার হাতে কন্যা সমর্পণ করবেন।

বিমলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিমার বিয়ে হয়েছিল এক ধনী জমিদার পরিবারে। অল্প বয়সে একটি পুত্রকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর বেশির ভাগ সময় পিত্রালয়েই অতিবাহিত করেন। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসেন। তবে পুত্রটি তার এক রকম মাতুলালয়েই মানুষ। বিমলচন্দ্রের চোখের মণি সে। সান্যাল পরিবারে ছেলের মতই মানুষ হয়েছে সে।

কিন্তু লেখাপড়া বেশি শেখেনি। পিতৃহীন ছেলেটির প্রতি স্নেহাতিশয্য সে ব্যাপারে অন্তরায় হয়েছে। বিমলচন্দ্র বা তার দুই পুত্র কিংবা বাড়ির অপর কেউ তাকে শাসন করতে পারেননি।

অতএব গোপালকৃষ্ণ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হেসে খেলে বড় হয়ে উঠছিল। বয়সে সরস্বতীর চেয়ে কম করেও পনর বছরের মত বড়। অল্প বয়স থেকেই পান খাওয়া ধরেছে সে। ফর্সা গোলগাল নাড়ুগোপালের মত চেহারার গোপালকৃষ্ণের ঠোঁট দুটি পানের রসে সবসময়েই লাল হয়ে থাকে।

কি চেহারায়, কি স্বভাবচরিত্রে, কি বিদ্যাবত্তায়—কোনভাবেই দিব্যনারায়ণের

আকাঙ্খিত পাত্র নয় সে। ওরকম পাত্রের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ দেওয়া আর তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া এক ব্যাপার।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েই রইলেন দিব্যনারায়ণ বিমলচন্দ্রের দিকে। একি প্রহসন? এভাবে তার ঋণ শোধ করতে চাইছেন বিমলচন্দ্র? ভদ্রতার খাতিরেও মুখ দিয়ে কোন কথা বের করতে পারলেন না তিনি। পূর্ববৎ নির্বাক থাকলেন।

বিমলচন্দ্র এসব কোন কিছুই লক্ষ্য করলেন না। আবেগের সঙ্গে দিব্যনারায়ণের হাতদুটি জড়িয়ে ধরেন তিনি আরেকবার।

—আমি বেঁচে থাকতে এ বিয়ে দিয়ে যেতে চাই, রাখাল। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন আরও মজবুত হয়ে উঠবে তাহলে।

বিরক্তি লাগছিল দিব্যনারায়ণের। তাব মনে হচ্ছিল, নিজের হাতদুটি তিনি মুক্ত করে নেন। বিমলচন্দ্র তার আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে দখল করে নিতে উদ্যোগী হয়েছেন তার দামী সম্পদ।

কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত করলেন। আরও একটি কথা ভাবলেন। বিমলচন্দ্র হয়ত ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে, তা তলিয়ে দেখছেন না। দৌহিত্রের প্রতি স্নেহে অন্ধ বিমলচন্দ্রকে চক্ষুষ্মান করে তোলা এই মুহূর্তে তার সাধ্য নয়।

নিরাসক্ত গলায় দিব্যনারায়ণ সময় চাইলেন বিমলচন্দ্রের কাছে। বললেন, সরস্বতীর মায়ের মত না নিয়ে তিনি এ ব্যাপারে এগোতে চান না। তাদের একটি মাত্র কন্যা। ভেবে দেখার জন্য সময় দরকার তাদের।

একটু যেন ক্ষুন্ন হলেন বিমলচন্দ্র। তিনি ভেবেছিলেন দিব্যনারায়ণ আহ্লাদিত হবেন। কালবিলম্ব না করে সম্মতি জানাবেন। অবশ্য দিব্যনারায়ণ অহংকারী। তার রয়েছে আভিজাত্যের গর্ব। জমিদারের রক্ত বইছে তার শরীরে। জমিদারের মানমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সদাসচেতন। মনে মনে নিজেদের উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছেন। সান্যালরা সামান্য অবস্থা থেকে তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছে। তাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করেননা দিব্যনারায়ণ। এসব তার অজানা নয়।

কিন্তু অতীতের কথা থাক। ধনৈশ্চর্যে অনেক পিছনে এখন ঘোষালরা। মামলা মোকদ্দমায় সবই তো খুইয়েছে তারা। তলানিতে এসে পেঁাছেছে এখন তাদের রমরমা। সর্বোপরি, তিনি পাত্রপক্ষ। দিব্যনারায়ণ কন্যার পিতা। স্বাভাবিক নিয়মেই তার স্থান বিমলচন্দ্রের নীচে।

বিমলচন্দ্র উঠে দাঁড়ান।

—উঠি। তোমরা ভেবে দেখ। আমি গোপালের বিয়ে তাড়াতাড়ি দেব। তোমরা কি স্থির করলে জেনে পরবর্তী করণীয় ঠিক করব।

বিমলচন্দ্রকে লক্ষ্য করেন দিব্যনারায়ণ। আস্তে আস্তে একটু যেন মনমরা হয়ে চলে যাচ্ছেন তিনি। বিরক্তির সঙ্গে একটু যেন অস্বস্তিও বোধ করেন দিব্যনারায়ণ। প্রস্তাবটা না আনলেই ভাল করতেন বিমলচন্দ্র।

ক্লান্ত পায়ে বাড়ির ভেতরে এগিয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ ঘোষাল। তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত।

।। ছয় ।।

আবার হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন দিব্যনারায়ণ। দেবিকারানী যে প্রস্তাবটা এভাবে লুফে নেবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

নিয়মরক্ষামত স্ত্রীকে বিমলচন্দ্রের প্রস্তাবের কথা জানিয়েছিলেন। এরকম প্রস্তাব দেবিকারানীর মনোমত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেবিকারানী তার সব চিন্তাভাবনা মিথ্যা প্রমাণিত করে খুশিতে বিগলিত হলেন।

—সত্যি বলছ? এ তো দারুণ সুখবর! সরস্বতী আমাদের কাছে কাছে থাকতে পারবে। তাকে দূরে যেতে হবেনা। আর জানাশোনা ঘর। অজানা অচেনা পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি কত!

দিব্যনারায়ণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকান দেবিকারানীর দিকে।

—বলছ কি তুমি? মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দেবে? সব দিক ভেবে দেখেছ? মেয়ের বয়স নয়। ছেলের বয়স কম করেও চব্বিশ পঁচিশ। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। চার চারবার ম্যাট্রিক ফেল। নাড়ু গোপালের মত চেহারা। তার ওপরে পান খাওয়া ধরেছে। সব সময়ে মুখে পান। টাকা পয়সা সম্পত্তি—এসব ধুয়ে কি জল খাবে আমাদের মেয়ে?

দেবিকারাণী গা করলেন না। দিব্যনারায়ণের কথায় তার কোন প্রতিক্রিয়া হোল না।

—শোন, তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। সরস্বতীর অসুখের সময় তার আরোগ্য কামনা করে জগদ্ধাত্রীকে খুব ডেকেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে ভাল হয়ে উঠলে আমি তার বিয়ে দেব। গোত্রান্তর হলে শুনেছি ফাঁড়া কেটে যায়। প্রাণসংশয় থাকে না। কিন্তু আমি মনকে শক্ত করতে পারিনি। ওর দিকে তাকিয়ে কেবলি ভেবেছি, এত কচি বয়সে ওকে পরঘরী করব? এখন মনে হচ্ছে, ঠাকুরই পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সম্বন্ধ। তুমি অমত করোনা। ভালই থাকবে সরস্বতী। গোপালকৃষ্ণদের অত টাকা পয়সা সম্পত্তি! রাজরাণী হয়ে থাকবে আমাদের মেয়ে। আর গৌরী দানে মহাপুণ্য। তুমি কালবিলম্ব না করে তোমার মত জানিয়ে দাও ওদের।

সব শুনে দিব্যনারায়ণের প্রবল আপত্তি বুঝি থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু দূর হয় না তার দ্বিধা।

—আমার মন সায় দিচ্ছেনা। যার বিয়ে, তার মতও তো নেওয়া দরকার!

দেবিকারানীর আজ অজয় আত্মবিশ্বাস। এতদিন স্বামীর দ্বারা পুরোপুরি চালিত হয়েছেন। আজ স্বামী তার দ্বারা চালিত হবেন। মুহূর্তের জন্য অন্য সব প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। বিচিত্র এক আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তিনি। মাথা নত করে চিরকাল স্বামীর হুকুম তামিল করে এসেছেন। আজ মেয়ের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তার হাতে। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, দিব্যনারায়ণ তাই মেনে চলবেন।

তার কাছে প্রশ্রয় পায়না দিব্যনারায়ণের দ্বিধা। তিনি তার আপত্তি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না।

—নয় বছরের মেয়ে বোঝেটা কি? আমাদের মতই ওর মত।

যথাসময়ে সরস্বতীর কানেও পৌঁছল সেই সংবাদ। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে জেনে সরস্বতী দুঃখিত হোলনা। সে শুনল, বিয়ে হলে অনেক শাড়ি গয়না পাওয়া যায়। অতএব সে মনে মনে খুশিই হোল। তাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে উৎসবের আয়োজন চলেছে দেখে মনে মনে রীতিমত গর্ববোধ করল সরস্বতী।

নির্দিষ্ট দিনে গা ভর্তি গয়না দিয়ে তাকে সাজানো হোল। অলকাতিলকায় সজ্জিত সরস্বতীকে দেবী প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। 'বর এসেছে', 'বর এসেছে' রবে আকৃষ্ট হয়ে মেয়েরা সরস্বতীকে ছেড়ে ছুটে চলে গেল বরকে দর্শন করতে। সরস্বতীরও কৌতূহল হোল। সান্যালদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে বলে শুনেছিল সে। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি কে এবং তার চেহারা কেমন—এসব কোন কিছুই তার জানা ছিল না। কনে বেশে সরস্বতীও ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্য মেয়েদের পিছনে পিছনে।

বরকে দেখে তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। উৎসবে অনুষ্ঠানে মাঝেমাঝে সান্যালদের বাড়ি সে গিয়েছে বাড়ির লোকের সঙ্গে। কিন্তু সান্যালদের বাড়ি অনেক লোক। সে ছোট মেয়ে। সকলকে সে চিনত না। আর চেনার তাগিদও সেই বয়সে কেউ বোধ করেনা। বরকে দেখে তার মনে হোল, সান্যালদের বাড়ির এই বিশ্রী চেহারার লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে জানলে সে কখনই রাজী হোতনা।

হৃষ্টপুষ্ট বিশাল চেহারার নাড়ুগোপাল বরকে তার পছন্দ হোলনা। সরস্বতীর মনে এতক্ষণ যে খুশির বাজনা বাজছিল, তা স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা কালো ছায়া তার মনকে গ্রাস করে নিল।

হঠাৎ তার কান হিঁচড়ে টেনে আনেন তাকে দেবিকারানী। ঠাস ঠাস করে গালে চড়ও মারেন কয়েকটা। 'পাজি মেয়ে! শুভ দৃষ্টির আগে কেউ বরকে দেখে?' মায়ের কাছে এভাবে নির্যাতিত হয়ে সরস্বতী আরও মুষড়ে পড়ল।

বিয়ের লগ্ন ছিল অনেক রাত্রে। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছিল সরস্বতীর। বাড়িতে অঢেল আয়োজন। কিন্তু তাকে কেউ পাত পেড়ে খেতে ডাকল না। বিয়ের পিঁড়িতে যখন সরস্বতীকে বসানো হোল, সে তখন টলছে ঘুমে। শুভদৃষ্টির সময় ঘুমে বুজে আসছিল তার চোখ। ধরে ধরে সব কিছু করানো হোল তাকে।

বাসর ঘরে যখন তাকে ঢোকানো হোল, তখন তার অচৈতন্য অবস্থা। কোন কিছুই লক্ষ্য করার বা শোনার মত অবস্থা নেই।

পরের দিন নিয়মকানুনের আতিশয্যে হাঁফিয়ে উঠতে উঠতে সরস্বতীর মনে হোল, বিয়ে ব্যাপারটা মোটেই সুখের নয়। যার জন্য উৎসবের আয়োজন, তাকেই কষ্ট করতে হয়। এত অঢেল আয়োজন খাওয়ার, কিন্তু সে কিছুই খেতে পারেনি। মধ্যরাত্রিতে তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় সে কি খেয়েছে, কি খায়নি, তা তার খেয়াল নেই।

শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সকলের কান্না দেখে সরস্বতীর বুকের মধ্যেও কান্নার ঢল উঠলো। সকলকে ছেড়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল সে। নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারল না। ডাক ছেড়ে জোরে কেঁদে উঠল। একরকম জোর জবরদস্তি করেই তাকে ওঠানো হোল গাড়িতে।

সরস্বতীর স্বামী যদিও মাতুলালয়েই থাকে অধিকাংশ সময়, তবু বৌভাতের আয়োজন হোল তাদের নিজেদের বাড়িতে। বাঁকুড়া জেলার গ্রামে। বিশাল অট্টালিকা, বাড়িভর্তি লোকজন। নয় বছরের সরস্বতীও সব দেখেশুনে বুঝে গেল, ধনসম্পদের কমতি নেই এদের।

শাশুড়ী তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করল, বাড়ির অন্যরাও তার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল মিষ্টি ব্যবহার করল। বৌ দেখে সকলেই খুশি। পিত্রালয়ে তার রূপ নিয়ে অত আলোচনা সে শোনেনি। শ্বশুরবাড়িতে তাকে দেখে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার সৌন্দর্যের স্তুতি শুনে আর সকলের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়ে সরস্বতী তার আগের সব দুঃখ ভুলে গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর ব্যবহারে আবার তার পুরনো দুঃখ জেগে উঠল। অনেক রাত্রে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে গাভর্তি গয়না পরিয়ে পাঠানো হোল দোতলায় এক বিশাল ঘরে স্বামীর কাছে।

তার স্বামী জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েরা তাকে খাটের উপর বসিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে চলে গেল। ফুল দিয়ে আলো দিয়ে সাজানো ঘর। বসে বসে ঘামতে লাগল সরস্বতী ভয়ে। তার স্বামী একটিও কথা বললনা তার সঙ্গে। সরস্বতীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আগের মতই পিছন ফিরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

গত কয়েকদিন ধরে তার শরীরের উপর ধকল চলছিল কম না। রাতও বড় কম হয় নি। অত রাত্রে জেগে থাকার অভ্যাস নেই তার। গুটিসুটি মেরে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল সরস্বতী। একটু পরে ক্লান্তিতে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

মাঝরাত্রে কঠিন পরুষ হাতের এক ধাক্কা খেয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সরস্বতীর চোখে পড়ল স্বামীর রাগী কঠিন চোখের দৃষ্টি। ঘুমের ঘোরে তার

হাতটা স্বামীর পিঠে এসে ঠেকেছিল। সেজন্য রেগে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে তার হাত। তার বুকে গুরগুরিয়ে উঠল ভয়।

সন্ত্রস্ত হয়ে একান্তে কোনের দিকে সরে গেল সে। তার কান্না আসছিল। বাড়ি থেকে এত দূরে অজানা অচেনা পরিবেশে এরকম অভাবিত দুর্ব্যবহার পেয়ে সরস্বতী ভয় পেল। তার মনে হোল, এই লোকটা তাকে ঠিক মেরে ফেলবে। তার বাড়ির লোকেরা তা জানতেই পারবে না।

ভেতরের দুর্বার শোক ও ভয় আর চেপে রাখা সম্ভব হোল না। হাউমাউ করে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল সে। তার স্বামী মোটা কঠিন গলায় জোরে ধমক দিল—'অ্যাই চোপ।' সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ হয়ে গেল তার। ভয়ে সিঁটিয়ে রইল সে। দাঁতমুখ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। একটু পরে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু তার ফুলশয্যার ইতিহাস এখানেই শেষ হোল না। আবার তার স্বামীর কি অসুবিধা হোল। সবল পদাঘাতে সরস্বতীকে খাট থেকে মাটিতে ফেলে দিল সে। ঘুম ভেঙ্গে গেল সরস্বতীর। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। কিন্তু এবার আর আগের মত হাউমাউ করে কাঁদল না। উঠে দাঁড়িয়ে আহত রোষে, অপমানে তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীকে বিদ্ধ করে নয় বছরের স্ত্রী প্রতিবাদ জানাল—'তুমি আমায় লাথি মারলে?'

জবাবের প্রতীক্ষা না করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সরস্বতী। শাশুড়ীর ঘর কোনটা, তা সে জেনে গিয়েছিল। নীচে শাশুড়ীর ঘরের সামনে এসে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল—'ও মা, দরজা খোল'। সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খুলে দিলেন তার শাশুড়ী। তাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলেন—'কি হয়েছে মা? তুমি চলে এলে কেন?'

সরস্বতী হাঁফাচ্ছিল। আহত ত্রাসে বড় বড় চোখ দুটি তুলে শাশুড়ীর কাছে সে নালিশ জানাল। তার কাছে সান্ত্বনা খুঁজল।

—ও আমায় লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে। আমি ও ঘরে শোব না। ও লোক ভাল না। আমি তোমার কাছে শোব।

শাশুড়ী পরম মমতায় তার বুকে পিঠে হাত বুলোতে থাকেন। বিড় বিড় করে ছেলেকে বকতে থাকেন আপন মনে।

—ওটা অমানুষ, জানোয়ার। কচি মেয়েটাকে কেউ এভাবে মারে? একটুও মায়া হোল না?

সরস্বতীর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসেন ভেতরে। দরজা বন্ধ করে সস্নেহে তাকে শুইয়ে দেন খাটে। সরস্বতী শোনে, চাপা গলায় বিলাপ করছেন তিনি।

—আমারই ভুল হয়েছে, মা। হায় হায়, আমি তোমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলাম? আমি এখন করি কি?

দ্বিরাগমনে পিত্রালয়ে এলো সরস্বতী। আসার সময় শাশুড়ী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক উপদেশ দিলেন।

—শ্বশুরবাড়ির কথা বাপের বাড়িতে বলতে নেই, মা। তুমি ছোট, কিই বা বোঝ? ভালয় ভালয় ফিরে এস। আমি সব ঠিক করে দেব।

শাশুড়ীর উপদেশ মানতে পারেনি সরস্বতী। শাশুড়ীকে তার ভালো লেগেছে। মায়ের থেকেও বেশি আদর পেয়েছে সে শাশুড়ীর কাছে। কিন্তু নিজের বাড়ির লোকেদের কাছে তার দুঃখ লুকিয়ে রাখবে কেন?

দেবিকারানীর কাছে গড়গড় করে সে তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বলে গেল। দেবিকারানী শুনলেন, শাশুড়ী মা ভাল, বাড়ির আর সকলে ভাল, ভাল নয় কেবল একটি লোক—তার স্বামী।

ফুলশয্যার রাতে স্বামীর দুর্ব্যবহারের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল দেবিকারানীর মুখ। এ তিনি কি করলেন? স্বামী তাকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি চাননি এখানে মেয়ের বিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞার দোহাই দিয়ে স্বামীকে চুপ করালেন। তার নিষেধ কানে তুললেন না। ফলটা কি হোল? মেয়ের অকালমৃত্যু রুখতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এক মৃত্যু রুখতে গিয়ে তার আরেক মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করলেন?

তবু আশায় বুক বাঁধলেন তিনি। সময়ে অনেক কিছুই ঠিক হয়ে যায়। পাত্র নির্বাচনে ভুল হয়েছে তার। আরও ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। তিনি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সব কিছু শুনে মনে হচ্ছে, সরস্বতীকে পছন্দ হয়নি তার বরের। তবে তার অর্থ সে ছেলে অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে, এমনটা না—ও হতে পারে। হয়ত সরস্বতীর বয়স অত কম বলেই তাকে মনে ধরেনি তার স্বামীর। ধৈর্য ধরে আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করলে পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিতে পারে।

সরস্বতীকে দেবিকারানী পইপই করে শিখিয়ে দিলেন, সে যেন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া না করে, তার কাছে মেজাজ না দেখায়। আরও বললেন, বাড়ির অপর কারুর কাছে এসব যেন সে না বলে।

দিব্যনারায়ণ এসব কিছুই জানলেন না। মেয়ের চোখমুখ শুকনো দেখে তার মনে হোল অন্য কথা। ভাবলেন, 'কচি মেয়ে—এই বয়সে বাবা মা আত্মীয়স্বজনের চেনা পরিবেশ ছেড়ে অন্য বাড়িতে, অন্য পরিবারে কখনও থাকতে পারে? ওর তো খারাপ লাগারই কথা। ও বিয়ের বোঝটা কি? আসলে বড় দুর্বল জায়গা ধরে টান দিয়েছিল তার স্ত্রী। তার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির মৃত্যুশোক তিনি এখনও ভুলতে পারেননি। তার আদরের এই মেয়েটিকেও আবার বুঝি ছিনিয়ে নেয় ভাগ্য, এই আশঙ্কায় তিনি আর কোন আপত্তি করেননি। স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করেছেন। একমাত্র কন্যাকে এই বয়সেই কাছছাড়া করেছেন। এ কি তার কম দুঃখ?

শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বেঁকে বসল সরস্বতী। নিজের বাড়ি ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না। সকলে মিলে অনেক করে বোঝাল। শেষ পর্যন্ত শিগগিরই তাকে নিয়ে আসা হবে, এরকম আশ্বাস পেয়ে তবে সরস্বতী গিয়ে গাড়িতে উঠল।

শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসে সরস্বতী পারতপক্ষে স্বামীর কাছে ঘেঁষলনা। তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তার শাশুড়ী তাকে রাত্রে স্বামীর ঘরে স্বামীর কাছে শোবার কথা বলতে সাহস করলেন না।

তবু মায়ের প্রাণ! বৌয়ের দিকে যাতে ছেলের মন ঝোঁকে, তার জন্য একেক দিন সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন তাকে ছেলের ঘরে। এটা সেটা উপলক্ষে। সরস্বতী যেতে চাইত না। মুখ গোঁজ করে থাকত। বলত, 'তোমার ছেলে ভাল না। ওর কাছে আমি যাব না।' আদর করে গাল টিপে দিতেন শাশুড়ী। তাকে বোঝাতেন, 'লক্ষী মা আমার! গোপাল পান খেতে ভালবাসে। যাও, পানটা দিয়ে এসো।'

সরস্বতী ছোট মেয়ে। একমাত্র ছেলের বৌ। বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। শ্বশুরবাড়িতে কোন কাজ করতে দেননা শাশুড়ী সরস্বতীকে। এ বাড়িতে সকলের মাথার মণি সে। আদরে যত্নে ভালবাসায় তাকে ভরিয়ে রাখে সকলে।

কিন্তু তাকে পান সাজা শিখতে বললেন শাশুড়ী। ছেলে সারাদিন পান খায়। এক দাসীর ওপর রয়েছে তার পান সাজার ভার। শাশুড়ী তাকে দাসীর সামনে বসে পান সাজার কলাকৌশল রপ্ত করতে বলেন। হাতে করে অবশ্য তাকে পান সাজতে দিলেন না।

সাবিত্রী দাসীর সামনে বসে সরস্বতী শাশুড়ীর নির্দেশে তার পান সাজার কায়দা লক্ষ্য করে। শাশুড়ির অন্য কাজ থাকে। সরস্বতীকে রেখে তিনি চলে গেলে পর সাবিত্রী তার সঙ্গে অনেক গল্প করে। তাকে গাল টিপে আদর করে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।

একদিন পান সাজতে সাজতে সাবিত্রী তাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করল। ধারে কাছে সরস্বতীর শাশুড়ী বা অন্য কেউ ছিলেন না। তবু সাবিত্রী সতর্কভাবে চোখ দিয়ে চারদিক জরীপ করে নিল। পরে গলার স্বর অনেক নামিয়ে সরস্বতীর কাছে তার কৌতূহল ব্যক্ত করল।

— বৌমণি, দাদাবাবু তোমাকে ভালবাসে?

সবেগে মাথা নাড়ে সরস্বতী।

—একটুও না।

সাবিত্রী তখন তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্যক্ত করে।

—তুমি দাদাবাবুকে ভালবাস?

এবারও সবেগে মাথা নাড়ে সরস্বতী আগের মত।

—একটুও না।

মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে সাবিত্রী তার আক্ষেপ প্রকাশ করে।

—আহা রে! শুনেছি কত বড়লোক বাপের মেয়ে তুমি। তাও দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র মেয়ে। তোমার কপালে এমনটা হোল কেন? খোঁজ খবর নিয়ে তোমার বিয়েটা দিতে পারল না তোমার বাড়ির লোক?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে সাবিত্রী। পরে আবার চারদিক সতর্ক চোখে জরীপ করে নেয় সে।

—তোমায় একটা কথা বলি গো, বৌমণি। তুমি যেন আবার কাউকে বলোনি বাপু। দাদাবাবু না তার খুড়িমার বোনের মেয়েকে ভালবাসে। মাঝে মাঝে চন্দননগরে ওদের বাড়ি যায়। মা সেকথা জানে। ভাইয়ে ভাইয়ে শরিকী বিবাদ কিনা? তাই দুজনের বিয়েটা হোল নি! কিন্তু তোমার এমন সর্বনাশটা করল কেন জানিনা, বাবা। আগে তো ছেলেকে ফেরাবি? তা না করে পরের বাড়ির কচি মেয়েটার জীবন এভাবে শুধু শুধু নষ্ট করে কেউ?

শাশুড়ীর নিন্দা পছন্দ হোল না সরস্বতীর। সে সবেগে প্রতিবাদ করল।

—না না, আমার শাশুড়ী-মা ভাল। আমায় খুব ভালবাসে।

সাবিত্রী প্রতিবাদ করে না। মেনে নেয়।

—ভালবাসবে না কেন? তুমি যে লক্ষ্মী বৌ। এমন সোন্দর পানা চেহারা তোমার!

দাশরথি চাকর এসে উপস্থিত হোল সেই মুহূর্তে।

—সাবি, দাদাবাবু তোকে ডাকছে।

পানের বাটা সাজিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সাবিত্রী। দাশরথি একটু এগিয়ে যেতেই সরস্বতীকে করুণ কণ্ঠে মিনতি করে।

—তোমাকে ভালবাসি বলে কথাটা বললুম গো, বৌমণি। তুমি যেন কাউকে বোলোনি। আমার তাহলে অন্ন ঘুচে যাবে গো।

সরস্বতী অনেক কিছুই বোঝে না। তার অল্প বয়স, অভিজ্ঞতার পুঁজি শূন্য। জীবনজগতের অলিগলির সুলুকসন্ধান তার জানার কথা নয়। কিন্তু তার অনভিজ্ঞ সরল মনেও সাবিত্রীর অযাচিতভাবে দেওয়া খবর কেমন এক তরঙ্গ তুলল। কচি মন দিয়েও স্বামীর অপ্রসন্নতার কারণ অনুধাবন করল সে। তাকে অপছন্দ হওয়ার কারণ যে অন্য একটি মেয়ে, এই কথাটা বুঝতে তার অসুবিধা হোল না। তাকে দেখলে কেন তার স্বামীর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, কেন সে তাকে সহ্য করতে পারে না, তা সে এতদিনে স্পষ্ট করে বুঝল।

সাবিত্রী তাকে বারণ করে দিয়েছিল, এ বাড়ির কাউকে যেন এ কথা না বলে। সাবিত্রীকে সে ভালবাসে। তাকে অসুবিধায় ফেলবে না বলেই সে শ্বশুরবাড়ির কাউকে সেকথা জানাল না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেলল, বাপের বাড়ি এলে মাকে সব জানিয়ে দেবে। তার মা তাহলে আর তাকে শ্বশুরবাড়িতে জোর করে পাঠাবে না।

কিছুদিন পর আবার বাপের বাড়ি এল সরস্বতী। তার কাছে সব শুনে

দেবিকারানী গম্ভীর হয়ে গেলেন। এরকম যে ঘটতে পারে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। একমাত্র কন্যার জীবনে এ কি দুর্ভাগ্যের অন্ধকার নামিয়ে দিলেন? সব শুনলে দিব্যনারায়ণ কি বলবেন? স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না তিনি। অনেক সময়েই তাকে বলতে শোনেন দেবিকারাণী —'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী,' কিংবা 'বার হাত কাপড়েও যাদের কাছা হয় না, তাদের বুদ্ধি আর কত হবে?'

স্ত্রীর অবিমৃষ্যকারিতার এই পরিণাম দিব্যনারায়ণ ক্ষমা করবেন না। কি করণীয় দেবিকারাণীর? পরিত্রাণের কোন উপায় যে জানা নেই তার। শাস্ত্রমতে অগ্নি সাক্ষী রেখে মন্ত্রোচ্চারণক্রমে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা বাতিল হবে কি ভাবে? বিধাতাপুরুষই কি ছড়ি ঘুরিয়ে উচিত শিক্ষা দিলেন তাকে?

দেবিকারানী ঠিক করলেন মেয়েকে, তিনি ঘন ঘন নিজের কাছে এনে রাখবেন। আগে অন্য কথা ভেবেছিলেন। শ্বশুরবাড়ি না থাকলে সেখানকার জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না। তার মন বসবে না। ছোট মেয়ে আদর যত্নে ভালবাসায় একবার সেখানে শিকড় গেড়ে বসুক। শ্বশুরবাড়িকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে শিখুক। তাকে সেজন্য কঠিন হতে হবে। মেয়েকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। তাকে ঘন ঘন বাপের বাড়ি আনবেন না।

এখন মেয়ের কাছে সব শুনে সমাধানের উপায় হিসাবে বিপরীত পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করলেন।

সান্যালদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক, তাতে সে ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না। তার বেয়ানও আপত্তি করতে পারবেন না। সব জেনে শুনে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরিণামের কথা ভাবেন নি। অত্যন্ত অনুচিত কাজ করেছেন তিনি। দেবিকারানী তাকে কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

অতঃপর সরস্বতী বেশির ভাগ সময়টাই পিত্রালয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নিয়ম রক্ষামত কখনও বাঁকুড়ার গ্রামের বাড়ি, কখনও বা বরানগরে মামাশ্বশুরের বাড়িতে কয়েকদিন করে থেকে যায়। শ্বশুরবাড়িতে তাকে এক রকম মাথায় করে রাখে সকলে। বাপের বাড়ির তুলনায় শ্বশুরবাড়িতে আদর যত্ন অনেক বেশিই পায় সে।

ভাল ভাল দামী শাড়ি গয়না দিয়ে, ক্ষীর মিষ্টি মাংস পোলাও খাদ্যসম্ভার দিয়ে তাকে বশীভূত করার চেষ্টা চলে শ্বশুরবাড়িতে। শাশুড়ী অনুতপ্ত চিত্তে তার অপ্রাপ্তির ঘাটতি নানাভাবে পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কি বাঁকুড়া, কি বরানগর—কোথাও সরস্বতীর যত্নের এতটুকু ত্রুটি হয় না। বাপের বাড়ির তুলনায় শ্বশুরবাড়িতে সরস্বতীর গুরুত্ব অনেক বেশি। সকলের সজাগ দৃষ্টি তার ওপরে। তার এতটুকু মুখভার দেখলেও অস্থির হয়ে পড়ে সকলে। কিছু দিনের মধ্যেই সরস্বতীর মন বসে গেল।

একমাত্র স্বামীর সঙ্গেই তার কোন রকম সম্পর্ক গড়ে উঠল না। শ্বশুরবাড়িতে

যখন সে থাকে, শাশুড়ী তাকে আগের মতই চা, জল খাবার, পান, হাতে করে স্বামীকে দিতে বলেন। শাশুড়ীর কথা অমান্য করতে পারেনা সরস্বতী। কিন্তু তাকে দেখামাত্র স্বামীর মুখে যে বিরক্তি, বিতৃষ্ণা আর অপ্রসন্নতা ফুটে ওঠে, তা সরস্বতীর চোখ এড়ায় না। তার খারাপ লাগে। ইচ্ছা করে, খাবারগুলি ছুঁড়ে ফেলে চলে আসে ঘর ছেড়ে।

কিন্তু তা সে করতে পারে না। তার অন্তরায় তার মা'ও শাশুড়ী-মায়ের উপদেশ। তারা বারবার করে বলে দিয়েছেন, সে যেন কখনও স্বামীর কাছে রাগ না দেখায়। তাহলে ফল খুব খারাপ হবে।

ফুলশয্যার রাতেই স্বামীর রাগ দেখেছিল সরস্বতী। দিব্যনারায়ণের কন্যা সে। নির্যাতনের স্মৃতি, অপমানের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি তার মন থেকে। গোপালকৃষ্ণকে তারও অসহ্য লাগে। যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি সময় সে থাকেনা গোপালকৃষ্ণের সামনে। তার কাঁচ মনেও একটি প্রশ্ন দুর্বার হয়ে ওঠে অনেক সময়েই। 'আমার বর এমন হোল কেন ?'

বরানগরে তার দুই মামাশ্বশুর। বড় মামাশ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি ডাক্তারি পড়ে। অত্যন্ত রূপবান সে। বয়সে গোপালকৃষ্ণের চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের ছোট। তাকে খুব পছন্দ করে সরস্বতী। রূপে গুণে শ্রেয় মামাতো দেওরটিকে দেখে তার মনে হয়, 'ও যদি আমার বর হোত, তাহলে বেশ হোত।'

তার এই দেওরটি খুব চুপচাপ। কারুর সঙ্গেই তেমন কথাবার্তা বলে না। সরস্বতী বুঝতে পারেনা, কেন সে সব সময়ে এমন গম্ভীর মুখে থাকে। তার প্রশ্নের জবাব মিলল, মেজ মাসিশাশুড়ীর মেয়ে শীলার কাছে। বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড় সে সরস্বতীর থেকে। কিন্তু সরস্বতীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে। সরস্বতীর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মামার বাড়ি এসে থাকে সে।

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে খাটে শুয়ে গল্প করছিল। সরস্বতী তার মনের কৌতূহল ব্যক্ত করে ফেলল। শীলা ফিসফিস করে তাকে যা বলল, তা শুনে সরস্বতী এতটুকু হয়ে গেল। সরস্বতী শুনল, তার ছোট মামীশাশুড়ীর সঙ্গে নাকি গোপন সম্পর্ক ছিল বিভাসের। বাড়ির এক দাসী ছাদের চিলেকোঠায় তাদের একসঙ্গে বিশ্রী অবস্থায় দেখতে পায়। বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে তা নিয়ে। তারপর থেকেই গম্ভীর হয়ে গেছে বিভাস। ছোট মামীশাশুড়ীর সঙ্গেও এখন তার কথাবার্তা বন্ধ। ছোট মামীশাশুড়ী অত্যন্ত রূপসী। সন্তানাদি নেই।

সরস্বতীর জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। শীলা তার অজ্ঞান অন্ধকার চেতনালোকে আলোকপাত করে। জীবনের এক বিচিত্র রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন হয় সেদিন। সরস্বতী শোনে, তার ছোট মামাশ্বশুর ইমপোটেণ্ট, অক্ষম। সেই জন্যই নাকি ছোটমামীর সঙ্গে বিভাসের ওরকম সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

সব কথা ভাল করে বোঝেনি সরস্বতী। শীলাও সব কথা ভাল করে ব্যাখ্যা

করতে পারেনি। কিন্তু এক নির্বন্ধ জগতে যেন পদার্পণ করেছিল সরস্বতী। তার পিত্রালয়ে দাসীদের মুখেও অনেক আলোচনা সে শুনেছে আগে। কিন্তু সেগুলির চেহারা তত স্পষ্ট ছিল না।

শীলার হাত ধরে সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বয়স্কদের জটিল জগতে প্রবেশ করল। তার মন খারাপ হয়ে গেল। বিভাসকে তার খুব ভাল লাগত। সে যে কোন অন্যায় অশোভন কাজ করতে পারে, তা সে ধারণাই করতে পারে নি। সে ভেবেছিল, বিভাস তার বর হলে বেশ হোত। বিভাসের সুন্দর চেহারার অন্তরালে এই অসুন্দর প্রবৃত্তি তার চোখে পড়েনি।

স্পষ্ট করে এভাবে বিশ্লেষণ করেনি সরস্বতী। তার সে বয়স নয়। কিন্তু এলোমেলোভাবে যে সব চিন্তা তার মনে হানা দিল, সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করলে তার মর্মার্থ দাঁড়ায় অনেকটা ঐ রকম।

সরস্বতীর জীবন হয়ত সুখে দুঃখে একরকম কেটে যেত। বিবাহিতা স্ত্রী হলেই সে স্বামীর ভালবাসা পাবে, কিংবা তার স্বামী সচ্চরিত্র হবে, পত্নীগতপ্রাণ হবে এমন কোন অলঙ্ঘ্য নিয়ম নেই। কিন্তু সরস্বতীর ভাগ্যবিধাতা তাকে দিয়ে আরও অনেক দূর খেলাতে চাইলেন বোধ হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সরস্বতীর শাশুড়ী বেশির ভাগ সময়টাই থাকেন পিত্রালয়ে। তার পুত্রটি একরকম মাতুলালয়েই মানুষ। পুজোর সময়টা কিন্তু তিনি কাটান তার শ্বশুরালয়ে বাঁকুড়ায়। বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। আশে পাশের প্রজারা উৎসবে যোগ দেয়। ভাইফোঁটার পর তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করেন। তার দুই ভাই বাঁকুড়ায় গিয়েই তার কাছে ফোঁটা নিয়ে আসে। তাদের সঙ্গেই তিনি ফিরে আসেন বরানগরে।

গত দু'বছর ধরে সরস্বতীও ঐ সময়টা বাঁকুড়ায় থাকছে। পুজোর কাজে সাহায্য করছে শাশুড়ীকে। গোপালকৃষ্ণকেও বাধ্য করেন তার মা প্রতিমা সেখানে থাকতে। শ্বশুরালয়ের সঙ্গে প্রজাদের সঙ্গে, যোগাযোগের সূত্রটা এভাবেই অবিচ্ছিন্ন রয়েছে।

সরস্বতীর বিয়ের তৃতীয় বছরে অশান্তি দেখা দিল গোপালকৃষ্ণকে নিয়ে। সে পুজোর সময়টা বাঁকুড়ায় থাকল না। মাকে না জানিয়েই চলে গেল চন্দননগরে। লোকমুখে প্রতিমা সে খবর পেলেন। নিমন্ত্রিত আত্মীয়কুটুম্বের প্রশ্নবাণে জর্জরিত অবস্থা তার। প্রজারাও দাদাবাবুর অনুপস্থিতি নিয়ে নানা রকম সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করতে লাগল। দাসদাসীর মারফৎ অনেক কথাই কানে এল প্রতিমার।

একমাত্র পুত্র তার গোপালকৃষ্ণ। অল্প বয়সে তাকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। পুত্র তার চোখের মণি। মাতুলালয়েও সকলের অতি আদরের। অতি আদরেই হয়ত বাঁদর হয়েছে। লেখাপড়াটা ভালভাবে করলনা। মামাদের ব্যবসা দেখাশোনা করে। কিন্তু সেও দায়সারাভাবে। তাকে দিয়ে সংসারের কোন সুরাহাই হয় না।

পুজোর ব্যাপারে প্রতিমা শ্বশুরকুলের জ্ঞাতি আত্মীয়দের কাছে, ভাইদের কাছে সাহায্য নেন। দেওরের সঙ্গে শরিকী বিবাদ চলেছে বহুদিন ধরে। তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রিবাটা করে এখানকার পাট চুকিয়ে চন্দননগরে চলে গেছে। তার জায়ের আরেক বোন সেখানেই থাকে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা তার দেওর। বাড়ির পুজোয় তাদের কোন আগ্রহ নেই। তারা কেউ আসে না এখানে। প্রথম প্রথম তাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তারা আসেনা দেখে সে পাটও চুকেবুকে গেছে।

অথচ গুণধর পুত্রটি তার জায়ের বোনঝির সঙ্গে প্রেম করছে। অদৃষ্টের প্রহসন আর কাকে বলে ? ছেলেকে ঠেকাবার জন্য তার বিয়ে দিলেন ভাল পরিবারের সুন্দরী মেয়ে দেখে। তার অপদার্থ পুত্র তার পরেও যে, এভাবে রাসলীলা চালিয়ে যাবে, তা তিনি ভাবেননি। তার অবাক লাগে ভেবে যে জায়ের বোনটিই বা কেমন ধারা মেয়েমানুষ ? তার তো উচিত শক্ত হাতে এসব নিয়ন্ত্রণ করা ? তার প্রশ্রয় না পেলে ছেলের কখনও এত সাহস হয় ? আরও ভাবেন, বন্দনাই বা কেমন ধারা মেয়ে ? সব জেনেশুনেও আগের সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে ?

পুজোর সময় গোপালকৃষ্ণের অনুপস্থিতি খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকল। সকলের ব্যক্ত, অব্যক্ত প্রশ্ন কুরে কুরে খেতে থাকে প্রতিমাকে। বিজয়া দশমীর পরদিন গোপালকৃষ্ণের পদার্পণ ঘটল বাড়িতে। প্রতিমা তাকিয়ে দেখলেন ভাল করে। অনুতাপের কিংবা লজ্জাশরমের কোন চিহ্ন নেই গোপালকৃষ্ণের চোখেমুখে। পরিতৃপ্ত, চকচকে, খুশিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে। বেশ ভালই কেটেছে তার চন্দননগরে।

পুত্র বংশের প্রদীপ। এই পুত্র নাকি তার বংশকে উজ্জ্বল করবে। সংসারের কারুর প্রতি যার এতটুকু টান নেই, কোন দায়দায়িত্ব বোধ নেই, সেই সন্তানের মঙ্গল-কামনা করেন তিনি প্রতিদিন। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় অমঙ্গলকে বরণ করে আনছে সংসারে, তার জীবনে মঙ্গলের আবির্ভাব সম্ভব হবে কি করে ?

প্রতিমা ভাবলেন, পুত্রকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন এতদিন। এবার তিনি শক্ত হবেন। এখনও রাশ টেনে না ধরলে সমূহ বিপদ।

সরস্বতীর নিষ্পাপ কচি মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুক ভেঙ্গে যায়। তার কন্যা নেই। তাকে যখন 'মা' বলে ডাকে সরস্বতী, তখন তার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু ঐ কচি মেয়েটাও এখন বুঝে গেছে তার বঞ্চনার কথা। দুঃখ মানুষকে অভিজ্ঞ করে তোলে। এগার বার বছরের মেয়েটার মুখে আগের সেই সহজ সারল্য আর দেখতে পান না। তার চোখ ভুল দেখে না। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, মেয়েটা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ঘোষালদের বাড়ি তাদের নিমন্ত্রণ থাকে। তাছাড়াও উৎসব অনুষ্ঠানে ওবাড়িতে যখন তারা আমন্ত্রিত হন, তখন তিনি যেন স্বস্তি বোধ করেন না। দেবিকারানীকে দেখে তিনি বোঝেন, দেবিকারানী মনে মনে রুষ্ট। তিনি যেন মরমে মরে যান। নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার।

প্রতিমা দোতলায় উঠে ছেলের ঘরে প্রবেশ করেন। গোপালকৃষ্ণ শুয়ে ছিল। মাকে দেখে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল।

প্রতিমা যথাসম্ভব চাপা গলায় কথা বলতে চেষ্টা করেন। গলার স্বর চড়ান না।

—তুই এত অমানুষ হয়ে গিয়েছিস, গোপাল? পুজোর দিনগুলিও বাড়ি থাকতে পারলি না? কি চাস তুই? আমি তোর জন্য গলায় দড়ি দিই? কচি বউটার শুকনো মুখটা দেখেও কি তোর মায়া হয় না? বাড়িভর্তি লোকজন। সকলেই এক কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি আর কত চাপাচুপি দিয়ে রাখব?

গোপালকৃষ্ণ জবাব দিল না। তার মুখ কঠিন দেখাল। প্রতিমা মনে মনে অনুভব করলেন, গোপালকৃষ্ণ তাকে অগ্রাহ্য করছে, সে আর তাকে ভয় পাচ্ছেনা। প্রতিমার তিরস্কারে তার কিছুই এসে যাচ্ছেনা। বরং সে-ই যেন প্রতিমাকে তিরস্কার করতে উদ্যত।

আগে গোপালকৃষ্ণ লজ্জা পেত, আমতা আমতা করত। মাথা নীচু করে সত্যি মিথ্যে যাহোক জবাব দিত। এখন তার ভয় ভেঙ্গে গেছে। বিয়ের পর সে যেন বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

বন্যার তোড়ে যে জলস্রোত এগিয়ে আসছে, তা ভাসিয়ে নেবে তার সংসার, তার স্বামী-শ্বশুরের বংশ। তিনি তা রোধ করতে অক্ষম। প্রতিমা ভাবলেন, গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিজের মনোমত পাত্রীর বিয়ে দিলেই ভাল করতেন। শরিকী বিবাদের কথা মনে রেখে ভাল করেননি। গোপালকৃষ্ণকে তিনি শায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ তাকেই শায়েস্তা করল।

নরানাং মাতুলং ক্রমঃ। শ্বশুরবংশে কোন কলঙ্ক, কোন স্খলনের কথা তিনি শোনেননি। অর্থ অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার শ্বশুরকুলে তা অনর্থ ঘটায়নি পিতৃকুলের মত।

বাবার বেশ্যাসক্তি, স্ত্রীলোকে আসক্তির কথা তার অজ্ঞাত নয়। তার জন্য মূল্যও তাকে দিতে হয়েছে কম না। বেয়াই মশাই এক রকম তার বাবাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন—পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছেন। আমৃত্যু মা সেই অপমান, সেই জ্বালা সহ্য করেছেন।

তার দুই ভাইয়ের চরিত্রদোষ নেই। কিন্তু বাড়িতে অনেক বড় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে গেছে। বাবার বেশ্যাসক্তি তবু সহনীয়। কিন্তু তার বড় ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে তার ছোটভাইয়ের স্ত্রীর সম্পর্ক পরিবারে চরম লজ্জাজনক কেলেঙ্কারি।

গোপালকৃষ্ণের রক্তে বইছে তার মাতুলবংশের প্রবণতা। মাতুলালয়ের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি তার অজানা থাকার কথা নয়। প্রতিমা তার সামনে কোন্ ভাল দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন?

কিন্তু এখন তাকে সামাল দিতে হবে। পরিস্থিতি আরও যাতে ঘোরালো না

হয়ে ওঠে, তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রতিমা যেন মরীয়া হয়েই কঠিন তিরস্কারে বিদ্ধ করেন গোপালকৃষ্ণকে।

—শোন গোপাল, আমি অনেকদিন তোমার বেয়াদবি দেখেছি। আমার আর সহ্য হচ্ছেনা। তুমি যদি এখনও নিজেকে না শোধরাও, তাহলে আমি কিন্তু চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। যে কচি মেয়েটাকে আমি বউ করে নিয়ে এসেছি এ বাড়িতে, তার প্রতি অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকেই। আমি ঠিক করেছি, সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দেব।

এতটা আশা করেনি গোপালকৃষ্ণ। তার মুখ কালো হয়ে গেল। প্রতিমা কথাগুলি মন থেকে বলেননি। গোপালকৃষ্ণকে ভয় দেখাবার জন্যই বলেছিলেন সেগুলি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, গোপালকৃষ্ণের মুখ কালো হয়ে গেছে। একটু আগের কাঠিন্য মিলিয়ে গিয়েছে। পরিবর্তে ফুটে উঠেছে ত্রাসের ভাব।

প্রতিমা আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন। ভাবলেন, ওষুধে কাজ হয়েছে। অতঃপর গোপালকৃষ্ণ অবশ্যই নিজেকে শোধরাবে।

কিন্তু বাস্তবে ফল হোল অন্যরকম। গোপালকৃষ্ণের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সরস্বতীর ওপর। ঐ মেয়েটার জন্য সব কিছু অন্যরকম হতে চলেছে। তার স্নেহান্ধ মা আগে কোনদিন এত কটু ভাষায় তাকে তিরস্কার করেনি। মেয়েটা যাদু জানে। এই দু'তিন বছরের মধ্যে কেমন সকলকে বশ করে নিয়েছে। শুধু কি এ বাড়ি? মামার বাড়িতেও সকলে সরস্বতী বলতে অজ্ঞান। গোপালকৃষ্ণের প্রতি সকলেই যেন বিরক্ত।

গোপালকৃষ্ণ বুঝতে পারে, সকলের মায়া মমতা সহানুভূতি এখন ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়েটার প্রতি। সে নিজে ওকে স্ত্রী বলে স্বীকার না করলে কি হবে? অন্য সকলে ওকে মাথায় করে রেখেছে।

আজকাল বন্দনাও আগের মত ব্যবহার করে না। কথায় কথায় ঐ মেয়েটার কথা তুলে তাকে খোঁটা দেয়। বন্দনার মায়ের জন্যই একমাত্র উত্তপ্ত আবহাওয়া দুঃসহ হয়ে ওঠেনা।

মেয়েটা তার জীবন থেকে সব সুখশান্তি হরণ করে নিতে চাইছে। রাহুর মত তার আশা আকাঙ্খাকে গ্রাস করে নিতে চলেছে। রাগে ফুঁসতে লাগল গোপালকৃষ্ণ।

প্রতিমা যদি সেদিনের মত ঐ ব্যাপারটার ওখানেই যবনিকা টেনে দিতেন, তাহলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতনা। কিন্তু তিনি হিসাবে ভুল করলেন।

বউয়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল, এর সঙ্গে বন্দনার তুলনাই হয় না! সরস্বতীর গাত্রবর্ণ, মুখশ্রী ও শরীরের গঠন অনেক সুন্দর। বন্দনার চেহারা অতি সাধারণ। গায়ের রঙ একরকম কালোর দিকেই। তবে বয়সে সে সরস্বতীর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়। তার বয়স আঠারো উনিশের নীচে নয়

কোনমতেই। কিশোরী সরস্বতীকে বন্দনার যৌবনসম্পদের কাছে হার মানতে হয়েছে।

প্রতিমার ধারণা, ছেলে এখনও পর্যন্ত মুখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখেনি। দেখলে বুঝতে পারত, হীরে ফেলে কাঁচ কুড়োতে চাইছে সে। কিন্তু এখন হয়ত একটু নরম হবে ছেলে। ওর মনে ভয় ঢুকেছে। সরস্বতীকে দেখলে এখন বুঝবে, কত বড় ভুল করতে চলেছে ও।

এই সব চিন্তা করে সেদিন রাত্রিবেলায় সরস্বতীকে তিনি এক রকম জোর জবরদস্তি করেই পাঠিয়ে দিলেন ছেলের ঘরে। সরস্বতী কাকুতি মিনতি করেও প্রতিমার মন টলাতে পারল না। সব বুঝেও বাইরে অনমনীয় থাকলেন তিনি।

– শোন মা, গোপালের শরীরটা ভাল নেই। আজ তুমি ওর কাছে থাক। কখন কি দরকার হয়, বলা যায় না। আর আমি তো আছিই। দরকার পড়লে আমাকে ডাকবে।

যে নয় বছর বয়সের সরস্বতী বউ হয়ে এ সংসারে এসেছিল, তার সঙ্গে আজকের এগার বার বছর বয়সের সরস্বতীর অনেক অমিল। সময়ের হিসাবে দু'তিন বছর সময় খুব বেশি নয়। কিন্তু সরস্বতী তার অজ্ঞাতসারেই অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে।

সরস্বতী বুঝতে পারল, গোপালকৃষ্ণের শরীর খারাপের কথাটা ঠিক নয়। শাশুড়ী-মা তাকে ছুতো করে ছেলের কাছে পাঠাচ্ছেন।

গোপালকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনেই তার ভাল লাগেনি। গোপালকৃষ্ণ ও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। তার আচরণে তার প্রতি সরস্বতীর বিতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। গোপালকৃষ্ণ অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসে। প্রায়শই তাদের বাড়ি গিয়ে থাকে। সরস্বতী বোঝে, তার পক্ষে খুবই অপমানজনক সেটা।

তার শরীরে বইছে দিব্যনারায়ণের রক্ত। অহংকার, দম্ভ, আত্মসম্মানবোধ তার মজ্জায় মজ্জায়। সরস্বতীর ইচ্ছা করে, গোপালকৃষ্ণকে সে কষে দু' ঘা লাগায়। ফুলশয্যার রাতের সেই নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয় ভাল করে।

কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তা করা চলে না। শাশুড়ী-মা তো বটেই, তার নিজের মা-ও তাকে ক্ষমা করবে না। এই দু'তিন বছরে সকলের কাছে হিতোপদেশ ও নীতিকথা কম শোনেনি সে।

সরস্বতীর মন বিদ্রোহ করছিল। কিন্তু শাশুড়ী-মায়ের নির্দেশ অমান্য করে কি করে? গোপালকৃষ্ণের ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, নির্যাতনের আশংকায়, অপমানের আশংকায়, তার বুক ঢিপঢিপ করছে।

শাশুড়ীর নির্দেশে সে একাই গিয়ে উপস্থিত হোল গোপালকৃষ্ণের ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ ছিল। সরস্বতী ধাক্কা দিল। কেউ দরজা খুললনা। এবার অনেক জোরে ধাক্কা দিল সে। পাজামা ও গেঞ্জি গায়ে গোপালকৃষ্ণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলে দিল।

সরস্বতীকে দেখামাত্র তার ফর্সা গোলগাল মুখ ভয়াল ভীষণ হয়ে উঠল। মুখে চোখে বিশেষ বিরক্তি ফুটে উঠল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় সে প্রায় ধমক দিল সরস্বতীকে।

—হচ্ছেটা কি? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?

সরস্বতী গোপালকৃষ্ণের মুখের থেকে চোখ সরিয়ে নিল। মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিল।

—মা এখানে শুতে বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভ্যাঙচে ব্যঙ্গ করল গোপালকৃষ্ণ।

—মা এখানে শুতে বলেছেন! যাঃ ভাগ্! এখানে শোওয়া চলবে না।

সরস্বতী আত্মসংবরণ করতে পারলনা।

—তুমি আমায় তুই তোকারি করবেনা বলে দিচ্ছি।

—ওঃ—কোথাকার গুরুঠাকুর রে! তুই তোকারি করবে না! কেন এখানে এসেছিস? ফের যদি কোনদিন আমার ত্রিসীমানায় দেখি, তাহলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।

সারা দিন ধরে তার মনে যত রাগ, বিরক্তি আর হতাশা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা এভাবে ব্যক্ত করল গোপালকৃষ্ণ। মায়ের কাছে তিরস্কৃত হওয়ার অপমানের প্রতিশোধ নিল সরস্বতীর ওপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে।

সরস্বতী দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অপমানে, দুঃখে, তার চোখ ফেটে জল আসছিল, ঠোঁট কাঁপছিল। সবল হাতে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল গোপালকৃষ্ণ। মাটিতে পড়ে গেল সরস্বতী। মুখের সামনে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল গোপালকৃষ্ণ।

একটু পরে উঠে দাঁড়াল সরস্বতী। তার মাথায় ও হাঁটুতে চোট লেগেছিল। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল তার কোমরে, পায়ে, হাঁটুতে। শারীরিক যন্ত্রণায় যতটা না, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমানে, লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে সে জোরে কেঁদে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রথম দিনের মত শাশুড়ীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। শাশুড়ী ঘুমোননি। সরস্বতীকে দেখামাত্র সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে।

বৌকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করলেন। আলো জ্বেলে ভাল করে তার মাথা, মুখ ও হাত পা লক্ষ্য করলেন। পরিষ্কার কাপড়ে মুখ হাত মুছিয়ে দিয়ে মলম লাগিয়ে দিলেন পরম মমতায়। তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন হাউমাউ করে।

—আমার কপাল, মা! নয় তো এমন হবে কেন?

অপ্রয়োজন বোধে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না সরস্বতী। শাশুড়ীর পাশে শুয়ে নিজের অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে স্থির করল, এ বাড়ি সে আর থাকবে না। তার বড় পিসীর মেয়ে কাছেই থাকে। যেভাবে হোক, তাকে জানাবে সব

কিছু। সে নিঃসন্দেহ, সব কিছু শুনলে তার বাড়ির লোকে আর কোনদিন এখানে পাঠাবেনা। নিজের বাড়িতে সম্মান নিয়ে থাকবে সে। গোপালকৃষ্ণের বিশ্রী কদর্য মুখ আর তাকে দেখতে হবে না। ঐ বাজে লোকটার কাছে আর তাকে এভাবে হেনস্তা হতে হবে না।

আসন্ন মুক্তির কথা চিন্তা করে নিজের শারীরিক যন্ত্রণা, দুঃখ, হতাশা ও অপমান ভুলে গেল সরস্বতী। তার চেতনা জুড়ে উৎসবের বাজনা বাজতে লাগল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে নিশ্চিন্ত হয়ে, দুর্ভাবনামুক্ত হয়ে।

।। সাত ।।

সরস্বতী ভাবেনি, তার মনোবাঞ্ছা এত তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। ঐ ঘটনার দু'দিন পরে তার দিদি দেখা করতে এল তার সঙ্গে। দিদিকে দেখে সরস্বতীর মনে হোল, জগদ্ধাত্রী সত্যিই জাগ্রত দেবতা। গত দু'দিন ধরে সে ক্রমাগত জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যে, তার যেন শিগ্‌গিরই দিদির সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর তার প্রার্থনা পূরণ করেছেন।

এই দু'তিন বছরে সরস্বতী কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেনি। শাশুড়ীর কাছে তার মনোভাব সে ব্যক্ত করলনা। প্রতিমা আদৌ কিছু সন্দেহ করলেন না। দিদির সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে সুবিধামত আসল কথাটি ফাঁস করে দিল সরস্বতী।

—দিদি, আমি আর এ বাড়ি থাকব না। আমাকে মেরেছে ও।

তার দিদি অবাক হয়ে যায়। একসঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে।

—সে কি রে? তোর শাশুড়ী কিছু বলল না? তা, তোকে মারল কেন? কি করেছিলি তুই? খুব মেরেছে? না, চড় চাপড় দিয়েছে?

সরস্বতী সব কিছু খুলে বলে। কাহিনীর মধ্যে যেখানে যেখানে ফাঁক ছিল, সেখানে সেখানে প্রশ্ন করে সেই ফাঁক বুজিয়ে নেয় তার দিদি। গোপালকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পুরোপুরি জানা হয়ে গেল। ফুলশয্যায় রাতের ঘটনাও কথাপ্রসঙ্গে এসে পড়ল। সব শুনে তার দিদি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—মেজমামার কত আদরের মেয়ে তুই! ছয় ভাইয়ের এক বোন। এরকম একটা যাচ্ছেতাই বিয়ে দিল তোর? বন্ধুত্বের খাতিরে মেয়ের এমন সর্বনাশ করে কেউ? বয়সের এত তফাৎ, লেখাপড়ায় গুণধর, চার চারবার ম্যাট্রিক ফেল! থাকার মধ্যে আছে টাকা পয়সা সম্পত্তি। স্বভাবচরিত্রও তো বুঝছি যাচ্ছেতাই। বিনা দোষে বাচ্চা মেয়েকে কেউ এভাবে মারে? কোন দিন দেখছি, খুন হয়ে যাবি তুই।

প্রশ্রয় পেয়ে রীতিমত উৎসাহিত বোধ করে সরস্বতী। আসল কথাটা পাড়তে আর দেরি করেনা।

—বাবা দাদাদের বলে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো, দিদি। নয়ত আমি ঠিক মরে যাব।

তার দিদিকে চিন্তিত দেখায়।

—কিন্তু, তোর শাশুড়ী কি তোকে ছাড়বে ?

সরস্বতী দমে না। দিদিকে বুদ্ধি জোগায়।

—এখন কিছু বলোনা তুমি। বাবা দাদাদের বলো, একেবারে এসে যেন নিয়ে যায় আমায়।

সরস্বতীর শাশুড়ীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলল তার দিদি। সরস্বতীও কিছু বলল না। শাশুড়ী কোন সন্দেহ করলেন না। সেই দিনটা বাদ দিয়ে পরের দিনই তার দিদি এসে উপস্থিত হোল মামাবাড়ি।

সব শুনে দিব্যনারায়ণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সরস্বতীর দাদারাও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—এত সাহস ? আমাদের বাড়ির মেয়ের গায়ে হাত তোলে ?

সরস্বতীর নির্দেশমতো তার পিসতুতো দিদি খবরটা পেঁাছে দিয়েছিল মামা ও মামাতো ভাইদের কানে। সরস্বতীর মনে ভয় ছিল, তার মায়ের কাছে প্রথমে খবরটা দিলে তাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে।

সরস্বতী বয়সে কিশোরী। তার অভিজ্ঞতার পুঁজি সামান্য। তবু তার মনে হয়েছিল, সব কিছু সত্ত্বেও, তার মা আপনের কথা বলবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বরাবরের মত তাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত কখনই সমর্থন করবে না।

সব শুনে দুঃখিত হলেন দেবিকারানী। মেয়ের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে দায়ী করলেন। কিন্তু স্বামী বা পুত্রদের মত দাউদাউ করে জ্বলে উঠলেন না। মেয়েকে চিরতরে বাপের বাড়ি নিয়ে আসার প্রস্তাব তার মনঃপূত হোল না।

তিনি বোঝাতে চাইলেন স্বামীকে। তার সঙ্গে ছেলেদেরকেও। কেউ তার কথায় কান দিল না।

দিব্যনারায়ণ মারমুখী হয়ে উঠলেন।

—তুমি চুপ করো। তোমার কথা শুনেই আজ এই অবস্থা। কথায় বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। আমার মেয়েটার জীবন নষ্ট করেছ তুমি। তোমার কথামত চলে ওর আরও সর্বনাশ ঘটাব ? ওকে আমি নিয়ে আসব। আর পাঠাবনা ও বাড়ি। ফল যা হবার, হবে। ভাল করে লেখাপড়া শেখাব আমি মেয়েকে। ওর যে ক্ষতি আমরা করেছি, তা পুষিয়ে দিতে হবে আমাদেরই।

দেবিকারানী বুঝলেন, প্রতিবাদ নিষ্ফল। শুধু স্বামীকে অনুরোধ করলেন, সরস্বতীর শ্বশুরালয়ে যেন হিরন্ময়কে পাঠানো হয়। তার রগচটা অন্য ছেলেরা সেখানে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। স্ত্রীর এই অনুরোধ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন দিব্যনারায়ণ। পরের দিন হিরন্ময় রওনা হোল সরস্বতীর শ্বশুরবাড়ি।

হিরন্ময় সঙ্গে করে নিয়ে গেল তার সর্বকনিষ্ঠ নয় বছরের ভাইকে। দেবিকারানী তাকে বারবার মিনতি করেছিলেন, সে যেন আসল কথা ফাঁস না করে। হিরন্ময় তার অন্যথা করে নি।

কিন্তু প্রতিমা কিভাবে যেন আসল কারণটা অনুমান করতে পারলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। অনেক ওজর ওজুহাত খাড়া করলেন। বললেন, পরে সুযোগসুবিধামত সরস্বতীকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন।

হিরন্ময় তখন একটু শক্ত হয়েই দিব্যনারায়ণের নাম করে বলল যে, তিনি সরস্বতীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন। তাকে না নিয়ে গেলে অত্যন্ত রুষ্ট হবেন।

প্রতিমা দ্বিরুক্তি করতে পারলেন না। দিব্যনারায়ণকে খুড়োমশায় বলে ডাকেন। এখনও বেয়াই মশাই বলে সম্বোধন করতে সংকোচ বোধ করেন। তার কথা অমান্য করেন কি করে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সরস্বতীকে পিত্রালয়ে যেতে দিতে হোল।

যাবার পূর্বে সরস্বতী যখন তাকে প্রণাম করল, তখন তিনি গম্ভীরভাবে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। পরে ততোধিক গম্ভীরভাবে সরস্বতীর গলার দশভরি ওজনের মবচেনটি খুলে নিলেন।

সরস্বতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। শাশুড়ীর এই আচরণ তার অপ্রত্যাশিত। হিরন্ময় সরস্বতীকে বলেছিল, তার কিছু গয়না সঙ্গে নিতে। সরস্বতী বুঝল, শাশুড়ী তাকে গয়নাগাঁটি নিয়ে যেতে দেবেন না।

তবু দাদার আদেশ পালনের জন্য ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীকে সেকথা জানাল।

—মা, আমার কয়েকটা গয়না নিয়ে যাব। ওখানে পড়ব। তুমি সিন্দুক খুলে বার করে দেবে?

প্রতিমা তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেন।

—কেন, গয়নাগাঁটি নিয়ে যাবার কি হয়েছে? ক'দিন পরেই তো চলে আসছ। গয়না পরার ইচ্ছে হলে বাপের বাড়িতে কি আর তা পাবে না? বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। তুমি চাইলে একটা কেন, দশটা গয়না এখনই গড়িয়ে দেবেন তোমার বাবা। তোমার মায়ের কাছেই কি আর গয়নাগাঁটি পাবে না?

ভয়ে আর কথা বাড়ালনা সরস্বতী। শাশুড়ীর এমন অগ্নিশর্মা, রুষ্ট মূর্তি সে এর আগে আর কখনই দেখে নি। এমন কটু কথাও সে এর আগে শোনেনি শাশুড়ীর কাছে।

সরস্বতী বুঝল, তার শাশুড়ী-মা রেগে গিয়েছেন, তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এমন ব্যবহার সে কোনদিন পায়নি। তার চোখে জল এসে গেল। অন্যবার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন শাশুড়ী-মা। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছেন, চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়েছেন।

বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দ একটু যেন ফিকে হয়ে গেল তার কাছে। দিব্য-নারায়ণের নির্দেশ ছিল, সরস্বতী যেন সব গয়নাপত্র ও শাড়িজামা সঙ্গে নিয়ে আসে। সরস্বতীর কাছে সব কিছু শুনে হিরন্ময় বাপের নির্দেশ পালনে অপারগ হোল। তার ভয় হোল, গয়নাপত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তার ফল ভাল হবে না। সরস্বতীকে হয়ত আসতেই দিতে চাইবেনা তার শাশুড়ী।

অতএব পার্থিব ঐশ্বর্যের মায়া ত্যাগ করে একরকম একবস্ত্রে সরস্বতী ফিরে এলো পিত্রালয়ে। পুনর্মূষিকো ভব হয়ে।

যথাসময়ে বিমলচন্দ্রের কানে সব খবর পেঁছিল। দিব্যনারায়ণ ভেবেছিলেন, বিমলচন্দ্র ক্রুদ্ধ হবেন, পীড়াপীড়ি করবেন তাকে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর জন্য। তার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হোল। বিমলচন্দ্র তিরস্কার করলেন না, কোন অনুযোগও জানালেন না। দিব্যনারায়ণের কাছে হাত জোড় করে মাপ চাইলেন তিনি।

—আমায় মাপ কর, রাখাল। বিশ্বাস করো, আমি সব খবর জানতাম না। আমার নাতিটা যে এত অমানুষ, তা জানা ছিল না। যার সঙ্গে সম্পর্ক, সে-ই যদি সম্পর্ক স্বীকার না করে, তাহলে কিসের জন্য পড়ে পড়ে মার খাবে তোমার মেয়ে? তুমি যা করেছ, ঠিক করেছ। আমাকে একদিন তুমি চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। আমাকে নবজীবন এনে দিয়েছিলে। আমি চেয়েছিলাম, তোমার সেই ঋণ কিছুটা শোধ করব। কিন্তু তার বদলে, তোমার আমি একি ক্ষতি করে বসলাম?

দিব্যনারায়ণের স্বভাবে ভণ্ডামী নেই। কপট ভদ্রতা তার আসেনা। তিনি নির্বাক থেকে শুনে গেলেন। কোন প্রতিবাদ করলেন না।

অতঃপর দুই তিন বছরের বিবাহিত জীবনের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলল সরস্বতী। দেবিকারানীর সংস্কারে সেটা বাঁধছিল। কিন্তু স্বামী পুত্রদের প্রবল বিরোধিতার মুখে তার সেই আপত্তি টিকলনা।

দিব্যনারায়ণ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন তার সংকল্প।

—সরস্বতী লেখাপড়া করবে। মানুষ হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। ওর জন্য সংস্থান রেখে যাব। ভাইদের গলগ্রহ হয়ে যাতে না থাকতে হয়। আজ থেকে ও নিজেকে মনে করবে কুমারী।

দেবিকারানী ক্ষীণ আপত্তি তুললেন।

—লেখাপড়া শিখুক। ভাল কথা। কিন্তু ওর যে বিয়ে হয়েছে, সেটা কি আমরা জোর করে অস্বীকার করতে পারি?

দিব্যনারায়ণ চটে উঠলেন।

—বিয়ে? ওকে বিয়ে বলে? তোমার জেদে ওকে নিয়ে বিয়ের নামে একটা পুতুলখেলা হয়েছে। সেই অশুভ ঘটনার স্মৃতি ওর মন থেকে যত তাড়াতাড়ি মুছে যায়, ততই মঙ্গল।

দেবিকারানী আবার বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—কিন্তু, তুমি কি আবার ওর বিয়ে দিতে পারবে?

দিব্যনারায়ণ হার স্বীকার করবার পাত্রই নন।

—কেন পারবনা? তাতে দোষটা কি? তবে আমি ওর বিয়ের কথা এখনই ভাবছিনা। ছোট মেয়ে। লেখাপড়া শিখুক। পরে যদি বিয়ে করতে চায়,

উপযুক্ত পাত্রের হাতে আমি ওকে সমর্পণ করব।

দেবিকারানীর বিস্ময় যেন শেষ হতে চায় না। তার রক্ষণশীল স্বামীর মুখে এসব কি শুনছেন? এই সংসারে বধূ হয়ে এসে তাকে কেবলি ছাড়তে হয়েছে। তার পিতৃকুলের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ, সব নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন রূপে গড়ে নিতে হয়েছে। দিব্যনারায়ণ তাকে কেবলি বাধ্য করেছেন, তার ছায়া অনুসরণ করে চলতে।

তার পিতৃকুলের গৃহদেবতা ছিলেন রাধাকৃষ্ণ। বিয়ের পর ঘোর শাক্ত পরিবারে এসে পাঁঠাবলি দেখে তার শরীর শিউরে উঠত। রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। স্বামীকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন নিষ্ঠুর পাঁঠাবলি প্রথা বন্ধ করে দিতে। স্বামী উপহাস করেছিলেন। দুর্বলতা জয় করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম হওয়া উচিত।'

যেকোন উপলক্ষে যখনই তাদের মধ্যে সংঘাতের সূচনা দেখা দিয়েছে, তখনই দিব্যনারায়ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন হিন্দু স্ত্রীর কর্তব্য। কতবার যে দিব্যনারায়ণ তাকে বলেছেন, "ন স্বাতন্ত্র্যম অর্হতি স্ত্রীয়াঃ"। স্ত্রীলোকের আবার আত্মস্বাতন্ত্র্য কি? স্ত্রীলোক পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন। তার ভালমন্দের দায়দায়িত্ব রয়েছে তাদের ওপর। সে তার অল্পবুদ্ধি নিয়ে কতটুকু বোঝে? তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা শুধু অপরের জীবনে নয়, তার নিজের জীবনেও ডেকে আনে ঘোর সর্বনাশ।

কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা বুঝি সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দিব্যনারায়ণ এখন হিন্দু বিবাহের পবিত্র বন্ধন স্বীকার করবেন না। সরস্বতীকে সুখে দুঃখে স্বামীর ছায়ানুসারিণী হতে বলবেন না। তাকে এখন উপদেশ দেবেন, সে যেন অপদার্থ স্বামীকে অস্বীকার করে, তার স্মৃতি মুছে ফেলে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

মনে মনে হাসলেন দেবিকারানী। তিনি জানেন, দিব্যনারায়ণ অসৎ নন। যা কিছু তিনি করেন, যা কিছু তিনি বলেন, তা নিজের বিশ্বাসের জোরেই করেন বা বলেন। কিন্তু তিনি অন্ধ। তার অন্ধত্ব কেউ ঘুচাতে পারবে না।

সরস্বতী আর দশটা বাড়ির মেয়ের মত লেখাপড়া করতে লাগল। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হোল। পিতৃপদবী বহাল রইল তার। বাল্যবিবাহের স্মৃতি তার জীবনে এক দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল।

সান্যালদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হোল না। পুজোপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানে দুই বাড়ির লোকেরা আগের মত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতেন। তবে সরস্বতীর স্বামী ও শাশুড়ী উপস্থিত থাকতেন না। মাতুলালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য দিব্যনারায়ণ তাদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। সরস্বতীর স্বামী কিংবা শাশুড়ী হিসাবে নয়—বিমলচন্দ্র সান্যালের কন্যা ও দৌহিত্র হিসাবেই তারা নিমন্ত্রিত হতেন।

দেবিকারানী চমৎকৃত হতেন। দেখতেন, দিব্যনারায়ণের কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। তিনি যেন স্বীকারই করেন না যে, সরস্বতীর বিয়ে হয়েছে।

সরস্বতীরও তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। সেও যেন সব কিছু পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তবু তাকে দেখে খারাপ লাগে দেবিকারানীর। দিব্যনারায়ণ যা-ই বলুন, তার ছেলেরা যা-ই বলুক, পুনর্বিবাহের কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। পাড়াপ্রতিবেশী আছে, আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের রসনা উদগ্র হয়ে উঠবে না? আরও আছে তার দুই জা, ননদ, তাদের ছেলেমেয়েরা।

তারা এখন পৃথগন্ন ঠিকই। তাদের অস্তিত্ব তাবলে অস্বীকার করা যায়না। বড় জায়ের ক্ষুরধার জিহ্বাকে বড় ভয় তার। দুই জায়ের সঙ্গে কোনদিনই সখ্য গড়ে ওঠেনি। এখন তো তারা অন্য শিবিরের বললেই চলে। সরস্বতীর পুনর্বিবাহ দিলে তারা কি চুপ করে থাকবে?

সবচেয়ে বড় কথা, তার নিজের মনই যেন সাড়া দেয় না। সরস্বতীকে চেয়ে চেয়ে দেখেন আর দুঃখে যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দিব্যনারায়ণের মত নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কই?

আপাতদৃষ্টিতে সব ঠিকমতো চলছে। আর পাঁচটা সংসারের মতই সব কিছু চলছে। ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ, দুই নাতনী নিয়ে ভরা সংসার তার। দাসদাসী ঠাকুরচাকর রয়েছে। মামলা মোকদ্দমায় অনেক গেছে। তবু এখনও যা আছে, তা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

দেবিকারানী তবু স্বস্তি পাননা। সংসারের একেকটা দুর্যোগ তার কাছে অদৃষ্টের মার বলে প্রতিভাত হয়। এ বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যেই ঠারে ঠোরে অনেক কিছু শুনেছিলেন। শোনাবার লোকের অভাব ছিল না।

শাশুড়ী জীবিত থাকতে বাড়িতে আত্মীয়কুটুম্বের ভিড় লেগেই থাকত। অনেক কথা কানে এসেছে তখন। তিনি শুনেছেন, অনেক অন্যায় অবিচার ও ব্যভিচারের ইতিহাস রয়েছে এই পরিবারের। তার মনে হোত, মাশুল গুণতে হবে তার জন্য। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু দুর্বহ শাস্তি বলে মনে হয়েছিল। সরস্বতীর বিবাহবিপাকও দুঃসহ মার বলে মনে হোল।

হিরন্ময়ের বৌয়ের সঙ্গেও বনিবনা হোল না। হিরন্ময়ের বৌ এই সংসারের লোকগুলিকে আপনজন বলে ভাবতে পারলনা। দেবিকারানীও তাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারলেন না।

হিরন্ময় খুবই ব্যস্ত থাকে। ডিসপেন্সারিতেই বেশির ভাগ সময় কেটে যায় তার। ডাক্তারি তার শুধু পেশাই নয়, নেশাও বটে। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে, শান্তি পায়না ছেলেটা। তার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে আদরের ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি। অষ্টপ্রহর বিবাদ লেগেই আছে। বন্ধ দরজা ভেদ করেও স্ত্রীর সঙ্গে তার বচসার আওয়াজ কানে আসে দেবিকারানীর।

হিরন্ময়ের স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে আলাদা সংসার পাততে চায়। হিরন্ময় রাজী

হয় না। হিরন্ময় শুধু মাতৃভক্ত নয়—ভাইবোনেদের প্রতিও তার অপার ভালবাসা। হিরন্ময়ের বৌ তা সহ্য করতে পারেনা। সৎমা, সৎ ভাইবোনেদের প্রতি তার অতিরিক্ত মমতা দেখে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। হিরন্ময় উত্তপ্ত হয়।

দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি অনেক সময়ে এমন পর্যায়ে পেঁছয় যে, বুক ঢিপঢিপ করে দেবিকারানীর। তার মনে হয়, হিরন্ময়কে তিনি বলেন, সে আলাদা সংসার করুক। নিত্য অশান্তির চেয়ে তা শতগুণে ভাল। কিন্তু তিনি ভাল করেই বোঝেন, ছেলে তা শুনবে না।

এই সংসারে তার যেমন আপনজন বলতে আছে হিরন্ময়, হিরন্ময়েরও তেমন আপনজন বলতে আছেন তিনি। হিরন্ময়ের মেয়ে দুটি খুবই ছোট। তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বৌয়ের সঙ্গে প্রথম থেকে সদ্ভাব নেই। ছেলেটার জন্য কষ্ট হয়। প্রতিকারের উপায় ভেবে পাননা।

দিব্যনারায়ণের সঙ্গে দেবিকারানীর দ্বিতীয়বার সংঘাত উপস্থিত হোল দ্বিতীয় ছেলের বিয়েকে কেন্দ্র করে। দেবিকারানী সুজয়ের জন্য মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিলেন। তার মেজ নন্দাইয়ের কাছে সম্বন্ধটি পান তিনি। বাড়ির অবস্থা অতি সাধারণ। কিন্তু মেয়ের রূপের যেন তুলনা নেই। যেমন গাত্রবর্ণ, তেমনই মুখচোখের শ্রী। স্বভাবও শুনলেন ভাল। মেয়েটিকে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেবিকারানীরও মনে হোল, লক্ষ্মী আসছে ঘরে।

বড় ছেলের বিয়েতে দিব্যনারায়ণ তার কথা শোনেননি। এই ছেলের জন্য তিনি তার মনোমত মেয়েকে ঘরে আনবেন। কিন্তু দিব্যনারায়ণ বেঁকে বসলেন। ছেলের জন্য ওরকম দীনদরিদ্র পরিবার থেকে মেয়ে আনবেন না। ওদের আছে কি? এরকম অসম পরিবারে বিয়ের ফল ভাল হয় না। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। তাদের পরিবারে বৌ হয়ে আসবে যে মেয়ে, তার কতগুলি ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা চাই।

দেবিকারানী অনেক বোঝালেন। বললেন, নন্দাইকে দিয়ে মেয়ের বাবাকে এক রকম কথা দিয়ে রেখেছেন তিনি। এখন আশীর্বাদের দিন, বিয়ের দিন ঠিক করা কেবল বাকি। এতদূর এগিয়ে এ বিয়ে বন্ধ হলে দেবিকারানীর মান থাকবে না, ঘোষাল বাড়ির মান থাকবে না।

দিব্যনারায়ণ কর্ণপাত করলেন না। তার সেই এক কথা। এরকম অসম বিয়ে তিনি মঞ্জুর করবেন না। তাকে না জানিয়ে কথা দিলেন কেন দেবিকারানী? সংসারের কর্তা দিব্যনারায়ণ। দেবিকারাণীকে তার অবিমৃষ্যকারিতার খেসারত দিতে হবে। মোদ্দা কথা, দিব্যনারায়ণের অমতে ঐ মেয়েকে সুজয়ের বৌ করে আনা চলবেনা।

দেবিকারানীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মেজ নন্দাই রমেশের মাথায়। মেয়ের বাবা রমেশের বন্ধুস্থানীয়। সম্বন্ধ ঠিক করে বন্ধুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করছিলেন তিনি।

তিনি দেখলেন, সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলে বেইজ্জত হতে হবে তাকে।

দেবিকারানী মনস্থির করলেন। নন্দাইকে বললেন, তার চিন্তার কারণ নেই। তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন ঐ মেয়েকেই বৌ করে ঘরে আনবেন। তবে দিব্যনারায়ণের আপত্তি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সুজয়ের জন্য ঐ মেয়েকে মনোনীত করার সাধ্য তার নেই। তার হাত পা বাঁধা সে ব্যাপারে। তিনি সেজ ছেলে অজয়ের বৌ করে নিয়ে আসবেন শিপ্রাকে।

দেবিকারানী তার জেদ বজায় রাখলেন। শিপ্রার সঙ্গে অজয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে পর দিব্যনারায়ণকে জানানো হোল। এবারও আপত্তি জানালেন দিব্যনারায়ণ আগের যুক্তি দেখিয়ে। দেবিকারানী দৃঢ়ভাবে বললেন, তিনি নিরুপায়। পরপর দু'বার যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হয় দিব্যনারায়ণের জন্য, তাহলে মেয়ের বাপের অভিশাপ লাগবে সংসারে। তা তিনি হতে দেবেন না।

মেয়েকে আশীর্বাদের জন্য বালা গড়িয়ে রেখেছিলেন আগেই। নির্দিষ্ট দিনে সেটি দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করলেন দিব্যনারায়ণ স্বয়ং। দেবিকারানী তাকে বাধ্য করলেন সে ব্যাপারে। দিব্যনারায়ণ রাজী না হলে তিনি সংসার ছেড়ে চলে যাবেন এই চরমপত্র দিয়ে নিজের জিদ বজায় রাখলেন দেবিকারানী।

দুই ছেলের বিয়ের জন্য ধার্য হোল একই দিন। সুজয়ের বৌ ধনী বাপের একমাত্র কন্যা। বড়সড় চেহারা, মুখশ্রী মন্দ না। তবে গায়ের রঙ একরকম কালোর দিকেই। বড় জোর তাকে সুশ্রী বলা চলে। পরমা রূপসী শিপ্রার সঙ্গে সৌন্দর্যের বিচারে তার স্থান অনেক নীচে।

আপাদমস্তক গয়নায় মোড়া সেই বউয়ের পাশে নিরাভরণা অন্য বউকে পাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, সেই আশঙ্কায় দেবিকারানী পারিবারিক বৃদ্ধ স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠান। সুজয়ের বৌ আভার গয়নার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শিপ্রার জন্য গয়না বানানোর ফরমাশ দেন তাকে। বলাবাহুল্য, তার নিজের গয়না ভেঙ্গে সেগুলি তৈরির নির্দেশ দেন।

তার পছন্দ করা মেয়েকে যাতে বেইজ্জত হতে না হয়, তার জন্য নিজের প্রচুর গয়নাগাঁটির অনেকগুলিই দিয়ে দিলেন সেজ বৌকে। আভার বাড়ি থেকে যৌতুক হিসাবে পাওয়া গয়নার তালিকা পেয়েছিলেন বলেই সেই কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হোল তার পক্ষে।

বৌভাতের দিন পাশাপাশি বসা দুই বৌয়ের গা ভর্তি একই গয়না দেখে নিমন্ত্রিতরা অবাক হয়ে গেল। আসল কথা ফাঁস করলেন না দেবিকারানী। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ কায়দায় সকলকে বললেন, তিনি চেয়েছেন, দুই বউয়ের যেন একই রকমের গয়না হয়। ভেতরের রহস্য উদ্ধার করা বাইরের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ভাবল, দুই বৌয়ের বাড়ি থেকেই দাবিমতো একই রকমের গয়না দেওয়া হয়েছে।

সংসারে নিজের দাবিকে এমন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে দেবিকারানী

আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন। তুলাদণ্ডে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে ওজন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেবিকারানী বুঝলেন, তিনি যথার্থ নির্বাচন করেছেন। স্বভাবে সত্যিই তুলনা হয় না শিপ্রার। অত্যন্ত সুশীলা, লক্ষ্মীমন্ত সে। যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি। শান্ত, বাধ্য, স্নেহপ্রবণ। সুজয়ের বৌয়ের সঙ্গে তার পার্থক্য ধরা পড়ল সকলের চোখেই।

দেবিকারানী চেয়েছিলেন, যে শান্তি তিনি নিজে এ সংসারে এসে পাননি, সেই শান্তি পাবে তার ছেলের বৌয়েরা। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ। বোনের মত মিলেমিশে থাকবে তারা।

এই পরিবারে অর্থকষ্ট নেই। একটু মিলেমিশে থাকতে পারলেই শান্তি আনা যায় সংসারে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা বাস্তবায়িত হয় না। হিরন্ময়ের বৌ তাদের নিজের লোক বলে মনে করেনি। প্রথম থেকেই ব্যবধান তৈরি করে সংসারে থেকেছে। স্বামীর কথায় কর্ণপাত করেনি। মনগড়া কারণে অশান্তি খুঁজে পেয়েছে। দেবিকারানী জোর জবরদস্তি করে সম্পর্ক তৈরি করতে চাননি। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন।

দুঃখের কথা, সুজয়ের বৌও তার মনোমত হোল না। কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বভাবের অনেক দিক প্রকট হয়ে পড়ল। ধনী পরিবারের মেয়ের লোভ, নীচতা, স্বার্থপরতা আর ঈর্ষাপরায়ণতা দেখে বিস্মিত হলেন দেবিকারানী।

হিরন্ময়ের বৌ বেশিদিন একান্নবর্তী সংসারে থাকবে বলে আশা করেন না তিনি। হিরন্ময় জোর করে এখনও যা ঠেকিয়ে রাখছে, পরে আর তা পারবে না। কত যুঝবে তার ঐ ভালোমানুষ ছেলে? আজ হোক, কাল হোক, হাঁড়ি হেসেল আলাদা হবে। তিনি বা দিব্যনারায়ণের অবর্তমানে হিরন্ময় তার জেদ বজায় রাখতে পারবেনা। সুজয়ের বৌকেই তখন কর্ণধার হতে হবে।

কিন্তু ধনী পরিবার থেকে এ কেমন মেয়েকে তার প্রিয় পুত্রের বউ করে নিয়ে এলেন দিব্যনারায়ণ? উদারতার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। বসনে, ভূষণে, আহারে অত্যন্ত ভোগী। নিজেরটা আর নিজের স্বামীরটা নিয়েই যার মাথাব্যথা। শ্বশুর শাশুড়ী, দেওর ননদ, জা, তাদের ছেলেমেয়ে কিংবা দাসদাসী কারুর দিকেই নজর নেই।

হিরন্ময়ের বৌ দীপার সঙ্গে তার বচসা হয় ঠিকই। দুজনের মতে মেলে না। কিন্তু সে এগিয়ে আসে কাজ করতে। স্বামী বা মেয়েদের খাওয়া নিয়ে দৃষ্টিকটু বাড়াবাড়ি নেই তার। আভার মত লোভ ও নীচতা নেই তার মধ্যে। আভার মত ঠাকুরের কাছ থেকে নিজেদের জন্য ভালটা চেয়ে নিয়ে ওপরে রেখে দিতে দেখেন নি। শাড়ী বা অলঙ্কারের প্রতিও তার লোভ নেই।

দেবিকারানী বোঝেন, তার মাথার মধ্যে 'সৎ শাশুড়ী', 'সৎ দেওর', 'সৎ ননদ' এই কথাগুলি কেবলি পোকার মত কুটকুট করে, কামড় দেয়। দেবিকারানীর

কর্তৃত্ব, নির্দেশ, ও উপদেশ তার কাছে তাই অসহ্য বোধ হয়। রাগে দুর্বিনীত আচরণ করে। এসব তিনি বুঝতে পারলেন সুজয়ের বৌ ঘরে আসার পর।

দেবিকারানী ভাবেন, তিনি কোনদিন সংসারাসক্ত ছিলেন না। ঘাড়ে ধরে হরিভক্তি করানো হয়েছে তাকে দিয়ে। তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সংসার। তার বড় জাটি ছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত। কতরকম তুকতাক করেছেন। বাড়ির দাসীদের চোখে কিছু এড়ায়না। তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বড় জা সুভাষিনীর অনেক ক্রিয়াকলাপের কথা তাকে জানিয়েছে, তাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

দেবিকারানী শুনেছেন, তার বড় জা তাদের প্রাণে মেরে ফেলতে চান। সম্পত্তির বড় অংশ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য নিরঙ্কুশ রাখতে চান। তবু তিনি কোনদিন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি।

ছোট জায়ের কানেও বিষমন্ত্র তুলে দিয়েছেন বড় জা। দুজনে কেন যে তার প্রতি এত ঈর্ষাপরায়ণ, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেন না দেবিকারানী। যতদিন একান্নবর্তী সংসার ছিল, ততদিন ভাশুর বা দেওরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের পার্থক্য করেননি। বরং আপন সন্তানদেরই অনেক সময় বঞ্চিত করেছেন। ছোট ছেলে নিলয় অনেক সময়েই তা নিয়ে শোর তুলত। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

দেবিকারানীর আফশোস, কেউই সুখে নেই। শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য বড় জায়ের দুপুরের খাওয়া কোনদিনই বেলা তিনটে চারটের আগে হয়ে ওঠে না। তার ফলও ভুগতে হচ্ছে কম না। অসুখ লেগেই আছে।

ছোট জায়ের এর মধ্যেই উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে চিৎকার করতে করতে করতে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। দিব্যনারায়ণ হোমিওপ্যাথী ওষুধ দেন। তখন শান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

এক বিচিত্র পরিবারের অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে দেবিকারানী ঢুকে পড়েছেন। তিনি কেবলি তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। বাইরের আলোহাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারছেন না।

তার আগের জীবনে যা হবার, হয়েছে। তিনি পুত্রকন্যার জীবনে অশান্তি আসতে দেবেন না। তবু সব কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভবিতব্যকে রুখবেন, এমন সাধ্য কই তার?

সেজ বৌটি এমনিতে নরম, শান্ত, ভালমানুষ স্বভাবের। কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বড় অভাব। তার বুদ্ধি অপরিণত। যে আধারে তাকে রাখা যাবে, সেই আধারের বর্ণ আর আকৃতি সে গ্রহণ করবে। এরকম মানুষ খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়। যেকেউ ইচ্ছামত পরিচালিত করতে পারে তাকে।

আভার সঙ্গে শিপ্রার ঘনিষ্ঠতা তার ভালো লাগেনা। তিনি চান না, শিপ্রা

আভার দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেবিকারানী সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন।

তিনি বোঝেন, আভার স্বভাব সহজে পরিবর্তিত হবার নয়। শিপ্রাকে তাই তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেন—উদ্দেশ্য শিপ্রার সঙ্গে সঙ্গে আভারও কোন কোন ব্যাপারে দৃষ্টি খুলে দেওয়া।

এক পৌষ সংক্রান্তির দিন অনেক রকমের পিঠে তৈরি করলেন দেবিকারানী। সারা দিন বসে বসে পিঠে তৈরির পরিশ্রম বড় কম হয় নি। দেবিকারানীর পিঠ, কোমর ব্যথা করছিল। থেকে থেকে মাথাটা দপদপ করছিল। তিন বৌয়ের ওপর পরিবেশনের দায়িত্ব দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন, তিনি বিশ্রাম করবেন। কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন দেবিকারানী।

পরদিন কথা প্রসঙ্গে তার কানে গেল, দাসদাসীরা সব রকমের পিঠে পায়নি। শুনে অবাক হলেন দেবিকারানী। দাসদাসীদের বঞ্চিত করার নিয়ম তার সংসারে চালু নেই। তিনি তা চালু হতে দেননি। ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, কিংবা কে তার জন্য দায়ী, এসব জটিল প্রশ্নের মধ্যে গেলেন না তিনি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বৌদের কাছে কারণ জানতে চাইলেন।

জবাব দিল শিপ্রা। তার বক্তব্য, তাদের ভুল হয়ে গিয়েছিল। দেবিকারানী বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—সে কি কথা? স্বামী বা ছেলেমেয়েদের দিতে কি ভুল হয়েছিল? আর তোমরা নিজেরা খেতে কি ভুলে গিয়েছিলে?

সকলকে নির্বাক দেখে দেবিকারানী একটু খেদের সঙ্গেই তাদের শোধরাতে চেষ্টা করেন।

—শোন, আমি তো চিরদিন থাকবনা। বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করোনা। সংসারে তাদেরও একটা স্থান আছে, তাদেরও দাম আছে। অভাবের জন্যই তারা পরের সংসারে খাটতে আসে। খাওয়ার কষ্ট তাদের বড় বাজে। আর ভালমন্দ খাবার ইচ্ছাটাও তাদের বেশিই থাকে। তাদের এভাবে বঞ্চিত করাটা ঠিক না।

সরস্বতী সব শোনে, সব দেখে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে একমত হতে পারে না। সে ভাবে, মায়ের এসব বাড়াবাড়ি। এসব ঘটনাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হয় না। কাজের লোকেদের এতখানি প্রাধান্য দেওয়া তার মনঃপূত নয়। কিন্তু মায়ের সংসারে তার মতামতের গুরুত্ব কতখানি? মা খুব রাশভারি নন—তিনি দাপট দেখান না। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তার ব্যক্তিত্বের ভার বেশ টের পাওয়া যায়।

মাকে সরস্বতী পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। মায়ের মধ্যে অনেক অসংগতি লক্ষ্য করে সে। বড় বৌদির প্রতি মা প্রসন্ন নন। অথচ তার মেয়ে দুটির প্রতি কি অসীম স্নেহ। তৃতীয়বার সন্তান সম্ভাবনা হতে বড় বৌদি

যখন বাপের বাড়ি গেল, তখন তার মেয়ে দ্বটির দিকে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি দেখে অবাক হোল সরস্বতী। একদিন তার সেজ বৌদি তাদের খাইয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ বিষম খেল ছোট মেয়েটি। দেবিকারানী সঙ্গে সঙ্গে বৌকে সরিয়ে নিজে তাকে খাওয়াতে বসলেন। পরম মমতায় তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে মৃদ্ব তিরস্কার করলেন সেজ বৌকে—'এভাবে এত তাড়াতাড়ি খাওয়াতে হয় বাচ্চাদের? এটুকু ধৈর্য নেই? ওদের মা কাছে নেই। তোমরাই তো দেখাশোনা করবে। মায়ের অভাব ব্রঝতে দেবেনা ওদের।'

তৃতীয় বারেও পত্র হলোনা। আবার একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল দীপা। দেবিকারানী চেয়েছিলেন, এবার একটি পত্র হয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। মনের দ্বঃখ মনেই চেপে রাখলেন তিনি।

দিব্যনারায়ণ কিন্তু মুখ ফুটে তার অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন একাধিক বার। সেকথা কানে গেল দীপার। তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। সে নিজেও পত্র সন্তান চেয়েছিল। কন্যার মুখ দেখে খুশি হয়নি। কিন্তু দিব্যনারায়ণের বিরক্তি তার ভালো লাগলনা। মনে মনে সেও রুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সকলের প্রতি।

দেবিকারানী মুখফুটে কোনদিন তার আক্ষেপ ব্যক্ত করেননি। তা সত্ত্বেও, দীপা মনে মনে দেবিকারানীর দ্বঃখ টের পেয়েই যেন রুষ্ট হয়ে উঠছিল তার ওপরেও।

সরস্বতীরও চোখে পড়ল, ইদানীং মায়ের সঙ্গে বড় বৌদির বচসা যেন বেশি রকম হচ্ছে। বড় বৌদি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। সংসারের কোন কিছুই তার পছন্দ নয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেও তার বিরক্তি, বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ প্রকট হয়ে পড়ছে।

দেবিকারানী সতর্ক থাকেন। বারুদে অগ্নিসংযোগ তার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও, অনিবার্য সেই চরম বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হোলনা।

একদিন তার সঙ্গে বচসার পর দীপা হিরন্ময়ের সঙ্গে তুমুল কলহে লিপ্ত হোল। বন্ধ দরজা ভেদ করে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ বাইরে আসছিল।

দেবিকারানী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। হিরন্ময়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না। অসুস্থ শরীরে উত্তেজনা বিপদ ডেকে আনবে।

কিন্তু ছেলে বৌয়ের বচসার মধ্যে তিনি তৃতীয় পক্ষ। তিনি কি করবেন? অসহায়ভাবে গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ করেন দেবিকারানী।

সেদিন রাত্রেই আত্মহত্যা করল হিরন্ময়। ঘুমের ওষুধ খেয়ে। পাথর হয়ে গেলেন দেবিকারানী। দ্বঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় তার মাতৃবক্ষ মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু শব্দ করে কাঁদতে পারলেন না। অভাবিত সেই আঘাতে শরীর যেন শক্ত হয়ে উঠল।

আগে আরেকটি শোক পেয়েছিলেন। তার শিশুকন্যাটি মারা যেতে

খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ের মৃত্যুশোকের কাছে সেই শোক কিছু না।

হিরন্ময় যেন পূর্বজন্মের শত্রুতা সাধনের জন্যই তার কাছে প্রতিপালিত হয়েছিল। ভরা সংসার রেখে, সকলকে কাঁদিয়ে অকালে চলে গেল সে।

দিব্যনারায়ণকে দেখে অবাক হলেন দেবিকারানী। শক্ত থেকে যা করণীয়, করে গেলেন তিনি। এতটুকু ভেঙ্গে পড়লেন না। মর্গে শবদেহ যাতে কাটাছেঁড়া না হয়, তার জন্য পারিবারিক ডাক্তার ও থানার ও. সি.-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন দিব্যনারায়ণ। দুজনের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

যথারীতি দাহকার্য সম্পন্ন হোল। কোন রকম ঝামেলা হোল না। অনেকের মত দেবিকারানীও অবাক হয়ে ভাবলেন, কোন ধাতুতে গড়া দিব্যনারায়ণ? অতীত ইতিহাসের অনেক কাহিনীই কানে এসেছে। কিন্তু সেগুলি সব শোনা কথা। জোয়ান বয়সের ছেলের অপঘাত মৃত্যুতেও যিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে, আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে পারেন, সব ফাঁকফোকর বুজোতে পারেন, তার জন্য কোন্ বিশেষণ যথার্থ?

আরও একবার দেবিকারানীর মনে হোল, তিনি তার 'অতিমানব' স্বামীর উপযুক্ত ঘরণী নন। সেই যোগ্যতা তার নেই, সেই যোগ্যতা অর্জন করতেও তিনি অপারগ।

॥ আট ॥

হিরন্ময়ের মৃত্যু দেবিকারানীকে যে কতখানি দাগা দিয়ে গেছে, তা বাহ্যতঃ কথাবার্তায় বা আচরণে ধরা পড়লনা। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর অবনতি কারুর কাছেই গোপন রইল না।

মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। চোখেমুখে ক্লান্তি ও বিষাদের ছাপ ঘন হয়ে পড়ল। পারিবারিক চিকিৎসক পরীক্ষা করে রায় দিলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তিনি নির্দেশ দিলেন, শারীরিক পরিশ্রম যেন কম করেন দেবিকারানী। আনুষঙ্গিক ওষুধ পথ্যেরও যথাযথ ব্যবস্থা হোল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হোলনা। কিন্তু দেবিকারানীর শরীর আর ভাল হোলনা।

সরস্বতী একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে। সে বরাবরই বুদ্ধিমতী। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি বরাবরই প্রখর। মায়ের শরীর খারাপের মূল কারণ যে তার মনের দুঃখ, তা সে বুঝতে পারে। বড়দার অকাল মৃত্যু যে মায়ের বুকে চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে, তা বুঝতে অক্ষম নয় সরস্বতী। তার নিজের মত করে সে ভাবে, এই ক্ষত কোনদিন শুকোবে না। আজীবন সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হবে। তার মাকে কষ্ট দেবে, জ্বালাবে।

সংসারের কর্ত্রী হিসাবে যা করণীয়, তা ঠিকই করেন দেবিকারানী। তবে

অনেক বেশি আলগা আলগা ভাবে। মায়ের চেহারায় বৈরাগ্যের ছাপ লক্ষ্য করে সরস্বতী। তার ভয় হয়। মা তাদের থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছেন যেন।

পারিবারিক চিকিৎসক দেবিকারানীকে অবগাহন স্নানের পরামর্শ দিলেন। হৃদযন্ত্রের পীড়ায় তা নাকি খুবই ফলপ্রসূ। দেবিকারানীর জীবনযাত্রায় নতুন অভ্যাস সংযোজিত হোল। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের অভ্যাস তার আগেই ছিল। এখন ডাক্তারের নির্দেশমতো গঙ্গাস্নান সুরু করলেন। প্রায়শই সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে যান।

প্রত্যুষের কলকাতার অনিবর্চনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করে সরস্বতী জীবনের গভীরতর সত্যোপলব্ধির ছোঁয়া পায়। প্রায়ান্ধকার নির্জন রাস্তা, উদার অনাবিল প্রকৃতি, প্রত্যুষের গঙ্গাবক্ষ, উদীয়মান সূর্য, গঙ্গাবক্ষে অবগাহনরত সাধকদের গম্ভীর কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ, সরস্বতীর মনের পরিসর একটু একটু করে বিস্তৃত করে। গরদ পরিহিতা মায়ের উদাসীন দৃষ্টি তার বুকের মধ্যে এক অবোধ্য কষ্ট সঞ্চারিত করে।

দিব্যনারায়ণের জীবনযাত্রা অপরিবর্তিত রইল। পুত্রের মৃত্যুশোকও তার কাঠিন্য বা রুক্ষতা কমাতে পারল না। ভাইদের মধ্যে দাদার প্রতি সরস্বতীর টান সবচেয়ে বেশি। দাদার মৃত্যু তার মনেও অনেকটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। বাবাকে অপরিবর্তিত দেখে তার মনে মনে রাগ হয়। আবার মায়ের আচরণও তার কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়না। কোথাও কোন আশ্রয় খুঁজে পায়না তার মন। গুমরে গুমরে ওঠে সরস্বতী। নিজের মনটাকে নিয়ে কি করবে, ভেবে পায়না।

সরস্বতী অনেক কিছু লক্ষ্য করে। অনেক কিছু বিশ্লেষণ করে। নিঃসঙ্গতা তাকে অনেক পরিণত করে তুলেছে। তার চোখে পড়ে, দেবিকারানী যেন ইদানীং বড় বৌদিকে সহ্য করতে পারছেন না। দেখে কষ্ট হয় তার। বড় বৌদি আগের চেয়ে অনেক ম্রিয়মান, অনেক স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। তাকে বৈধব্য পালন করতে দেখে সরস্বতীর বুক টনটন করে।

মায়ের স্বভাবের বৈপরীত্য দেখে সে আশ্চর্য হয়। বড় বৌদির জন্য বরাদ্দ হয়েছে নিরামিষ, নিরাড়ম্বর আহার। প্রাণরক্ষার তাগিদে নির্বিবাদে সে তা গ্রহণ করে। স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যু তার সব তেজ, সব প্রতিবাদ হরণ করে নিয়েছে। কিন্তু সরস্বতীই একদিন ফেটে পড়ল। স্পষ্ট ভাষায় মাকে আক্রমণ করল।

সেদিন রাত্রে মা তার ওপর দায়িত্ব দিলেন বড় বউদির খাবারটা ওপরে তার ঘরে পৌঁছে দিতে। সরস্বতী ঢাকনা খুলে দেখল, পাত্রে রয়েছে কয়েকটা রুটি, তার সঙ্গে খানিকটা ঢ্যাড়স চর্চরি। একপাশে একটু নলেন গুড়—ব্যাস! আর কিছু না। কিছুদিন ধরেই এসব লক্ষ্য করছে সে। বৌদির জন্য বরাদ্দ খাবার তাকে পীড়া দিচ্ছে। আজ প্রথম সুযোগেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

—বড় বৌদিকে তুমি এই খাবার খেতে দিচ্ছ? ছি ছি, মা, আমাদের বাড়ির

ঝি চাকররাও তো ভালমন্দ কত কিছু খাচ্ছে। আর বাড়ির বৌয়ের জন্য বরাদ্দ হোল শুকনো রুটি আর ঢ্যাড়স চচ্চরি? দুধটুকু পর্যন্ত বাদ? অথচ আমরা মাছ, মাংস, মিষ্টি মিঠাই, কত কি খাচ্ছি। এ কি ধর্মে সইবে, মা? তোমার তো কোন কিছুর অভাব নেই। তুমি এমন কৃপণ হবে কেন? আর তুমি কাকে খেতে দিচ্ছ? বৌদি খাবে তার নিজের দাবিতে, নিজের অধিকারে।

দেবিকারানী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কচি মুখে পাকা পাকা কথা বলার জন্য সরস্বতীকে তিরস্কার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংবরণ করলেন। সরস্বতী বড় হয়ে উঠছে। তার বিচারবুদ্ধি গড়ে উঠছে। তাকে আর অগ্রাহ্য করা যায় না। তার যুক্তি অভ্রান্ত। সত্যিই তো এরকম সামান্য উপচারে খাবে কেন বাড়ির বৌ? জেলখানার দাগী আসামীর মত কেন তাকে বাধ্য করা হবে ঐ জঘন্য খাবার খাওয়ার শাস্তি নিতে? তিনি শাস্তি দেওয়ার কে?

সরস্বতীর যুক্তির যথার্থতা স্বীকার করে নিলেন দেবিকারানী। তার কাছে হার স্বীকার করলেন। আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের ত্রুটি ধরতে পারলেন। নিজেকে অপরাধী মনে হোল তার। সরস্বতীর হস্তক্ষেপেই বিধবা বড় বৌয়ের জন্য বরাদ্দ হোল একাধিক তরকারী, দুধ, মিষ্টি, ইত্যাদি।

সরস্বতীকে আজকাল মাঝেমাঝে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন দেবিকারানী। তার মেয়ে আর কিশোরীটি নেই। পড়াশোনা করছে, স্কুলে যাচ্ছে। মাঝেমাঝেই তার সদৃপ্ত ঘোষণা কানে আসে দেবিকারানীর। বিস্ময়ের সঙ্গে দুশ্চিন্তাও বোধ করেন তিনি। বাল্যবিবাহের সব চিহ্ন মুছে ফেলে কুমারীর মত চললেও মেয়ে কুমারী নয়। যেভাবে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠছে, তাতে এই সংসারে মানিয়ে চলা ভবিষ্যতে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

দিব্যনারায়ণ রক্ষণশীল হয়েও এই ব্যাপারে যেন অন্ধ। তিনি গোঁ ধরে আছেন। মেয়েকে স্বেচ্ছায় ওবাড়ি পাঠাবেন না। দেবিকারানী তাকে কম বোঝাননা। তাদের অবর্তমানে মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা নিয়ে তার মনের একান্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। স্বামী তাতে কর্ণপাত করেন না। তার সেই এক কথা। মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, স্বাবলম্বী হবে। মেয়ের জন্য তিনি ভাল-রকম সংস্থান রেখে যাবেন। ভাইদের আশ্রিত হতে হবে না তাকে।

দেবিকারানী নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সব কিছু ছক কেটে বলা যায় না। ঈশ্বরের কাছে মেয়ের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করেন। আশা করেন, দৈবকৃপায় আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ে শ্বশুরালয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

দিনে দিনে সুন্দরী হয়ে উঠছে মেয়ে। দেবিকারানী দেখেছেন, অনেকেই তাকে আড়ে আড়ে লক্ষ্য করে। মনে মনে শঙ্কিত বোধ করেন তিনি। দিব্যনারায়ণ কন্যাকে শিক্ষিত করবেন, তার জন্য অর্থের সংস্থান রেখে যাবেন। কিন্তু অভিভাবক রেখে যাবেন কাকে?

একদিন গঙ্গাস্নান করে ফেরার সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার গোপালকৃষ্ণের

সঙ্গে। সরস্বতী সেদিন সঙ্গে ছিলনা। পথের ওপরেই পা ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করল গোপালকৃষ্ণ। দেখে ভাল লাগল দেবিকারানীর। মনে মনে মেয়ের জন্য আশান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি।

পারস্পরিক কুশল প্রশ্ন আদান প্রদানের পর গোপালকৃষ্ণ তার সকাতর আর্জি পেশ করে।

—মা, সরস্বতীকে আমি নিয়ে যেতে চাই। আমি যে অন্যায় করেছি, তার মাপ নেই জানি। অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি সেজন্য। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।

দেবিকারানী তাকিয়ে দেখলেন ভাল করে। একটু রোগা হয়েছে গোপালকৃষ্ণ। কিন্তু তার মেয়ের পাশে বড় বেমানান। পান খাওয়ার অভ্যাস পূর্ববৎ রয়েছে। দুই ঠোঁটে দাঁতে তার চিহ্ন বর্তমান। নাদুস নুদুস বুদ্ধিহীন চেহারা। বয়সের ছাপ বেশ প্রকট। এই মানুষকে সরস্বতীর মত মেয়ের পছন্দ হবে কি করে? কেন যে তিনি তখন এই সম্বন্ধে মত দিয়েছিলেন? তবু এর সঙ্গেই থাকতে হবে সরস্বতীকে। তার বিধিনির্বন্ধ সেটাই। সরস্বতী নয় গড়ে পিটে নেবে স্বামীকে। এমন তো কত হয়! কিন্তু তিনি চাননা, বাপের বাড়িতে পড়ে থেকে মেয়ের ভবিষ্যৎ চিরতরে খোঁড়া হয়।

সত্য কথাই বলেন দেবিকারানী।

—আমি তো কর্তা নই, বাবা! সরস্বতীর বাবার সঙ্গে কথা বলো তুমি। সরস্বতীর বাবা আর সরস্বতীর যদি অমত না থাকে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

গোপালকৃষ্ণ আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে শাশুড়ীকে।

বাড়ি ফিরে সোজা সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হলেন দেবিকারানী। সরস্বতী তার পড়া তৈরি করছিল। গোপালকৃষ্ণের আর্জির কথা শুনে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। দেবিকারানীর চোখ এড়ায় না তা। মনে মনে প্রমাদ গোনেন তিনি। তিনি যা চাইছেন, তা হয়ত বাস্তবায়িত হবে না। সরস্বতী হয়ত রাজী হবে না গোপালকৃষ্ণের ঘর করতে।

মেয়ের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে তিনি চলে গেলেন ওপরে। সব শুনে দিব্যনারায়ণের মুখে কোন ভাবান্তর হোল না।

নির্বিকার ভঙ্গীতে দেবিকারানীর সব সংশয় উড়িয়ে দিলেন তিনি।

—আমরা কি করতে পারি এ ব্যাপারে? যা ঠিক করার, তা করবে সরস্বতী। ও বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। আমরা ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। আমি চাইনা, আমাদের ফয়সলা ওর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আবার ওর ক্ষতি করি।

পরে সরস্বতীকে ডেকে পাঠান দিব্যনারায়ণ।

—সব তো শুনেছ? এখন তুমি ঠিক করো, কি করবে। তোমাকেই মনস্থির করতে হবে। যদি তুমি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে চাও, স্বামীর ঘর করতে চাও,

আমি বাধা দেবনা। তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তবে জেনে রেখ, এ বাড়ির দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে থাকতে চাও, তাহলে যতদূরে পড়াশোনা করতে চাইবে, ততদূরে আমি তোমায় পড়াব। তোমার ভবিষ্যতের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করে যাব। কোন অসুবিধা হবেনা তোমার।

সরস্বতী স্থির, নির্ভীক দৃষ্টিতে তাকায় বাবার দিকে। অবিচলিত দ্বিধাহীন সে। তার মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

—আমি ওবাড়ি আর ফিরে যাব না। এখানে থেকে পড়াশোনা করব, নিজের পায়ে দাঁড়াব।

দিব্যনারায়ণ খুশি হন।

—আমি জানতাম, আমার মেয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

সেদিন একটু পরে দিব্যনারায়ণকে টেলিফোন করে গোপালকৃষ্ণ। তার আর্জি পুরোপুরি না শুনেই দিব্যনারায়ণ নিজের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। তিনি সব শুনেছেন। তবে তারা তৃতীয় পক্ষ। যা ঠিক করার, সরস্বতী করবে। গোপালকৃষ্ণ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করে তার মত জেনে নিক।

কালবিলম্ব না করে পরের দিনই গোপালকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হোল ঘোষাল বাড়িতে। সরস্বতী তখন নীচে পড়ার ঘরে ছিল। বাড়ির দাসীকে দিব্যনারায়ণ পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, গোপালকৃষ্ণ এলে তাকে যেন সরস্বতীর ঘরে পৌঁছে দেয় সে।

গোপালকৃষ্ণ সসঙ্কোচে সরস্বতীর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সরস্বতী তাকে কোন রকম অভ্যর্থনা জানালনা। অস্বস্তি বোধ করে গোপালকৃষ্ণ। মুখোমুখি এই রূপলাবণ্যবতী মেয়েটি প্রায় তার হাঁটুর বয়সী। একদিন তার স্ত্রী হিসাবে তাদের বাড়িতে ছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য এই রত্নকে সে হারিয়েছে।

গোপালকৃষ্ণ চুপ করে বসে রইল। সে কি বলবে, ভেবে পাচ্ছেনা। সরস্বতী শক্ত মুখে বসে আছে। গোপালকৃষ্ণ বুঝতে পারছেনা, কি ভাবে আরম্ভ করবে। সরস্বতীর জন্য হাতে করে একটি দামী শাড়ি নিয়ে এসেছে সে। শাড়ির প্যাকেটটা টেবিলে সরস্বতীর সামনে রেখে দিয়ে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলে—'তোমার জন্য এই শাড়িটা নিয়ে এসেছি। খুব সুন্দর মানাবে তোমাকে।'

সরস্বতী কাঠকাঠভাবে জবাব দিল।

—ওটা আপনি নিয়ে যান। আমি ঐ শাড়ি পরবনা।

গোপালকৃষ্ণ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

—আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি, সরস্বতী। আমি অনেক অন্যায় করেছি তোমার প্রতি। যা হবার, হয়েছে। এখন ফিরে চলো তোমার নিজের বাড়িতে। আমি তোমায় মাথায় করে রাখব।

সরস্বতী হাসল। ব্যঙ্গের হাসি।

—কি বলছেন ? আবার ফিরে যাব ওবাড়িতে ? আপনি সময় নষ্ট করবেন না। আমি কোনদিনই ওখানে ফিরে যাব না।

গোপালকৃষ্ণ হাল ছাড়ে না। সরস্বতীকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

—তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না, সরস্বতী। আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিও না। আমি অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।

সরস্বতীর মনে পড়ল, ফুলশয্যার রাতে গোপালকৃষ্ণ তাকে লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিয়েছিল। একটি বালিকাকে এক শয্যায় সহ্য করতে পারেনি। শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় শাশুড়ীর নির্দেশে যখনই সে গোপালকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তখনই তাকে দেখে কি বিতৃষ্ণা আর বিরক্তিই না ফুটে উঠেছে এই লোকটির চোখেমুখে। তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে ঘর থেকে। মাটিতে পড়ে গিয়ে মাথায় হাতে কোমরে চোট পেয়েছে সে। এসব ঘটনার কথা ভুলে যাবে কি করে ? এই লোকটির সঙ্গে যে মেয়েটির সম্পর্ক ছিল, সে এখন কোথায় ? তার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছে বলেই কি গোপালকৃষ্ণ পুরনো সম্পর্ক জোড়া লাগাতে এগিয়ে এসেছে ? কিংবা তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে ? সরস্বতী জানে, সে সুন্দর। অনেকের কাছেই তার সৌন্দর্যের স্তুতি শুনেছে সে।

গোপালকৃষ্ণ নিতান্তই লজ্জাহীন। তা না হলে নিজের কৃতকর্ম বিস্মৃত হয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে আসতনা। শাড়ি দেখিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করতনা এভাবে।

তার মনের চিন্তা মনেই রয়ে গেল। মুখে সে ব্যক্ত করলনা কিছু। তাকে নির্বাক দেখে গোপালকৃষ্ণ একটু আশান্বিত হয়।

—ফিরে চলো, সরস্বতী। আমাকে দয়া করো।

সরস্বতী উঠে দাঁড়াল।

—আপনি অকারণে সময় নষ্ট করছেন। আমি কোনদিনই আপনার বাড়িতে ফিরে যাব না। ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পড়াশোনা করব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। আর আপনার শাড়ি নিয়ে যান। আমি ওটা নেবনা।

গোপালকৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শাড়ির প্যাকেট টেবিলেই পড়ে রইল। সে তা ফেরৎ নিয়ে গেলনা।

তাকে এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করল সরস্বতী। তার মনে হোল—'কি কুৎসিত। কি বিশ্রী। এই লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। ঈশ্বর খুব দয়া করেছেন।' গোপালকৃষ্ণের অদেখা প্রেমিকার প্রতি বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতা বোধ করল হঠাৎ সরস্বতী। ঐ মেয়েটির জন্যই পাঁক থেকে উদ্ধার পেয়েছে সে। কানাগলির মধ্যে হারিয়ে যায়নি তার জীবন। নাহলে কি হতো ভেবে শিউরে ওঠে সরস্বতী।

সরস্বতী নতুন জীবন সুরু করে স্বস্তি পেল বটে, কিন্তু মানুষের রসনা, তার

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, শ্লেষ তাকে শান্তিতে থাকতে দিতে চাইল না। দিব্যনারায়ণের মত দাপটে মানুষকে পর্যন্ত রেয়াৎ করলনা সমাজ। সরস্বতীর জন্য তার প্রতাপশালী বাবাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে হোল। সরস্বতী দেখল, সে যাকে দুই পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ভেবেছিল, তা সবলের আলোচনার বিষয়, সমালোচনার বিষয়, নিন্দামন্দের বিষয় হয়ে উঠেছে।

দেবিকারানীর দূরদর্শিতার হাতেনাতে মোক্ষম প্রমাণ পেয়ে সরস্বতী তো বটেই, দিব্যনারায়ণ ও তার পুত্ররাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সেই আঘাতে ঘোষাল বাড়ির মানমর্যাদা ধূলিসাৎ করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হোল। দিব্যনারায়ণের গায়ে, তার পরিবারের গায়ে কাদা ছিটাবার চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হোল।

দিব্যনারায়ণ একাদিক্রমে বহু বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। নির্বাচনে কোনদিন তার হার হয়নি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আর অনুকূলে থাকল না। দিব্যনারায়ণের প্রতিপক্ষ হিসাবে যে ভদ্রলোক নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তার নাম অরুণ লাহিড়ী। দিব্যনারায়ণের সঙ্গে তার প্রতিবেশী এই ভদ্রলোকের সম্পর্ক ভালই। দিব্যনারায়ণের পুত্রদের সঙ্গে অরুণ লাহিড়ীর ভায়েদের রয়েছে রীতিমত বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ভোটগ্রহণ পর্বের ঠিক আগে আগে অরুণ লাহিড়ী একটি নাটক লিখলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার দিন সরস্বতীর দাদারা আমন্ত্রিত হোল সেটি দেখার জন্য। সরস্বতীর নিজেরা দাদারা তো বটেই, তার জ্যাঠতুতো দাদারাও আমন্ত্রিত হোল। কিন্তু নাটকের খানিকটা অংশ দেখেই তারা উঠে পড়ল।

নাটকের বিষয়বস্তু একটি বনেদী পরিবারের একমাত্র কন্যার বাল্যবিবাহ, তার শ্বশুরবাড়ি পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি এসে থাকা। নাটকটিতে মেয়েটির বাবাকে অর্থলোভী, নীতিবর্জিত মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তিনি তার একমাত্র কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। যৌবনবতী সুন্দরী মেয়েকে ব্যবহার করে অর্থোপার্জন করাই তার অভিপ্রায়।

শেষ পর্যন্ত বসে এই নাটক দেখা সম্ভব হোলনা সরস্বতীর দাদাদের। তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। এত তাড়াতাড়ি তাদের ফিরে আসতে দেখে সরস্বতী অবাক হোল।

—তোমরা এখনই ফিরে আসলে যে? নাটক শেষ হয়ে গেল এর মধ্যে?

সরস্বতীর দাদারা তার কথার কোন জবাব দিলনা। রাগে ফুঁসছিল তারা। সরস্বতীর কানে গেল তার মেজদার কথা।

—এত আস্পর্দ্ধা? বাবাকে নিয়ে ওরা এরকম ইতরামি করল?

তার ছোড়দা ততোধিক উত্তেজিত।

—দেখে নেব। ওদের বড় বাড় বেড়েছে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

দিব্যনারায়ণের কানে গিয়েছিল ছেলেদের কথা। খবর পেয়ে ওপর থেকে নীচে

নেমে এসেছিলেন তিনি।

ছেলেকে মৃদু তিরস্কার করলেন।

—শোন, মাথা গরম করোনা। উত্তেজিত হয়ে হঠকারিতা বশে কিছু করে ফেললে তার ফল ভাল হয় না।

সরস্বতীর ছোড়দা ঠাণ্ডা হয় না। আগের মতই রাগে ফুঁসতে থাকে।

—ওদের এমন উত্তম মধ্যম দেব যে, জীবনে আর ওরকম ইতরামি করতে সাহস পাবেনা।

দিব্যনারায়ণ ঠাণ্ডা মাথায় বোঝালেন তাকে।

—আমি যা বললাম, মনে রেখ। রাগের মাথায় কিছু করা ঠিক না। পরে তার জন্য অনুশোচনা হবে।

ঠিক সেই সময় প্রচুর মদ্যপান করে অরুণ লাহিড়ীর ভাই বরুণ লাহিড়ী বাড়ির লনের কাছে এসে জড়ানো গলায় শাসাতে থাকে। হাতে তার একটি ছুরি।

—বছর বছর একভাবে চেয়ারম্যান হওয়া বার করে দেব। যা টাইট দেওয়া হয়েছে, আর ওকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবেনা। দেখব, ঘোষাল মশাই কি করে জেতেন এবার?

সরস্বতীর মেজদা এগিয়ে গিয়ে একটা লাথি মারে বরুণকে। মাটিতে পড়ে যায় বরুণ। উঠে দাঁড়িয়ে সে পাল্টা আক্রমণ করতে যাবে, এমন সময় সরস্বতীর আরেক ভাই তাকে কসে থাপ্পড় লাগায়। আবার কাত হয়ে পড়ে যায় বরুণ।

বরুণ এবার উঠে গাড়ির পেট্রল ট্যাংকে আগুন লাগাতে গেল। ড্রাইভার শচীন বাধা দিল।

খবরদার, বাবু। গাড়িতে আগুন দেবেন না।

সরস্বতীর সেজদা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চলে গেল ওপরে বন্দুক আনতে। বন্দুক নিয়ে এসে প্রায় গুলি করতে যাচ্ছিল সে। সময়মত দিব্যনারায়ণ বাধা দিলেন।

– করছ কি? শেষে পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়বে দেখছি।

সরস্বতীর ন'দা আবার সজোরে চড় কষায় বরুণের গালে। টাল সামলাতে না পেরে বরুণ পড়ে গেল মাটিতে। তার মাথা ফেটে গেল। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা—হাতের ছুরি পড়ে গেল হাত থেকে।

সরস্বতীর মেজদা তখন টেনে হিঁচড়ে বরুণের মাথা কলের নীচে রাখে, রক্তটা ধুয়ে ফেলে। জায়গাটাও পরিষ্কার করে ফেলে।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হোলনা। একটু পরে অরুণ লাহিড়ীর সমর্থক এক দল ছেলে চিৎকার করতে করতে উপস্থিত হোল সরস্বতীদের বাড়ির সামনে বাগানে।

সরস্বতীর ছোড়দা অভয়ের শরীরে ভর করে আসুরিক শক্তি। সরস্বতীর চোখের সামনে ঘটে গেল তখন অবিশ্বাস্য সেই ঘটনা। সিনেমার হিরোর মত গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার ছোড়দা একজন একজন করে অনেক ছেলেকে ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। ভীম বিক্রমে যুঝে যাচ্ছে একা সকলের সঙ্গে। সরস্বতীর

ন'দা দোতলায় উঠে গেল। সেখান থেকে সমানে ইঁটবৃষ্টি করতে থাকে সে ছেলেদের লক্ষ্য করে।

অভয়ের ভীম বিক্রমের সামনে দাঁড়াতে সাহস করলনা অন্য ছেলেরা। তারা 'য পলায়তি স জীবতি' নীতি অনুসরণ করে চম্পট দিল একযোগে।

দিব্যনারায়ণ ইত্যবসরে দুটি বুদ্ধির কাজ করলেন। প্রথমে তিনি স্থানীয় থানার ও. সি. কে ফোন করলেন।

—আপনি শিগগির পুলিশ নিয়ে আসুন। আমার বাড়িতে হামলা করেছে কিছু ছেলে। ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে বাড়ির ক্ষতি করেছে তারা।

পরে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ফোন করলেন তিনি।

—ডাক্তারবাবু, আমার বাড়িতে হামলা করেছিল কিছু ছেলে। আমার ছেলেরা তাদের ঠেকাবার জন্য কিল চড় মেরেছে। আপনার হাসপাতালে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন, তাদের যেন ঠিকমত চিকিৎসা হয়। বুঝতেই পারছেন, ছেলে ছোকরাদের রক্ত—সহজেই গরম হয়ে ওঠে।

এদিকে যেসব ছেলেরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাদের কাছে খবর পেয়ে অন্য ছেলেরা এসে জড়ো হোল সেখানে। তারা ইঁট পাটকেল নিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় জড়ো হোল। সরস্বতীদের বাড়ি লক্ষ্য করে সেগুলি ছুঁড়তে লাগল। সেই সঙ্গে বর্ষিত হতে থাকল অবিরাম গালিগালাজ ঘোষাল পরিবারের উদ্দেশ্যে। কয়েকজন আবার বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে বরুণকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

থানার ও. সি. ঠিক সেই সময়েই দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হোল।

তারা সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল।

—আমাদের অ্যারেস্ট করছেন কেন? ওরাই তো আমাদের ছেলেদের মেরেছে। কতজনকে ঘায়েল করেছে। ওদের কোন দোষ নেই? যত দোষ আমাদের? বাঃ!

ও. সি. মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

—অ্যাই, চোপ! ইঁট পাটকেল নিয়ে অন্যের বাড়ি চড়াও হয়েছ—বাড়ির দরজা জানলা ভেঙ্গে দিয়েছ, তোমাদের দলের ছেলে ছুরি নিয়ে খুন করতে এসেছে, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে গিয়েছে—তার পরেও বড় গলা করে কথা! চোরের মার বড় গলা, না?

কারুর কোন আপত্তি বা প্রতিবাদে কান না দিয়ে ঠেলেঠুলে যতজনকে পারলেন ভ্যানে তুললেন। যারা আহত হয়েছিল, তাদেরও ঠেলেঠুলে ওঠানো হোল গাড়িতে। পথে হাসপাতালে তাদের দিয়ে আসা হোল।

ডাঃ সেন সরস্বতীদের পারিবারিক চিকিৎসক। দিব্যনারায়ণের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাকে আগেই সব ঘটনা জানানো হয়েছিল। অতএব কোন রকম অসুবিধা হোল না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হোল।

কয়েক জনের আঘাত গুরুতর। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হোল।

দিব্যনারায়ণের বুদ্ধিকৌশলের কাছে হার মানতে হোল প্রতিপক্ষকে। ঘটনার পাল্লা সম্পূর্ণ অন্য দিকে ঝুঁকে গেল। থানায় ডায়েরী করানো হোল ছেলেদের বিরুদ্ধে। বলা হোল, তারা বাড়ি বয়ে এসে হামলা করেছে, বাড়ির অনেক ক্ষতি করেছে। থানার ও. সি. নিজে তাদের হামলা করতে দেখেছেন। কোনরকম ওজর ওজুহাত চলল না। আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের হোল। থানায় আটক ছেলেদের বাবা দাদারা প্রমাদ গুনলেন।

দিব্যনারায়ণের কাছেই রয়েছে তার প্রতিকার। তারা ঘোষাল বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। নীচে শ্বেতপাথরের রোয়াকে বসে তারা অপেক্ষা করতে থাকেন। জগাকে দিয়ে খবর পাঠানো হোল সেই মর্মে ওপরে দিব্যনারায়ণের কাছে।

একটু পরে গম্ভীর মুখে নেমে এলেন দিব্যনারায়ণ। কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে জগাকে ডাকেন।

—জগা, তামাক দিয়ে যা।

সকলে চুপচাপ বসে। নির্বাক, নিঃশব্দ। জগা এসে তামাক সেজে দিয়ে গেল এক ফাঁকে। গড়গড়া টানতে থাকেন দিব্যনারায়ণ। সাহস করে কেউ কোন কথা বলছেন না। দিব্যনারায়ণ উঠে দাঁড়ান। আবার জগার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়েন।

—জগা, গড়গড়াটা ওপরে নিয়ে আয়।

বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকতে যাচ্ছেন, সেই সময়ে অভিভাবকদের টনক নড়ল।

—আপনি কিছু বললেন না ?

দিব্যনারায়ণ কঠিন মুখে জবাব দিলেন।

—আমার তো কিছু বলার নেই। আপনারাই এসেছিলেন বলার জন্য।

শশব্যস্ত হয়ে একসঙ্গে সকলে মিলে কথা বলেন।

—দয়া করে আর একটু বসুন।

দিব্যনারায়ণ তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। পূর্ববৎ গম্ভীর মুখে ফিরে এসে বসেন। জগার হাত থেকে গড়গড়াটা নিয়ে আবার চুপচাপ তামাক টানতে থাকেন।

তোতাপাখীর মত শেখানো ভঙ্গীতে সমস্বরে বলে ওঠেন সকলে।

—দেখুন ঘোষাল মশাই, যা হবার, হয়েছে। আপনি মামলা তুলে নিন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জবাব দিলেন দিব্যনারায়ণ।

—আমার বাড়িতে হামলা হোল। ক্ষতি হোল আমার বাড়ির। আর আমি মামলা তুলে নেব! সে কি কথা ?

আমতা আমতা করেন সকলে।

—ছোট ছেলে সব। বোঝেনা। অন্যায় করে ফেলেছে। আপনি ওদের মাপ করে দিন।

দিব্যনারায়ণ হাঁ না কিছুই না বলে বাড়ির ভেতরের দিকে পা বাড়ান। ছেলেদের অভিভাবকদের প্রশ্ন কানে আসে।

—আপনি কিছু বলে গেলেন না?

পেছন ফিরে না তাকিয়েই ততোধিক গম্ভীর গলায় দিব্যনারায়ণ জবাব দিলেন।

—আমার কিছু বলার নেই। অ্যাপোলজি না চাইলে মামলা চলবে। যারা অন্যায় করেছে, তারা আসুক। এসে ক্ষমা চাক। তবেই আমি মামলা তুলে নেব।

পরদিন পান্ডা স্থানীয় ছেলেরা এসে মাপ চাইল দিব্যনারায়ণের কাছে। প্রথমে তারা ইতস্ততঃ করছিল। পরে উপায়ান্তর না দেখে মরীয়া হয়ে অ্যাপোলজি চাইল।

—মেশোমশায়, আমাদের অন্যায় হয়ে গিয়েছে। মাপ করে দিন আমাদের।

দিব্যনারায়ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তাদের উদ্দেশ্যে।

—আর এরকম ঘটনা ঘটবে না তো?

সকলে মিলে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কোনদিন না। আমরা কথা দিচ্ছি।'

বুদ্ধিবলে ও কৌশলে দিব্যনারায়ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিকেও নিজের অনুকূলে নিয়ে আসলেন। সরস্বতী চমৎকৃত হোল বাবার বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে।

কিন্তু তাসত্ত্বেও, নির্বাচনে শেষরক্ষা হোলনা। দিব্যনারায়ণ বাবুর হার হোল নির্বাচনে। অপবাদের যে কালিমা তার প্রতিপক্ষ লেপন করেছিল, তার প্রভাব অনপনীয় প্রতিপন্ন হোল। মিথ্যা কলঙ্কের ভারও কম না। দিব্যনারায়ণও সেই ভার ছুঁড়ে ফেলতে পারলেন না। মনে মনে অনেকটা দমে গেলেন।

দেবিকারানীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এর পর থেকে। পারিবারিক চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করেন, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন। দেবিকারানী পুরোপুরিভাবে তার নির্দেশ মেনে চলেন না।

সরস্বতী বোঝে, মায়ের আসল অসুখ শরীরে নয়, মনে। বড়দার মৃত্যুশোক আর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাই তার কারণ। দেবিকারানী আজকাল প্রায়ই গীতা নিয়ে পড়েন। সরস্বতীর কেমন ভয় হয়। মনের মধ্যে অস্পষ্ট এক ভয় ঘোরাফেরা করে। মাঝেমাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। প্রায় সব স্বপ্নেই এক জিনিষ দেখে। দেবিকারানী মারা গেছেন। তাকে সিঁদুর পরিয়ে, চন্দন দিয়ে সাজিয়ে, শুইয়ে রাখা হয়েছে খাটে।

মনকে সান্ত্বনা দেয় সরস্বতী। অবচেতন মনের ভয়ই দুঃস্বপ্নের কারণ। তার মায়ের এমন কিছু বয়স হয়নি। তার আশঙ্কা অমূলক। কিন্তু তার আশঙ্কা সত্যি হোল। হঠাৎ স্ট্রোক হোল দেবিকারানীর। পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হোল তাকে পৃথিবী ছেড়ে।

যতদিন দেবিকারানী জীবিত ছিলেন, ততদিন সরস্বতীরা কেউই বোঝেনি তিনি তার স্বভাবসুলভ অনাসক্তি ও বৈরাগ্য সত্ত্বেও তাদের সংসারের সঙ্গে কতখানি

জড়িয়ে ছিলেন। বোঝা গেল তার মৃত্যুর পর। সংসারে একটি মানুষের সঙ্গে আরেকটি মানুষের গিঁট খুলে গেল যেন। দিব্যনারায়ণের রাশভারি গাম্ভীর্য ও প্রভুত্বপরায়ণতাও পারলনা খোলা গিঁটগুলিকে শক্ত করে বাঁধতে। সংসারের ভিত অনেক নড়বড়ে হয়ে গেল।

ঠাকুর চাকরের সঙ্গেও খিটিমিটি সুরু হোল। সরস্বতীর ছোট ভাইটি প্রায়ই রাগ করে খাওয়া ফেলে উঠে যেতে লাগল। বাড়িতে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারের ব্যবস্থা। তবু সরস্বতীরা খাওয়ার তাগিদ বোধ করে না। কলেজ থেকে ফিরে সরস্বতী দেখে, ঘরে তার খাবার ঢাকা রয়েছে। তার অন্য ভায়েদের জন্যও একই ব্যবস্থা। সামনে বসে খাওয়াবার কেউ নেই।

বিবাহিত দাদাদের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। বৌদিরা সামনে বসে তাদের খাওয়ার তদারক করে। ননদ দেওরদের জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। সেজ বৌদি মানুষটা ভাল। তার মনে মায়ামমতা রয়েছে। কিন্তু মেজ জায়ের ব্যক্তিত্বের কাছে সে কেঁচো হয়ে থাকে। মেজ জা যে নিয়ম জারী করে, সেই নিয়মই বাধ্য মেয়ের মত পালন করে। বড় বৌদি নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছে। তিন মেয়ে নিয়ে সদাব্যস্ত। সরস্বতীর ধারণা, তাদের সংসারে বেশিদিন সে থাকবে না।

অনেক কিছুই চোখে পড়ে সরস্বতীর। তার ছোঁড়দা মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরেনা রাত্রে। সরস্বতীর কানে এসেছে, কোন এক মহিলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেই মহিলার বাড়িতেই মাঝেমাঝে রাত্রিবাস করে সে।

সরস্বতীর কাছে অচিন্তনীয় সেটি। ভাইদের মধ্যে বড়দার পরে ছোড়দাই তার সবচেয়ে প্রিয়। অত্যন্ত সুদর্শন তার এই দাদাটি মানুষ হিসাবে অতুলনীয়। উদারতা, মহত্ত্ব, দয়া মায়া, মমতার সংমিশ্রণে এক আদর্শ মানুষ। তার এই স্খলন অভাবিত ঘটনা।

মায়ের খুব টান ছিল ছোড়দার প্রতি। ছোড়দারও মায়ের ওপর খুব টান ছিল। হয়ত মায়ের মৃত্যুজনিত শূন্যতা ভুলতেই সে এইভাবে তার মানসিক আশ্রয় খুঁজেছে।

যত দেখে, যত চিন্তা করে, তত সরস্বতীর আশ্চর্য লাগে। নিজের পরিবারের লোকগুলি তার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে প্রতিভাত হয়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্বভাবে, কর্মদক্ষতায়, চমৎকার মানুষ তার ছোড়দা। সেও যে অবৈধ প্রেমের আবর্তে দিশেহারা হোল, তা তার কাছে মনে হয় এক অলঙ্ঘনীয় পারিবারিক অভিশাপ।

সরস্বতী জানে, তার ছোড়দাকে প্রশ্ন করলে সত্যি কথাই বলবে। স্পষ্টভাষী, সত্যভাষী সে। অনেকের মত মিথ্যাচারে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তার লজ্জা করে। সে দেখে, বৌদিরাও সেই প্রসঙ্গ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সরস্বতীকে সামনে দেখলে চুপ করে যায়। সরস্বতীর ইচ্ছা হয়, তাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে,

তাদের মনোভাব জানে। কিন্তু সংকোচ বোধ করে। ছোড়দাকে ছোট করতে চায় না সে অপরের কাছে।

দিব্যনারায়ণ শক্ত মানুষ। তাকে দেখে তার শোকের পরিমাপ সম্ভব নয়। কিন্তু দেবিকারানীর মৃত্যুর পরে পরেই মাছমাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন তিনি। রাত্রেও গুরু আহার বন্ধ করে দিলেন। দুটি মিষ্টি ও এক গ্লাস দুধে তার রাত্রিকালীন আহার সমাধা করেন।

রাত্রে তার ঘরে পৌঁছে দেয় বৌয়েরা সেই খাবার। একদিন মেজ বৌ দুধের গ্লাস ও মিষ্টি নিয়ে ওপরে উঠে দেখে, শ্বশুর মশায় দেয়ালে টাঙানো শাশুড়ীর তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছছেন। নিঃশব্দে টেবিলে আহার্য বস্তু নামিয়ে রেখে চলে আসে সে নীচে। বসার ঘরে তখন মায়ের আসন্ন বাৎসরিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল ভায়েদের মধ্যে। সরস্বতীও উপস্থিত ছিল সেখানে।

মেজ বৌদি ঘরে ঢুকেই আপশোসের শব্দ করে মুখে।

—সত্যি, বাবারই গেছে সবচেয়ে বেশি। ওপরে দুধ দিতে গিয়ে দেখি, মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে সমানে চোখ মুছছেন।

অভয় তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে রসিকতা করে।

—আহা, দুঃখ হবে না ? চার চারটে বৌয়ের একটাও টিকলনা। ভদ্রলোকের কপাল বড় মন্দ !

আভা তিরস্কার করে দেওরকে।

—কি হচ্ছে, অভয়? বাবাকে নিয়ে এমন রসিকতা? বাবার সত্যিই খুব লেগেছে। মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবাই যায়না, বাবা এমন ভেঙ্গে পড়বেন !

অভয় নির্বিকার।

—বিধবা হয়েছেন বলে মাছ মাংস ছেড়েছেন তো? মেনে নিলাম, সেটা ভালই করেছেন। বৈধব্য পালন করছেন। কিন্তু বিধবা তো এবারই হন নি। এর আগেও তো বিধবা হয়েছেন। তখন তো কই, মাছ মাংস ছাড়েননি? বৈধব্য পালনের কথা তখন মনে হয়নি তো! ভদ্রলোকের আচরণ সত্যিই দুর্বোধ্য। আমি ওঁকে কোনদিনই বুঝতে পারিনি। এখনও পারিনা।

হাসবেনা হাসবেনা করেও হেসে উঠল সকলে। এবার সরস্বতী শাসন করল তার ছোড়দাকে।

—তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ, ছোড়দা। বাবার অনেক দোষ আছে ঠিকই। কিন্তু গুণও তো কম নেই? বাবার মত চরিত্রবান পুরুষ কমই দেখা যায়।

অভয় হেসে উঠল সশব্দে।

—বাবার আদুরে মেয়ে বলে কথা! বাবার নিন্দে সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখ তো। চার চারবার বিয়ে করেছেন ঐ ভদ্রলোক। চারটি মেয়েকে ভোগ করেছেন। সচ্চরিত্র পুরুষ তুই কাকে বলবি ?

সরস্বতী হার মেনে চুপ করে গেল। দুর্জয় দুর্নিবার ছোড়দার সঙ্গে পেরে ওঠা তার সাধ্য নয়। ছোড়দা রাগে না, চিৎকার করে না। কেবল যুক্তির জালে আটকে ফেলে।

সরস্বতীর আজকাল মনে হয়, ছোড়দার মনে বাবার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছে। সেগুলিই সে রসিকতার ছদ্মবেশে ব্যক্ত করে। মায়ের মৃত্যুর পর তার সেই জেহাদ মাঝেমাঝেই প্রকাশ পায় এভাবে। অনেক সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেও ছোড়দা আক্রমণ হানে বাবার বিরুদ্ধে।

নিলয় খেতে বসে প্রায়ই অশান্তি করে। একদিন তো চরমে উঠল সেটা। সরস্বতীরা খেতে বসেছিল রান্নাঘরে। ঠাকুরই পরিবেশন করছিল। ইলিশ মাছে মুখ দিয়েই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে। ভাতের থালা ঠাকুরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল নিলয়।

—এমন বাসি পচা মাছ খেতে পারে কেউ ?

আগের দিন রাত্রে একজন জেলে প্রজা গঙ্গার ইলিশ দিয়ে গিয়েছিল। সেই মাছ ভেজে রেখেছিল ঠাকুর। পরদিন সেটি রান্না করে খেতে দিল সে সকলকে।

সরস্বতীদের বাড়িতে বাসি মাছ খাওয়ার রেওয়াজ নেই। তবু নির্বিবাদে তারা সেটি গলাধঃকরণ করেছে। কিন্তু নিলয় বরাবরই রগচটা। আপস তার স্বভাববিরুদ্ধ। বহুকালের পুরনো ব্রাহ্মণ ঠাকুরকেও সে রেয়াত করলনা।

ঠাকুর সেই অপমান সহ্য করল না। সেদিনই দিব্যনারায়ণের কাছে গিয়ে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করল।

—বাবু, আমাকে জবাব দিন। আমি আর কাজ করবনা।

দিব্যনারায়ণের কানে আগেই গিয়েছিল সব কথা। তিনি ঠাকুরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। হাত জোড় করে তার কাছে মাপ চান।

—শোন, আমি সব শুনেছি! তুমি ব্রাহ্মণ। আমার ছেলে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি। তুমি ভেবে দেখ। চাকরি ছাড়বে কেন? দোষ করেছে আমার ছেলে। তার জন্য তুমি কেন শাস্তি পাবে?

জল হয়ে গেল ঠাকুর। সে থেকে গেল। দিব্যনারায়ণের এই মহানুভবতা নিয়ে সকলেই যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখনও কিন্তু অভয় বাঁকা কথা বলতে ছাড়ে না।

—হ্যাঁ, ভদ্রলোক সত্যিই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাসত্ত্বেও বলব, ওঁর চরিত্রে সঙ্গতির অভাব বরাবরই রয়েছে। তোমরা ভেবে দেখ, যিনি দু'দুটি স্ত্রীর ভবলীলা নিজের হাতে সাঙ্গ করেছেন, তিনি তার ভাইকে কোনই শাস্তি দিলেন না। অথচ দুশ্চরিত্র ভাইটিই কিন্তু নাটের গুরু। পর পর দুই বৌদিকে সেই লোকটিই বিপথে টেনে নিয়েছিল। তার কীর্তিকলাপের তো অন্ত নেই! নিজের ভাগনীর সঙ্গেও ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধেনি। তবু তার কোন দোষই দেখতে পেলেন না স্নেহান্ধ দাদা। পরম স্নেহে ভাইয়ের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দিলেন না। কিন্তু একে একে দুই বৌকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। অথচ

ঠিকমত ওজন করলে অপরাধের পাল্লা ভাইয়ের দিকেই ঝুঁকবে বেশি।

খুব অল্প সময়ের বিরতিতে সরস্বতীর আরও দুই দাদার বিয়ে হয়ে গেল। দেবিকারানীর জীবদ্দশায় একজনের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। অপর জন নিজেই পছন্দ করল মেয়ে। দিব্যনারায়ণ আপত্তি করার কারণ খুঁজে পেলেন না। যথাসময়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেল বিয়ে।

সরস্বতীর জীবনের মোড় ঘুরে গেল তখন থেকে। নতুন অধ্যায় সংযোজিত হোল তার জীবনে। তার ন'দা অর্থাৎ প্রলয়ের বিয়েতে তার এক বন্ধুকে দেখে পঞ্চশরবিদ্ধ হোল সরস্বতী। পেশায় কাস্টম্স্ ইনস্পেক্টর সুদর্শন শ্যামবর্ণ যুবকটিকে দেখামাত্র প্রেমে পড়ল সে। দেবাশিসও সুসজ্জিতা সালঙ্কারা সুন্দরী সরস্বতীকে দেখে মোহাবিষ্ট হোল। প্রথম দর্শনেই তারা পরস্পর পরস্পরের প্রেমে পড়ল।

বয়সে দেবাশিস কম করেও দশ বার বছরের বড় সরস্বতীর চেয়ে। জাতেও অব্রাহ্মণ। কিন্তু এসব বিচার করার মানসিকতা সরস্বতীর নেই। মায়ের মৃত্যুর পর সব কিছু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে মন টেঁকে না। কলেজে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ খারাপ লাগে না। একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

দিব্যনারায়ণের রক্ষণশীলতা পূর্ববৎ অপরিবর্তিত আছে। তিনি তার কড়া শাসন শিথিল করেননি। বাড়ির গাড়ি সরস্বতীকে কলেজে পেঁছে দেয়। ছুটির পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বাড়িতে। দিব্যনারায়ণের কড়া হুকুম, বাসে ট্রামে করে কলেজে যাবেনা সরস্বতী। এমনকি কলেজ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘোরারও স্বাধীনতা নেই তার। মা জীবিত থাকলে হয়ত তারই মধ্যে কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যেত। দিব্যনারায়ণ হয়ত অতটা কড়া নজর রাখতেন না।

কিন্তু দেবিকারানীর মৃত্যুর পর দিব্যনারায়ণ তার দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন বেশি করে সচেতন হয়ে উঠলেন। মেয়ের হাঁটাচলা ঘোরাফেরা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকলেন।

সরস্বতী হাঁপিয়ে উঠছিল। বন্ধুদের কাছে রোম্যান্সের কথা শুনে সেও স্বপ্ন দেখত। সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু কল্পনা করত। দেবাশিসকে মনে হোল রূপকথার রাজপুত্র। দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে বলে যে হঠাৎ তার জীবনে উদয় হয়েছে।

সরস্বতী তার অতীত ভুলে গেল। চোখের সামনে আন্দোলিত হতে লাগল সুখী ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ছবি। সমস্ত বর্তমান সে সঁপে দিল তার জন্য। কোন খেদ, মনস্তাপ বা আত্মগ্লানি বোধ করল না তার জন্য। ভরা কোটালের মুখে টালমাটাল হয়ে বয়ে চলল তার জীবনতরী।

॥ নয় ॥

সরস্বতী তার হৃদয়দৌর্বল্যের কথা বাড়ির কাউকে জানাল না। নবলব্ধ ঐশ্বর্য সে অকৃপণভাবে ভোগ করতে লাগল। কলেজের ক্লাস কেটে দেবাশিসের সঙ্গে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে লাগল। তার সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াতে লাগল।

এসব কোন কিছুই টের পেলেন না দিব্যনারায়ণ। সরস্বতী আগের মতই বাড়ির গাড়িতে যাওয়া আসা করত।

তার বাল্যবিবাহের কথা অজানা নেই দেবাশিসের। প্রলয়ের বন্ধু সে। তাদের বাড়িও খুব দূরে নয়। দিব্যনারায়ণ নামী লোক। তার খবরাখবর লোকের অজানা থাকার কথা নয়। সরস্বতীর কাছে সে বাকিটুকু শুনলো। তার বিবাহজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আনুপূর্বিক নির্বিকার ভাবে শুনলো। সত্যকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করল, পিছু হটে আসল না।

দিব্যনারায়ণের সঙ্গে তার আগেই পরিচয় হয়েছে। প্রলয়ের বন্ধু হিসাবে ঘোষাল বাড়িতে যাওয়া আসা আছে তার। দিব্যনারায়ণকে ভয় পায় দেবাশিস। তার রাশভারী ব্যক্তিত্বের সামনে আড়ষ্ট বোধ করে। দিব্যনারায়ণের অহঙ্কার, দর্প ও মেজাজ সম্পর্কে ইতিমধ্যে তার ভালরকম ধারণা হয়ে গিয়েছে। প্রলয়ের কাছে, সরস্বতীর কাছেও অনেক কিছু শুনেছে। সে ঝুঁকি নিতে চাইত না। মোটামুটি সতর্ক থাকত, দিব্যনারায়ণ যেন তার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্কের কথা জানতে না পারেন। সরস্বতীকে যেন বিপাকে না পড়তে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে আসত সরস্বতী কলেজে। তার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও সহযোগিতা করত সে ব্যাপারে।

তাসত্ত্বেও, ধরা পড়ে গেল সরস্বতী বাড়ির ড্রাইভার শচীনের কাছে। অনেক দিনের পুরনো ড্রাইভার শচীন। ছোট বয়স থেকে দেখেছে সরস্বতীকে। সরস্বতীকে সে ধমক দিল। কিন্তু দিব্যনারায়ণকে কিছু জানালনা। মেজবাবুর মেজাজ তার জানা। জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তুলবেন। সরস্বতীরা তার সুযোগ গ্রহণ করল। তাদের প্রেমবিহার অব্যাহত রইল। তবে আগের থেকে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেল দুজনে।

দেবাশিসের সঙ্গে সরস্বতী বোটানিকাল গার্ডেনে যেত, চিড়িয়াখানায় যেত। আরও নানা জায়গায় নিয়ে যেত তাকে দেবাশিস। আড়ালে নির্জন জায়গায় সুযোগ বুঝে দেবাশিস তাকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত। তার সৌন্দর্যের স্তুতি করত, তার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে গলার প্রশংসা করত।

এত গুরুত্ব সরস্বতী এর আগে অন্য কারুর কাছে পায় নি। দেবাশিসের সান্নিধ্যে স্বপ্নের মত কেটে যেত মুহূর্তগুলো। তার মন ভরে যেত। জীবনের কাছে আর কোন চাহিদা ছিল না সরস্বতীর।

কিছুদিন পর দেবাশিসই অধৈর্য হয়ে উঠল। মাঝেমাঝেই সে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করত।

—এত কম সময় তোমাকে পাই, সরস্বতী, যে আমার মন ভরে না। আমার মনের শূন্যতা ঘোচে না। ইচ্ছা করে, তোমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাই। রাত্রি-দিন তোমায় জড়িয়ে থাকি।

সরস্বতীকে নির্বাক দেখে সে আরও দুঃসাহসী হয়। তার মনের গোপন ইচ্ছা অনাবৃত করে।

—এত অল্প পেয়ে কোন পুরুষমানুষের ভাল লাগতে পারে না। সরস্বতী, আরও ঘনিষ্ঠ করে তোমাকে পেতে ইচ্ছা করে আমার। ইচ্ছা হয়, দু'একদিনের জন্য কোথাও চলে যাই। শরীর মন জুড়িয়ে আসি।

সরস্বতী বিচলিত হয় না। তার আর কিছু চাইবার নেই। সে রোম্যান্স চেয়েছিল, প্রেম চেয়েছিল, একটি পুরুষের কাছে যথার্থ মূল্য চেয়েছিল, তার জীবনের বঞ্চনা ও দুঃখকে ভুলতে চেয়েছিল। ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে সেই ইচ্ছা। আর কত চাইবে সে? তার ভয় করে। এতেই সন্তুষ্ট সে। আরও বেশি চাইলে ঝড় উঠবে। সেই ঝড়ে তার মনের শান্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবে।

উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে পড়েছিল সরস্বতী। চারপাশে চেয়ে দেখেনি। কলেজে ছুটিছাটা থাকে। তখন দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সেই ফাঁক পূরণের জন্য চিঠি লিখতে হয়। দেবাশিস তাকে চিঠি দিত। সে তার জবাব দিত।

প্রিয়জনের সেই চিঠিগুলি মহার্ঘ্য সম্পদের মত নিজের টেবিলের দেরাজে রেখে দিত সরস্বতী। মাঝেমাঝে পড়া চিঠিগুলো দেরাজ থেকে বের করে আবার তারিয়ে তারিয়ে পড়ত।

নিজেকে নিয়ে সে এত মত্ত ছিল যে, অন্যদিকে চেয়ে দেখেনি। মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তার সরু সুতোয় ঝুলছিল। তাকে নিয়ে যে কেউ মাথা ঘামাতে পারে, তা তার কল্পনাতীত ছিল।

দিব্যনারায়ণ ব্যস্ত মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সেই ব্যস্ততায় ভাটা পড়েনি। কর্তৃত্বের রশি তার হাতে। কিন্তু পরিবারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানো তার স্বভাবে নেই। দাদারাও তথৈবচ। বৌদিদের নিজেদের সংসার রয়েছে। তারা স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

সরস্বতীর মনে কোনরকম দুশ্চিন্তা ছিল না। দেরাজে চাবি দেওয়ার কথা মনে ঠাঁই পায়নি তার। মা জীবিত থাকলে হয়ত সতর্ক হোত। অতএব পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, দুর্ভাবনামুক্ত ছিল সে।

সরস্বতীর অসতর্কতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল তার দুই বৌদি। সেজবৌদির ভূমিকা সে ব্যাপারে গৌণ। তার মেজবৌদিই সেজবৌদিকে প্রভাবিত করেছিল। তবে সরস্বতীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা।

তখন কলেজ ছুটি। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ দুজনের। দেবাশিস সরস্বতীর অদর্শনজনিত দুঃখ প্রকাশ করে অনুরোধ করল, অলকার বাড়িতে সামনের শুক্রবার বেলা দশটার সময় অতি অবশ্য যেন সে চলে আসে। অলকা সরস্বতীর স্কুলের বন্ধু। কলেজেও সে তার সহপাঠী। তার সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ করিয়ে দিয়েছে সরস্বতী। অলকা তাদের সাহায্য করে অনেক ব্যাপারেই।

চিঠিটা পড়ে সরস্বতী দেরাজে রেখে দিয়েছিল। যথারীতি খোলা ছিল দেরাজ। তার দুই বৌদি সেটি হস্তগত করে দিব্যনারায়ণকে দেখায়।

সরস্বতী ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি, তার বৌদিরা ঐ চিঠি গোপনে হস্তগত করে তার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে। নির্দিষ্ট দিনে সেজেগুজে তৈরি হয়ে যখন সে বেরোতে যাচ্ছে, তখন দিব্যনারায়ণ এসে উপস্থিত হলেন তার সামনে।

মেয়েকে স্থির দৃষ্টিতে ভাল করে লক্ষ্য করলেন তিনি। সরস্বতী অস্বস্তি বোধ করে। বাবা ব্যস্ত মানুষ। বিনা কারণে তার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু সেই কারণটি যে দেবাশিসের চিঠি সম্পর্কিত, তা সে আদৌ অনুমান করতে পারল না।

দিব্যনারায়ণ প্রথমেই আসল কথা ভাঙ্গলেন না।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে সরস্বতীর উদ্দেশ্যে আপাতসরল প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

—তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? কলেজ তো ছুটি!

সরস্বতী শঙ্কিত হয়। তার হাতে বেশি সময় নেই। অলকার বাড়ি একেবারে সামনে নয়। রিক্সা করে যেতে হয়। তৈরি হতে এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। কথোপকথনে আরও সময় নষ্ট হবে। কিন্তু বাবার সামনে অধৈর্য দেখালে হিতে বিপরীতই হবে। বাবার মেজাজ অজানা নয় তার।

মনের চঞ্চলতা যথাসাধ্য গোপন রেখে শান্তভাবে জবাব দিল সরস্বতী।

—আমার এক বন্ধুর বাড়ি। খুব দরকার। কয়েকটা নোট ওর কাছে থেকে নিয়ে আসব।

দিব্যনারায়ণ সরাসরি নাকচ করে দিলেন।

—তুমি যাবে না। আমার হুকুম।

সরস্বতী অসহায় বোধ করে! লাভ হবেনা জেনেও বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

—বাবা, আমার খুব দরকার। আমি বেশি দেরি করব না। একটু পরেই চলে আসব।

নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেন না দিব্যনারায়ণ। ফেটে পড়েন তিনি। সরস্বতীর সামনে দেবাশিসের লেখা চিঠিটা মেলে ধরেন।

—ভেবেছ কি তুমি? এই চিঠি লেখার সাহস হয় কি করে ঐ ছোঁড়ার? সকলের চোখে ধুলো দিয়ে যথেচ্ছাচার করে বেড়াবে? কেউ কিছু টের পাবে না, তাই না? আভা আর শিপ্রা যদি চিঠিটা না দেখাত, আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বেয়াদব মেয়ে। এজন্য আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি? শোন, আমার সাফ কথা—আমি চাইনা, ঐ স্কাউন্ড্রেলটা তোমার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখে। যদি শুনি, এরপরও তুমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছ, তাহলে তোমার কলেজ যাওয়া বন্ধ হবে। বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হবে। এসব লীলাখেলা করার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে তোমাকে নিয়ে আসা হয়নি। আমার মুখে আর কত চুনকালি মাখাবে? কি আছে ঐ স্কাউন্ড্রেলটার? এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তোমার রুচি এত খারাপ হোল কি করে? ছোট জাত, ব্যক্তিত্বহীন, অপদার্থ! ভাল করে লোকের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারে না যে—বেহদ্দ আনস্মার্ট—তিন তিনবার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করেছে—ঐ তো সাধারণ একটা চাকরি করে—কি দেখেছ তুমি ওর মধ্যে? বংশ, মানমর্যাদা—কোন কিছু ভেবে দেখলে না?

দিব্যনারায়ণ আর দাঁড়ালেন না। তাঁর কর্তৃত্বের ওজন সম্পর্কে তিনি সচেতন। মেয়েকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার সুযোগ দিলে সেখানে ঘাটতি পড়তে পারে। তিনি এ বাড়ির সর্বেসর্বা কর্তা। তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের সাধ্য এ বাড়ির কারুর নেই। সরস্বতী তো পুঁচকে মেয়ে।

দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে সরস্বতীর বুকের মধ্যে হাপরের ওঠানামা সুরু হয়। বৌদিদের বিশ্বাসঘাতকতার বহর দেখে সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার বৌদিরা যদি তাকে ডেকে দুটো কথা শোনাত, কিংবা তাকে তিরস্কার করত, তাহলেও বুঝি তার এতটা লাগত না। সেজবৌদিও যে মেজবৌদির সঙ্গে যোগ দেবে, তা যেন কল্পনাতীত। অবশ্য ব্যক্তিত্বহীন সেজবৌদিকে মেজবৌদি যেমন বোঝাবে, সে তেমনই বুঝবে।

সরস্বতী ভাবল, এই বাড়িতে কাদের কাছে সে পড়ে রয়েছে? এরা কি তার আপনজন? আপনজন হলে এভাবে তাকে অপদস্থ করতে পারত?

দিব্যনারায়ণের ওপরও তার রাগ হোল। মাতৃহারা মেয়েকে এমন নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করতে তাঁর বাধলনা? সে এমন কি অন্যায়টা করেছে? বাল্যবয়সে তাকে অযোগ্য পাত্রের হাতে সমর্পণ করে তিনি কত বড় অন্যায় করেছেন, তা কি তিনি বোঝেন না?

মৃতা মায়ের ওপরও রাগ হোল: ঐ বিয়েতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন মা-ই। একরকম তিনিই জোর করে বিয়েটা দিয়েছিলেন। দিব্যনারায়ণ প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু তিনি তো অপরের কথা শুনে চলার মানুষ নন? কি দরকার ছিল তাঁর মায়ের কথামত চলার? সরস্বতীর পরমায়ুবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন বাবা মা তাকে গোত্রান্তরিত করে।

সরস্বতীর মুখে বিদ্রূপের হাসি ঝলসে উঠল। পরমায়ু বৃদ্ধি! এই যে তিলে তিলে সে কষ্ট পাচ্ছে, তাতে কি পরমায়ু বৃদ্ধি হচ্ছে? তার মনের ভেতরটা কি কেউ দেখছে?

তার বাবা নরম হবেন না। একবার যখন সবকিছু জেনেছেন, তখন কড়া

হাতে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন। তার ওপর নজরদারী চলবে সর্বদা। দেবাশিসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবারের কয়েকজন জল্লাদ একযোগে তার সুখশান্তি আনন্দের ওপর চরম খাড়ার ঘা হানবে।

সরস্বতী তা হতে দেবে না। এখন সে আগের মত ছোটটি নেই। নির্বিচারে গুরুজনের নির্দেশ মেনে নিজের সুখশান্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেবেনা। নিজের ভাগ্য সে নিজে জয় করবে।

দেবাশিসকে বাদ দিলে জীবন অর্থহীন। দেবাশিস এখন তার কাছে অপরিহার্য। এ বাড়িতে থাকা খাওয়ার সুখ আছে, অর্থের প্রাচুর্য আছে, আর কিছু নেই। তার জন্য কারুর মনে মায়া মমতা ভালবাসা নেই। সে এখানে থাকবে না।

সরস্বতী মনস্থির করে ফেলল। একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। সকলের চোখ এড়িয়ে বাড়ির পেছনে বাগানের রাস্তা ধরে চলে এল বড় রাস্তায়। সামনেই পেয়ে গেল চেনা রিক্সাওয়ালা বুধনকে।

অলকার বাড়ি এসে সরস্বতী দেখে, দেবাশিস আগেই পেঁৗছে গেছে।

দেবাশিস অনুযোগ করে।

—এত দেরি করলে? আমি অনেকক্ষণ বসে আছি।

সরস্বতী সবকিছু খুলে বলে। গোপন করেনা কোন কিছু।

কিন্তু দেবাশিসের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে গেল সরস্বতী। দেবাশিসের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ত্রাস আর বিরক্তি।

—তুমি করেছ কি? বাবার অমতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ? উচিত কাজ করোনি। একটু ভেবেচিন্তে তো কাজ করবে।

সরস্বতীর মন খারাপ হয়ে গেল। দেবাশিস যে তাকে এভাবে তিরস্কার করবে তা সে ভাবেনি। অলকার সামনে নিজেকে বেইজ্জত লাগছিল। তবু চেষ্টা করে আত্মসংবরণ করে।

রসিকতা করে নিজের অপমানে প্রলেপ দিতে চেষ্টা করে সরস্বতী।

—আর কিছু ভাবার নেই। এখন থেকে সব ভাবনা তোমার।

দেবাশিস প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

—বলছ কি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? শোন, যা করেছ, করেছ। আর পাগলামি করো না। বাড়ি ফিরে যাও। এরকম হঠকারিতাবশে কিছু করা ঠিক না।

সরস্বতীর বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল অসহায় কান্না। পিতৃগৃহের নিরাপত্তা ছেড়ে এসেছে সে কার ভরসায়? যে মানুষটা নিজেই ভয়ে কেঁচো, সে অপর এক মানুষের ভয় ভাঙাবে কি করে?

কিন্তু সে কি করবে? পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় নেই তার। সব সম্ভাবনা শেষ করে এসেছে সে। তার বাবা মেয়ের অবাধ্যতা বরদাস্ত করবেন না।

যে কোন চরম দণ্ড দিতে তার হাত কাঁপবে না। সরস্বতী ভাল করেই জানে তা।

দেবাশিসও দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছে। তার এখন করণীয় কি?

অলকাও দেবাশিসের সঙ্গে একমত হোল।

—তুই ঠিক কাজ করিসনি, সরস্বতী। এখনও সময় আছে। আমার মনে হয়, তোর বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। আমাদেরও বিপদ হতে পারে। তোর বাবা যথেষ্ট প্রভাবশালী মানুষ। উনি যদি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তার ফল কি ভাল দাঁড়াবে? আমার বাড়ির লোকে কি তখন ছেড়ে কথা কইবে আমায়?

সরস্বতী মিইয়ে গেল। এতসব ভেবে দেখেনি সে। দিব্যনারায়ণের আদেশ শুনে দু'চোখে অন্ধকার দেখেছিল। দেবাশিসের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা চিন্তা করে শুভাশুভবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। সে ভেবেছিল, ভয়াল ভবিষ্যতকে ঠেকাবার জন্য বড় ঝুঁকি নেবে।

তা সে নিয়েছে। বাড়ি থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু যে মহামূল্যবান দুর্লভ ভালবাসা ছিল তার অভীষ্ট, তা কি শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মরীচিকায় পর্যবসিত হবে?

অপরাধের ভারে প্রায় নুইয়ে পড়ে সরস্বতী।

—আমার আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, অলকা। ফিরে গেলে বাবা আমায় আস্ত রাখবেন না। প্রয়োজনে বন্দুক চালাতেও হাত কাঁপবে না তার। তবে তোর কোন ক্ষতি হয়, তা আমি চাইনা। আজকের দিনটা থেকে কাল খুব ভোরে চলে যাব আমি আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ি।

দেবাশিস অপ্রতিভ বোধ করে। সরস্বতীর খোঁচা না বোঝার মত নির্বোধ নয় সে। সরস্বতীকে তার ওভাবে বলা ঠিক হয়নি।

আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে সে।

—হাঁ, অলকা। আজকের দিনটা সরস্বতী তোমার এখানে থাকুক। কাল ভোরবেলা আমি এসে ওকে নিয়ে যাব। ও যেখানে যেতে চায়, সেখানে পৌঁছে দেব।

সরস্বতী বুঝতে পারল, অলকা বা দেবাশিস কেউই স্বস্তি বোধ করছেনা। বাড়ি থেকে এভাবে বেরিয়ে এসে তাদের চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে সে। সরস্বতী অনুভব করল, সে বড় হঠকারী কাজ করেছে।

পরদিন খুব ভোরে দেবাশিস তাকে নিতে এল। রাত থাকতেই উঠে পড়েছিল সরস্বতী। তৈরি হয়ে নিয়েছিল। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ভাল করে ঘুম হয়নি তার সারারাত। পাশে শুয়ে বুঝতে পারছিল, অলকার অবস্থাও তথৈবচ। বাড়ির লোকের কাছে অলকা আসল কথাটা ফাঁস করেনি। সেটা তার পক্ষে কিছুটা স্বস্তিকর হয়েছিল। নাহলে লজ্জা রাখার জায়গা থাকত না।

একদিনেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হোল সরস্বতী। শ্বশুরবাড়ির তিক্ত

অভিজ্ঞতা তাকে এতখানি বিচলিত করেনি। নিজেকে নিরাশ্রয় ভাবেনি সে তখন। বরং শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবেনা ভেবে খুশিই হয়েছিল। সে জানত, বাপের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবারের অভিজ্ঞতা অন্য রকমের। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গভীর খাদ তার সামনে। রুক্ষ কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরস্বতীর এক বিচিত্র উপলব্ধি হোল। নবদৃষ্টি লাভ করে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সে জীবনের দিকে। নতুনভাবে মূল্যায়ন করল জাগতিক অভিজ্ঞতার।

সরস্বতী ভাবল, জীবন এক দুরারোহ পর্বত। সেই পর্বতে আরোহণ বড় সহজসাধ্য নয়। প্রতি মুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি। একটু অসাবধান হলেই গভীর খাদে পতনের সম্ভাবনা।

কিন্তু সরস্বতী বাঁচতে চায়। নতুনভাবে জীবনকে আস্বাদন করতে চায়। ভাগ্য তাকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দিয়েছে। সে লড়ে যাবে। সর্বাত্মক, প্রাণপণ লড়াই।

আত্মীয়স্বজনের কাছে সে আশ্রয় পাবেনা। প্রতাপশালী বাবার বিরুদ্ধে তাকে আশ্রয় দিয়ে তার বাবার কোপদৃষ্টিতে পড়তে চাইবে না কেউ। সরস্বতী তাই ভাবল মায়ার কথা। মায়া তার দীর্ঘকালের বন্ধু। কলেজেও তার সহপাঠী। সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।

মায়ার দীনদরিদ্র অবস্থা। অনেকগুলি ভাইবোন। কায়ক্লেশে দিন গুজরান হয় তাদের। একদিন মায়ার সঙ্গে দুপুরবেলায় নাকতলার বাড়ি গিয়েছিল সরস্বতী। তার ভাইবোনেরা তখন খেতে বসেছিল। তাদের পাতে মোটা লাল চালের ভাত আর জলের মত পাতলা ডাল দেখে সরস্বতী অবাক হয়ে গিয়েছিল। অত নিকৃষ্ট মানের খাবার কি করে তারা মুখে তুলছিল, সে ভেবে পায়নি। তাদের সংসারের দারিদ্র্য যেন মুখব্যাদান করে গিলে খেতে এসেছিল তাকে। পরে মায়ার মা বাবা আর ভাইবোনেদের আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে তার অস্বস্তি কেটে গিয়েছিল। সেই দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছিল সরস্বতী।

মায়ার এক পাতানো মাসী আছেন। আগে মায়াদের পাড়ায় থাকতেন তিনি। পরে পার্ক সার্কাসে বাড়ি করে চলে গেছেন। তবে মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত রয়েছে তাদের।

মায়ার পাতানো মেশোমশায়টি আশ্চর্য মানুষ। বিলাতফেরৎ প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। যথেষ্ট ভাল পশার তার। বাড়িতে নার্সিং হোম খুলেছেন। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই স্থায়ীভাবে লণ্ডনে বসবাস করছে। বিশাল বাড়িতে ঠাকুর চাকর বাদে প্রাণী বলতে দু'জন—মাসীমা আর মেশোমশায়।

নার্সিং হোমটি ভদ্রলোকের প্রাণ। অনেক দুঃস্থ দরিদ্র মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন মায়ার মেশোমশায়। তাদের নার্সিং শিখিয়েছেন। কোন কোন মেয়েকে

বিলাতেও পাঠিয়েছেন। তার ধ্যানজ্ঞান হোল, নার্সিং হোমটিকে আরও বড় করে তুলবেন।

মায়াকে তিনি দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। মায়াদের আর্থিক অনটন দেখে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। মায়ার বাবা মা রাজী হননি। তবে মায়া প্রায়ই পাতানো মাসীর বাড়ি এসে থাকে। তার ভরণপোষণের অনেকটাই ব্যয় করেন 'মেশোমশায়। তার ইচ্ছা, মায়াকেও তিনি ভবিষ্যতে নার্সিং হোমের সঙ্গে যুক্ত করবেন।

মেশোমশায়ের সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছিল সরস্বতী মায়ার কাছে। তার ধনৈশ্চর্য ও হৃদয়বত্তার কথা অজানা ছিল না সরস্বতীর। মেশোমশায়ের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল তাকে মায়া। সেই কারণেই বিপদের মুহূর্তে মেশোমশায়ের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সরস্বতীর মনে হোল, মায়ার কাছে সে এতদিন যা শুনেছে, তাতে তাকে ঐ হৃদয়বান মানুষটি আশ্রয় দেবেন না, তা হতে পারে না।

সরস্বতীর অনুমান যথার্থ প্রমাণিত হোল। তার কাছে সব শুনে মায়ার মেশোমশায় তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সরস্বতীর হঠকারিতার জন্য কোন রকম তিরস্কার করলেন না। সরস্বতী অভিভূত হয়ে গেল। অলকা ও দেবাশিসের কাছে অন্য রকমের ব্যবহার পেয়ে তার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

মায়ার মেশোমশায় সব শুনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, তিনি সরস্বতীর ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করবেন। সরস্বতী তার কন্যাতুল্য। সে পিতৃগৃহ ছেড়ে এসেছে বলে নিজেকে যেন নিরাশ্রয় মনে না করে। তার ইচ্ছামত তাকে পড়াবেন। যদি সে বিলাত যেতে চায়, তিনি তার সুযোগ করে দেবেন। তার কোন রকম অসুবিধা হবে না এখানে।

মায়ার মাসীও মানুষ খারাপ না। স্বামীর মতই তার মত। এদের দেখে সরস্বতী বিস্মিত হোল। এমন মানুষও থাকে আজকের পৃথিবীতে।

দেবাশিস তাকে পার্ক সার্কাসে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিল। তার জরুরী কাজ ছিল। মেশোমশায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে ওঠেনি।

সরস্বতী মেশোমশায়কে অকপটে তার সব কথা জানাল। তার বাল্যবিবাহ, শ্বশুরবাড়ির তিক্ত অভিজ্ঞতা, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন, দেবাশিসের সঙ্গে মেলামেশা, কোন কিছুই গোপন করল না। সব শুনে তার কোন ভাবান্তর হোল না দেখে সরস্বতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। শান্তভাবে শুনে গেলেন তিনি।

প্রথম দিন সে প্রেম করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, তার বাবা রক্ষণশীল, তিনি জাত মানেন, বেজাতে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই মেনে নেবেন না—এ পর্যন্তই শুনেছিলেন। পরে যখন আনুপূর্বিক তার কাহিনী তার সামনে মেলে ধরল সরস্বতী, তখনও যে তিনি ওরকম নির্বিকার থাকবেন, তা ধারণাই করতে পারেনি সে।

তিনি একটি প্রশ্ন করলেন সরস্বতীকে। রীতিমত্তো চমকে গেল সরস্বতী তা শুনে।

—দেখ মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। যার জন্য বাড়িঘর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরামবিরাম, নিরাপত্তা ছেড়েছুড়ে এসেছ, সে তোমাকে কতটা ভালবাসে, তা কি কখনও যাচাই করে নিয়েছ?

সরস্বতী হকচকিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্ন। সে কি জবাব দেবে, বুঝতে পারলনা। ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে কেমন এক ছন্দপতন ঘটেছিল। দেবাশিসের ব্যবহারে মনের মধ্যে জট তৈরি হয়েছিল।

মেশোমশায়ের প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে দেবাশিসের সপক্ষে কিছু বলতে পারল না। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে রইল সরস্বতী মেশোমশায়ের দিকে।

মেশোমশায় তাকে অভয় দিলেন।

—শোন মা, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি ভাবছ, আমি ছলছুতো করে দেবাশিসের সঙ্গে তোমার মেলামেশা বন্ধ করতে চাইছি? তা নয়, মা। আমি ছেলেটির সঙ্গে একবার কথা বলব। তুমি এত ঝুঁকি নিয়ে এভাবে পথে বেরিয়ে পড়েছ যার ভরসায়, তাকে একবার দেখব না? তার সঙ্গে কথা বলব না? তার মনোভাব বুঝে নেব না? তোমার বয়স অল্প। জীবন সম্বন্ধে কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা? যা হবার, হয়ে গিয়েছে। তার তো আর অন্যথা হবে না? কিন্তু আরও বেশি বিপদের দিকে যাতে তুমি এগিয়ে না যাও, তার জন্যই আমি তোমাদের ব্যাপারটা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে চাইছি। তুমি দেবাশিসকে বলো, আমি তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

সরস্বতীর বুকের মধ্যে কেবলই ধুকপুক করছিল একটা অজানা ভয়, আতঙ্ক। সে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলনা। মেশোমশায়ের বাড়িতে সে আশ্রয়প্রার্থী। এই আশ্রয় হারালে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মেশোমশায়ের নির্দেশ অমান্য করে কি করে?

দেবাশিসকে সে জানালো, মেশোমশায় তার সঙ্গে কথা বলতে চান। তার একান্ত অনুরোধে দেবাশিস এলো মেশোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মেশোমশায় তার সঙ্গে একান্তে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দুরুদুরু বুকে সরস্বতীকে সরে যেতে হোল অন্যত্র।

মেশোমশায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেবাশিসের পড়াশোনা, চাকরি ও পরিবার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিলেন। পরে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে শান্ত সুরে প্রশ্ন করেন।

—সরস্বতী তো তোমার ভরসায় সব ছেড়ে ছুড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। এখন তুমি কি করবে ভাবছ? আমার মনে হয়, তোমার এখন ওকে বিয়ে করা উচিত। তাহলে আর ওকে এভাবে পথে পথে ভেসে বেড়াতে হয়না।

দেবাশিস যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—বিয়ে? তা কি করে সম্ভব? আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় কোনমতেই। আমার বাবা কিছুতেই মেনে নেবেন না এ বিয়ে। উনি হার্টের রোগী। সরস্বতী

আমাদের পালটি ঘর নয়। আমি ওকে বিয়ে করলে উনি দুঃখ পাবেন। উনি সেই আঘাত সহ্য করতে পারবেননা। ঠিক হার্টফেল করবেন।

মেশোমশাই অবাক হয়ে গেলেন। তার ধনুকের মত উঁচিয়ে ওঠা প্রশ্নের মধ্যে ধরা পড়ল সেই বিস্ময়।

—বলছ কি তুমি, দেবাশিস? সরস্বতীকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না? অথচ মেয়েটা তোমার জন্য বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন, ধনৈশ্চর্য, নিরাপত্তা, সব ত্যাগ করে পথে নেমে এসেছে। আর তুমি বলছ, তোমার বাবা হার্টফেল করবেন? সরস্বতী তার বাবার একমাত্র কন্যা। তার বাবা যদি হার্টফেল না করে থাকেন, তাহলে তোমার বাবাও হার্টফেল করবেন না। তোমরা তো ছয় ভাই। এক ছেলে যদি ওঁর অমতেই বিয়ে করে, তাহলে ওঁর পক্ষে সেটা খুব গুরুতর আঘাত না হওয়ারই কথা। ওঁর যদি এ বিয়েতে অমত থাকে, তাহলে তুমিও সরস্বতীর মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে।

দেবাশিস বিরক্ত হোল।

—আমি তা পারি না, মেশোমশায়। বাবার মনে দুঃখ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না আমি।

মেশোমশাই নাছোড়বান্দা।

—কিন্তু সরস্বতী তো পেরেছে। ও তো তোমার জন্যই সব ছেড়ে এসেছে।

দেবাশিস রুষ্ট হয়।

—ও তা ঠিক করেনি, মেশোমশায়। আমি ওকে বলেছি, এরকম ঝুঁকি নেওয়া ওর উচিত হয়নি। হাজার হোক, ও মেয়ে। পরিণামের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল ওর।

মেশোমশায় ছোট্ট করে হাসেন।

—তবেই বোঝ। ও মেয়ে হয়ে এতটা ঝুঁকি নিল, আর তুমি পুরুষ হয়েও সাহস পাচ্ছনা ওকে বিয়ে করতে।

দেবাশিস উত্তেজিত হয়।

—আপনি কি জানেন, সরস্বতীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল? ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ বলে গণ্য হবে। আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব, ওকে এখন বিয়ে করা?

মেশোমশায় দমলেন না। মুখে হাসিটি জীইয়ে রেখে দেবাশিসকে বরাভয় দিলেন।

—মায়ার কাছে, পরে সরস্বতীর কাছে আমি সব শুনেছি। কে বলেছে, আমি জানিনা সরস্বতীর প্রথম বিয়ের কথা? আর, ওকে কি বিয়ে বলে? নয় দশ বছর বয়সে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই ধরে বেঁধে একটা অপদার্থ লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে দিল বাড়ির লোকে। বয়সেও শুনেছি, অনেকটাই বড় ওর থেকে। ওটা তো বিয়েই নয়। সরস্বতীর সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক তৈরি হয়নি। দু'বছরের মধ্যে সব

সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার চলে এসেছে ও শ্বশুরবাড়ি থেকে। এ বিয়ে নাকচ করা কোন ব্যাপারই নয়। ডিভোর্স পেতে অসুবিধা হবে না ওর। সে চেষ্টা আমি করব। কিন্তু যতদিন সেটা না হচ্ছে, ততদিন আমার মতে, তোমাদের মেলামেশাটা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা উচিত।

দেবাশিস হতচকিত হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন।

—আমাকে কসাই মনে হচ্ছে তো? দেখ, তোমাদের ভালর জন্যেই বলছি। জান তো, সবুরে মেওয়া ফলে?

সরস্বতীকে ডেকে পাঠালেন তিনি। দেবাশিসের সামনেই তার ফতোয়া জারী করলেন।

—শোন মা, দেবাশিসের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে আমার। এক বছর তোমরা দুজনে দুজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেনা। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এটুকু সংযম পালন করবে তোমরা, এই আমার অনুরোধ। এক বছর পরে আবার তোমরা আগের মত মেলামেশা করতে পারবে।

সরস্বতীকে পরে তিনি তার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

—ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে আমি ওর মনোভাব বুঝলাম না। আমার মনে হয়, এক বছর দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ রাখলে ওর প্রকৃত মনোভাব কি, তা বোঝা যাবে। তোমার প্রতি ওর যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তাহলে সে ভালবাসা এক বছর পরেও সমান তীব্র থাকবে। আর যদি তা কেবলমাত্র মোহ হয়, তাহলে ছেলেটির সংস্রব ত্যাগ করবে তুমি। তাতেই তোমার মঙ্গল।

সরস্বতী বা দেবাশিস, কেউই প্রকাশ্যে সেই নির্দেশের বিরোধিতা করলনা। কিন্তু তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা উন্মোদনার ঢল দু'জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কেউই সেই নির্দেশ মেনে চলল না। আগের মতই অব্যাহত রইল তাদের দেখাসাক্ষাৎ, ঘুরে বেড়ানো।

বেশিদিন সেই লুকোচুরি গোপন রইলনা। তারা দুজনেই একদিন ধরা পড়ে গেল মেশোমশায়ের কাছে। মেশোমশাই তার অসন্তোষ গোপন করলেন না। বাড়ি ফিরে সরস্বতীর কাছে সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

—তুমি আমার সামান্য একটা অনুরোধও রাখতে পারলেনা? মাত্র একটা বছর দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম। সেটা রক্ষা করা তোমাদের কাছে এতখানি অসম্ভব ঠেকল? আমি তোমাকে আমার বাড়িতে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছি। তোমার হিতাকাঙ্খী হিসাবেই বলেছিলাম, ছেলেটিকে তোমার পরখ করে দেখা উচিত। তোমার তা পছন্দ হোলনা? এমন হলে তো আমার বাড়িতে থাকা চলে না।

সরস্বতী নতমস্তকে মেনে নিল মেশোমশায়ের ভৎর্সনা। আত্মদোষ স্কালনের জন্য ওজর অজুহাতের আশ্রয় নিল না সে। রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদও জানাল না।

কিন্তু মনস্থির করে ফেলল, এ বাড়ির পাততাড়ি গুটোবে। আবার 'চল মুসাফির' বলে পথে বেরিয়ে পড়বে। খুঁজে নেবে নতুন আশ্রয়।

যেদিন রাত্রেই মায়ার সঙ্গে কথা হোল তার। সরস্বতী আসার পর থেকে মায়া একরকম এখানেই থাকছে। মাঝে একবার দু'বার বাড়ি ঘুরে এসেছে। দুই সখী এক ঘরে দুটি খাটে শোয়। তাদের জন্য রয়েছে একটি আলমারী ও একটি ড্রেসিং টেবিল।

মায়া সরস্বতীকে বোঝাল।

—মেশোমশাই তোকে সত্যি সত্যি কি আর বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন? উনি তেমন মানুষই না। রাগের মাথায় বলে ফেলেছেন। আসলে দুঃখ পেয়েছেন তো!

সরস্বতী মেনে নিল।

—আমি জানি, উনি সত্যি সত্যি আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন নি। এই এক মাস পরম আদরে রয়েছি ওঁর কাছে। উনি আমাকে শাড়ি ব্লাউজ, জুতো কিনে দিয়েছেন। প্রসাধনের জিনিষ কিনে দিয়েছেন। বলেছেন, যতদিন ইচ্ছা, আমি এবাড়ি থাকতে পারি। যতদূর ইচ্ছা, পড়াশোনা করতে পারি। বলেছেন যদি ভবিষ্যতে বিলেত যেতে চাই, তাহলে উনি তারও ব্যবস্থা করে দেবেন। এমন মানুষ আজকাল সত্যিই দুর্লভ। তবু আমি এখানে আর থাকতে পারব না। আমি তো সত্যিই ওর নির্দেশ মেনে চলিনি। আমি জানি উনি আমার ভালই চান। কিন্তু আমার পক্ষে ওঁর নির্দেশ মেনে দেবাশিসের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

মাসিমা মেশোমশাইও তাকে অনেক বোঝালেন। মেশোমশাই রীতিমত ক্ষুব্ধ হলেন।

—তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ, মা। আমি তোমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলিনি। তুমি এখনও ভেবে দেখ। ভবিষ্যতের কথাটা চিন্তা কর। হঠকারিতাবশে কিছু করোনা। আমার বাড়িতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের ছেলে মেয়ে বিদেশে রয়েছে। মায়ার মত তুমিও আমাদের এখানে মেয়ের মতই থাকবে।

সরস্বতী তার সিদ্ধান্তে অবিচল। শান্তভাবে মাথা নাড়ে সে।

—না, মেশোমশাই। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি চলে যাব। আপনার ওপর রাগের কথা বলছেন? আমি কেন রাগ করব? অন্যায় করেছি আমি। আপনার কথা শুনিনি, আপনার অবাধ্য হয়েছি। আপনি আমাকে তিরস্কার করতেই পারেন। তার জন্য আমি কিছু মনে করিনি। আমি এখানে কম আদর যত্ন পাইনি। এই একমাস বাড়িছাড়া রয়েছি। তার জন্য এতটুকু কষ্টও টের পাই নি। তবু আমি আর থাকতে পারব না। আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। আমায় ক্ষমা করুন।

অনেক বোঝালেন তাকে মেশোমশাই। তবুও তাকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

মেশোমশাইয়ের নার্সিং হোমে গিরিজা মণ্ডল নামে একটি নার্স কাজ করে। মায়ার অনুরোধে সরস্বতীকে সে তার বাড়িতে থাকতে দিতে রাজী হোল। পার্ক-সার্কাসের কলাবাগান বস্তীতে একটি ঘর ভাড়া করে থাকে গিরিজা। সঙ্গে থাকে তার বোন। সরস্বতীকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করল তারা তাদের সেই অপরিসর ছোট ঘরে।

অভাবের সংসারের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় ঘটল সরস্বতীর। মায়াদের নাকতলার বাড়িতে গিয়ে একদিন তাদের আহার্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। কিন্তু দরিদ্রের সংসারের প্রাত্যহিক সমস্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটল তার গিরিজাদের সংসারে। অভাব অনটনের যে দিকটার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, তার এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ চেহারার সঙ্গে পরিচয় সেই প্রথম তার।

চাঁদের অপর পিঠের মত সেই অতিবাস্তব, অ-রোম্যাণ্টিক সত্য তাকে আঘাত দিল বটে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারলনা সরস্বতী কোন মতেই।

।। দশ ।।

কলাবাগান বস্তীতে হ য ব র ল পাঁচমিশালী বাসিন্দা। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অতি দরিদ্র লোকজনের বাস সেখানে। তবু সরস্বতীর ভালই কেটে যায়। তার সম্পর্কে কারুর মনেই কোন অকারণ কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা না দেখে সরস্বতী যেমন নিশ্চিন্ত হোল, তেমনই বিস্মিত হোল। দরিদ্র মানুষজন অধ্যুষিত বস্তীর জঘন্য পরিবেশ সম্বন্ধে তার মনে যে ভাসাভাসা ছবি ছিল, তা পুরোপুরি মিলল না।

গিরিজাদের ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটিও তাকে কম বিস্মিত করল না। অর্থের অভাব যে সব সময়ে সুরুচি ও শোভনতার পরিপন্থী হয়না, তার চাক্ষুষ প্রমাণ মিলল এখানে এসে। চিৎকার চেঁচামেচি, অসভ্যতা বা নোংরামীর কোন নিদর্শন তার চোখে পড়ল না। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মতই এদের চালচলন, আচার ব্যবহার।

গিরিজাদের বাড়িতে নবাগতা মেয়েটিকে কোন পুরুষালী অসভ্যতা বা বর্বরতার সম্মুখীণ হতে হোল না। সরস্বতী তাই কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি বোধ করল না।

অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে গিরিজা ও তার বোন অতিথিকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতে পারল না বটে, কিন্তু আন্তরিকতায়, পরিচ্ছন্নতায় ও নম্র মাধুর্যে সরস্বতীর

মন জয় করে নিল তারা। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ও অপরিচিত কোন বিপন্ন আশ্রয়-প্রার্থী মানুষকে এমন দ্বিধাহীন প্রসন্ন আতিথেয়তা দিয়ে যারা আবাহন জানাতে পারে, তাদের সম্পর্কে বিচিত্র মিশ্র আবেগের বুড়বুড়ি ওঠে সরস্বতীর মনে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা ঠেলে সরিয়ে উঁকি দেয় এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় কিশোরীর মুখ—সে বোহিমেবী উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—'কি আনন্দ! জীবনের স্রোতের মুখে এখানে না ভিড়লে কি এসব দেখতে পেতাম? জীবনকে কি ভাল করে জানতে পারতাম? অভিজাত ধনী পরিবারের চারদেয়ালের গণ্ডীর বাইরে জীবনের এই বহুবিচিত্র রূপটি কি দেখতে পেতাম?'

দেবাশিসের সঙ্গে নিয়ম করে দেখাসাক্ষাৎ হোত। দেবাশিস তার জন্য ভাল আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে দেবাশিসের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সরস্বতী মনমরা, বিমর্ষ বোধ করেছিল। এখন তার অন্য চেহারা, অন্য প্রকাশ দেখে সরস্বতীর মনেই ধন্দ জাগে। মনে হয়, মানুষটার সম্পর্কে তার রায় অভ্রান্ত ছিল না।

দেবাশিস এখন অহর্নিশ তার কথা ভাবে। তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার উপায় খোঁজে। সরস্বতীর সব দায়দায়িত্ব এখন যেন তার ওপরেই বর্তেছে। সরস্বতীও তার ওপরে নির্ভর করতে পেরে বেঁচে গেছে।

গিরিজাদের আশ্রয়ে ভালই কাটছিল তার দিন। সে যেন ভুলেই গিয়েছিল, এখানকার আশ্রয় চিরদিনের জন্য নয়। যথাসময়ে সাময়িক এই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে।

দেবাশিস নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। কিন্তু তার কতগুলি অসুবিধা আছে। ছুটির দিনে সে কলকাতায় আসে। খুঁটিবাঁধা গরুর মতো সপ্তাহের অন্য দিন-গুলো। কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজন পড়ল সরস্বতীর জন্য নতুন আশ্রয় খোঁজার।

মাস শেষ হতে আর দু'দিন বাকি। একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছে সরস্বতীর। মুখ হাত ধুতে বাইরে আসছিল সে। এমন সময় তার কানে এল গিরিজা আর নীরজার ফিসফিস করে বলা কথাগুলো। তাদের ঘরে চাল বাড়ন্ত। হাতে পয়সা নেই। অতিথিকে অভুক্ত রাখা যায় না। একটি হলেও কোন ব্যঞ্জন রান্না করে দিতে হবে ভাতের সঙ্গে। কিন্তু উপায় কি?

তাদের সকাতর বক্তব্য কানে যেতে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল সরস্বতী! এতদিন ধরে এই দরিদ্র পরিবারের অন্নধ্বংস করে চলেছে সে। একটি পয়সাও ছোঁয়ায়নি তার জন্য। এদের কি করে চলছে, তা সে ভেবেও দেখেনি। নিজেকে ধিক্কার দিল সরস্বতী। সে অমানুষ, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। তার নিজের প্রয়োজন মিটেছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিরিজারা কত মূল্য ধরে দিচ্ছে, তা ভাবেনি।

মুখে কিছু প্রকাশ করল না সে। গিরিজাদের বুঝতেই দিল না যে কথাগুলো তার কানে এসেছে। কলতলা থেকে মুখ হাত ধুয়ে গিরিজাদের কাছে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করল।

—আমার সঙ্গে কেউ একটু দোকানে যাবে?

গিরিজা অবাক হোল।

– কেন বল তো? কিছু কিনবে?

সরস্বতী মজা করল।

– কেন, আমি কিছু কিনতে পারি না?

গিরিজা লজ্জা পেল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

—আরে, আমি সে ভেবে বলিনি। চল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কিনবেটা কি? সেটা না জানলে তোমাকে ঠিক দোকানে নিয়ে যাব কি করে?

সরস্বতী রহস্য ভাঙল না।

—আগে চল তো! পরে বলছি।

গিরিজার সঙ্গে একটা গয়নার দোকানে উপস্থিত হোল সরস্বতী। তার হাতে খালি সোনার চারগাছা করে চুড়ি ছিল। দুটি চুড়ি খুলে সরস্বতী ওজন করতে বলল দোকানদারকে। পরে তার দাম কত হবে জিজ্ঞাসা করে সেটি বিক্রি করল সেখানে।

গিরিজা হতভম্ব হয়ে গেল। সে মুখে বাধা দেবার চেষ্টাও করল। সরস্বতী তাকে থামিয়ে দিল। দোকান থেকে বেরিয়ে সরস্বতী চাল, ডাল ও আনাজপাতি কিনল।

গিরিজার তীব্র প্রতিবাদ কানে না নিয়ে সে আত্মমগ্ন বিষণ্ণতার ঘোরে কেবলি এক কথা বলে যেতে লাগল।

—আমি তোমাদের নিজের জনের মত এখানে রয়েছি। তোমরা আমাকে পর মনে করছ কেন?

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দেবাশিসের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা। দেবাশিসকে দেখামাত্র সরস্বতী প্রথম যে কথা বলল, তা হোল—'তুমি শিগ্রি আমার জন্য একটা হোস্টেল দেখ। গিরিজাদের কাছে থাকা আর ভাল দেখায় না।' দেবাশিস ভীষণ উদ্বিগ্ন হোল।

—কি হয়েছে, সরস্বতী? গিরিজা কিছু বলেছে?

সরস্বতী তার উদ্বেগ দেখে হাসল।

—পাগল! গিরিজাদের মত মেয়ে হয় না। যা ভাবছ, তা নয়। ওদের অবস্থা দেখে আমিই লজ্জা পাচ্ছি ওখানে থাকতে।

দেবাশিসকে সব কিছু খুলে বলল সরস্বতী। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেবাশিস তাকিয়ে রইল সরস্বতীর দিকে।

—এমন মানুষও হয় ? দরিদ্রের সংসারে এতখানি হৃদয়বত্তা টিকে থাকে ?

দেবাশিস সরস্বতীর জন্য একটি হোস্টেল দেখে রেখেছিল। তবে মনস্থির করতে পারছিল না। আরও ভাল হোস্টেলের তল্লাসে ছিল সে। সরস্বতীর কাছে গিরিজাদের অভাব অনটনের কথা শুনে মনস্থির করে ফেলল।

পরদিন দুপুরেই হোস্টেলে গিয়ে কথাবার্তা বলে আসে সে। তার পরের দিন সরস্বতীকে নিতে আসে। গিরিজা ও তার বোন বিষণ্ন চিত্তে দ্রবীভূত নয়নে তাকে বিদায় জানাল। গিরিজা দুটি শাড়ি ব্লাউজ দিল তাকে ব্যবহারের জন্য। মেশোমশাইয়ের দেওয়া শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট সরস্বতী একটি প্যাকেটে ভরে এনেছিল। গিরিজা তাকে একটি ট্রাঙ্ক দিল কাপড় চোপড় রাখার জন্য।

সরস্বতী বন্ধুত্বের নিদর্শন সেই মহান উপহারকে অসম্মান করল না। পরে যথাসময়ে গিরিজার সম্পত্তি তার হাতে প্রত্যর্পণ করবে, মনে মনে এই সংকল্প করে নতুন হোস্টেলে এসে উপস্থিত হোল ট্রাঙ্কসহ।

উত্তর কলকাতার এই হোস্টেলে অভিভাবক হিসাবে নাম দেওয়া হোল দেবাশিসের এক বন্ধুর। দীপক ব্যানার্জী নামের এই বন্ধুটি অত্যন্ত গোবেচারা প্রকৃতির। হুগলী জেলার এক গ্রামে তার বাড়ি। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে আপার ডিভিশান করণিক। শেয়ালদার এক মেসে থাকে। সে প্রথমে রাজী হচ্ছিল না। দেবাশিস মানবতার দোহাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী করাল।

সরস্বতীর খুবই পছন্দ হোল হোস্টেল। মানিকতলার তিনতলার এই হোস্টেলে বোর্ডারের সংখ্যা বড় কম না। একতলাটা নির্দিষ্ট বয়স্কা মহিলাদের জন্য। প্রতি ঘরে দুটি করে সীট। দোতলায় থাকে অল্পবয়সী মেয়েরা। তিনটি করে সীট রয়েছে প্রতি ঘরে। তিনতলায় থাকে অবাঙ্গালী মেয়েরা। যেখানে প্রতি ঘরে রয়েছে সাতটি করে সীট। অধিকাংশই পাঞ্জাবী। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে কনডেন্সড কোর্সে ডাক্তারি পড়ে তাদের অনেকেই।

হোস্টেলের সুপার মহিলাটি অত্যন্ত ভালমানুষ। শরীরে দয়া মায়া আছে। বোর্ডারদের সঙ্গে সম্পর্ক তার ভাল। হোস্টেলের মালিক সমীর দত্তের বাড়ি ঢাকুরিয়ায়। মাঝে একবার করে মানিকতলা এসে টাকা নিয়ে যায়। আসল খবরদারী করে হোস্টেলের হেড ঠাকুর বনমালী। অন্য তিনজন ঠাকুর চাকরের উপরে তো বটেই, বোর্ডারদের উপরেও কর্তৃত্ব ফলাতে দ্বিধা করে না সে। ভালমানুষ স্বভাবের সুপার মহিলা পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলেন।

হোস্টেলে কয়েকদিন থাকার পরেই দেখে শুনে অনেক কিছু বুঝে গেল সরস্বতী। বনমালী নানাভাবে পয়সা কামায় হোস্টেল থেকে। মাঝে মাঝেই দোতলা বা তিনতলার বারান্দাতে কয়েক দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে বোর্ডার রাখে সে। জরুরী প্রয়োজনে যে সব মেয়েরা আসত, তাদের থাকা খাওয়ার সাময়িক ব্যবস্থা করে দু' পয়সা কামিয়ে নেয়।

হোস্টেলের অন্য বোর্ডাররা সেটা বোঝে। কিন্তু বনমালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস নেই একজনেরও। এমনই তার প্রতাপ। মালিকের সঙ্গে কারুরই সম্পর্ক নেই। তাকে এসব জানিয়ে যে কোন লাভ হবে না, তা সকলেই বোঝে। অতএব বনমালী যেমন চালায়, তেমন চলে হোস্টেলের সব কিছু।

বোর্ডাররা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রকাশ্যে বনমালীকে কিছু বলার সাহস নেই কারুরই। অল্প বয়সী দু' একজন মেয়ে প্রতিবাদের কথা চিন্তা করে। মালিককে সব জানিয়ে প্রতিকারের কথা ভাবে। তবে অধিকাংশেরই সমর্থন থাকে না। তাদের বক্তব্য, যেমন চলছে চলুক। আগ বাড়িয়ে ঝামেলা বাধাবার দরকার কি? তাদের নিজের নিজের আস্তানা ঠিক থাকলেই হোল।

সরস্বতীর পছন্দ হোল বোর্ডারদের। তাদের অধিকাংশই চাকরি করে। অফিসে, স্কুলে বা কলেজে। তার মত ছাত্রীও রয়েছে কয়েকজন। সরস্বতীর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মনটি সবকিছু সত্ত্বেও উল্লসিত হয়ে উঠল। তার মনে হোল বাড়ি ছেড়ে এসেছে বলেই না সে মানবসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে উপলখণ্ডগুলি কুড়িয়ে নিতে পারছে। আরও মনে হোল, জীবন পুরোপুরি বঞ্চিত করে না। ভাগ্য শুধু ছিনিয়েই নেয় না। বিনিময়ে দেয়ও কিছু। হয়ত দেওয়া নেওয়ার অনুপাত সমান হয় না। কিন্তু সরস্বতী ভাবল, সেকথাও কি জোর করে বলা যায়? প্রাপ্তির জন্য বেশি লালায়িত বলেই হয়ত আমাদের তৃষ্ণা সহজে মেটে না। আবার অনেক প্রাপ্তি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। মোটা ধরনের প্রাপ্তিগুলিই আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অনেক দুর্মূল্য মহার্ঘ্য প্রাপ্তি আমাদের স্থূল চোখে ধরা পড়ে না।

ভাবতে ভাবতে আবার উৎফুল্ল বোধ করল সরস্বতী। এভাবে তাকে ভাবতে শিখিয়েছে কে? তার জীবন নয়? তার ভাগ্য নয়? তার অভিজ্ঞতা নয়? চেতনার উৎসমুখে পাথর চাপা দেওয়া ছিল এতদিন। ঘটনার স্রোতে সেই পাথর সরে গিয়েছে। আলোকের ঝর্ণাধারা ধুইয়ে দিচ্ছে তার যত অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা আর স্থূলতা।

দোতলায় যে ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হোল, সেখানে রুমমেট হিসাবে সে পেল চিত্রিতা গুপ্ত ও বাসন্তী চ্যাটার্জীকে। চিত্রিতার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল সরস্বতীর। অসাধারণ রূপসী এই মেয়েটি নার্সিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে কলকাতায় এসেছে। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। বাবার ইচ্ছা ছিল না মেয়ে নার্সিং-এ আসে। কিন্তু চিত্রিতা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়েছে বাবা মাকে।

সরস্বতী বিস্মিত বোধ করে চিত্রিতাকে দেখে। অবস্থাপন্ন বাড়ির এত সুন্দরী একটি মেয়ে যে স্বেচ্ছায় নার্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারে, তা চিত্রিতাকে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না সে।

চিত্রিতা তাকে বলেছে, ছোটবেলায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনী পড়ে সে নার্সিং-এর অনুপ্রেরণা পেয়েছে। 'দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' তাকে শয়নে স্বপনে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তার নিজের মানসিকতা। অসুস্থ অসহায় মানুষের সেবা করে তার দুঃখ কষ্ট রোগযন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারলে সে মানসিক তৃপ্তি পাবে।

সরস্বতীর খুব আশ্চর্য ঠেকেছে। স্বেচ্ছায় কেউ নার্স হতে চায়? আর চিত্রিতার মত মেয়ের পক্ষে তো সেটা অভাবিত। চিত্রিতার অনেক গুণ। চমৎকার তার সেলাইয়ের হাত। আর রূপ যদি আরেক গুণ হয়, তাহলে তো সে অশেষ গুণবতী।

বাসন্তীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হোল। খুব সুন্দর সেতার বাজায় বাসন্তী। একটি বেসরকারী অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে।

গান বাজনার দিকে সরস্বতীর বরাবরই ঝোঁক রয়েছে। সে নিজে ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। দেবাশিস তার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। সে নিজের মুখে সেকথা কবুল করেছে। বলেছে, সরস্বতীর গান শুনেই সে তাকে নির্বাচিত করেছে। অথচ সরস্বতীর যা কিছু শেখা, তা শুনে। দেবিকারানী গান বাজনা, নাটক, থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন। দিব্যনারায়ণ তা নন। সরস্বতীর গলায় গান শুনে দেবিকারানী মেয়েকে গান শেখাবেন বলে ভেবেছিলেন। স্বামীকে অনুরোধও করেছিলেন। দিব্যনারায়ণ তাকে কান দেন নি। সরস্বতীর মনে তা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে।

হোস্টেলে এসে তার অতৃপ্ত মানসিকতা তৃপ্তি খুঁজে গেল। মেয়েদের অনেকেরই অনেক গুণ। তাদের কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কেউ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। বাসন্তীর মত কেউ সেতার বাজায়, আবার বিশাখাদির মত কেউ দারুণ গীটার বাজায়। কেউ বাংলা, কেউ ইংরাজী, কেউ ইতিহাস, আবার কেউ বা সংস্কৃত নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে। কেউ কলেজে পড়ায়, কেউ বা স্কুলে।

পার্বতী সান্যালের মত মেয়েকে দেখে ততোধিক বিস্মিত সরস্বতী। একাধিক গুণ পার্বতী স্যান্যালের। সে কবিতা লেখে, গল্প লেখে, গান করে, আবৃত্তি করে। তার লেখা কবিতা ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায়।

সরস্বতীর ভাল লাগল হোস্টেলের পরিবেশ। সকলের সঙ্গে সমান বন্ধুত্ব হয় না। সকলের কাছে সমান আন্তরিকতা বা সৌহার্দ্য পাওয়া যায় না। তবু মোটা-মুটি মনোমত হোল তার হোস্টেলের পরিবেশ। পছন্দ হোল বোর্ডারদের। তার মনে হোল, এদের কাছে থেকে অনেক কিছু সে শিখতে পারবে, অনেক কিছু অর্জন করতে পারবে। এখানে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

তবে ঘনিষ্ঠতা হোল তিন চার জনের সঙ্গেই। চিত্রিতা গুপ্ত ও পার্বতী সান্যাল প্রায় তার সমবয়সী। তাদের সঙ্গে অন্যাদের তুলনায় বেশি ঘনিষ্ঠতা

হোল।

বয়স্কা মহিলাদের কারুর কারুর সঙ্গেও তার হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। অমলা বিশ্বাস বাংলার শিক্ষিকা। বাংলা নিয়ে এম. এ. পাশ করেছেন। বয়সে সরস্বতীর চেয়ে অনেক বড়। প্রথমাবধি তার সুনজরে পড়ল সরস্বতী। অমলাদি তাকে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার শিক্ষা দেন, অভিভাবক-সুলভ সজাগ দৃষ্টি রাখেন তার ওপর। তার আচরণ অনেকটা মায়ের মত। সরস্বতী কার সঙ্গে মিশবে, কার সঙ্গে মিশবে না, তাও তিনি নির্ধারণ করে দেবেন। একেক সময় তার কর্তৃত্বের বহর দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় সরস্বতী। কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করে না। সে বোঝে, অমলাদি তার হিতাকাংখী। শাসনের দণ্ডটি যে মাঝে-মাঝে তার দিকে উঁচিয়ে ধরেন, তার কারণ, তিনি তাকে ভালবাসেন, তার হিতাহিত নিয়ে চিন্তা করেন।

পার্বতী সান্যাল একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার স্বভাব খুব মিশুকে নয়। স্বল্পভাষী, গম্ভীর পার্বতী সান্যালের সম্পর্কে হোস্টেলের অনেক বোর্ডারের মনেই যথেষ্ট অনীহা আছে। অমলাদি, সুব্রতাদিরা পছন্দ করেন না পার্বতীকে। তারা মনে করেন, পার্বতী দাম্ভিক, অহঙ্কারী। তার চালচলন, কথাবার্তা, কোন কিছুই পছন্দ নয় তাদের। তার সঙ্গে সরস্বতীর বন্ধুত্ব তাদের মনঃপুত নয়। সুযোগ পেলেই অমলাদি তাকে পার্বতীর সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন।

পার্বতী ট্যাক্সি করে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যায়। একা মেয়ে এভাবে ট্যাক্সি হাকায়—এটা হোস্টেলের অনেকেরই পছন্দ নয়।

পার্বতী সান্যালের তা নিয়ে কোনই মাথাব্যথা নেই। সে আপন খেয়ালে ইচ্ছেমত চলে। সরস্বতীকে তার পছন্দ। সরস্বতীর সঙ্গেই তার যা কিছু কথাবার্তা। অসদ্ভাব তার কারুর সঙ্গেই নেই। তবে অন্যদের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা সে বলে না কখনই।

পার্বতীর মত নিজেকে আড়াল করে রাখল না সরস্বতী। বাড়ির সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে সে। সে বুঝেছে, আপনজন যখন পর হয়ে যায়, তখন পরকেই আপনজন করে নিতে হয়। অন্তরঙ্গতা না হোক—অপরিচয়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এদের সঙ্গে মিশতে হবে। তার নিজের সুখ দুঃখ যদি এদের সঙ্গে ভাগ করে না নেয়, তাহলে এই বিশাল বিশ্বে নিজেকে নিয়ে বিব্রত হতে হবে।

তাকে চেষ্টা করে সম্পর্ক তৈরি করতে হোল না। পারস্পরিক পছন্দের দরুন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। তার বাপের বাড়িতে এবং শ্বশুর বাড়িতে মেয়েদের চারপাশে একটা গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের সমস্ত সম্ভাবনা সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মেয়েদের মানসিক প্রসার বা বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে তার প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে নি। হোস্টেলে একসঙ্গে এতগুলি

মেয়েকে দেখে মেয়েদের সম্পর্কে তার পুরনো ধারণার অনেক রদবদল ঘটল।

মাঝে মাঝে সেবা সেনগুপ্ত, বাসন্তী চ্যাটার্জী, পার্বতী সান্যাল কিংবা বিশাখা-দিকে দেখে সে বিষন্ন বোধ করে। তার মনে উদয় হয় একটি প্রশ্ন। এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এরা কতদূর পেঁছোবে? এদের প্রতিভার চরম বিকাশ সম্ভব হবে কি? কীর্তির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হবে কি আদৌ? যদি তা না হয়, তার জন্য এরা নিজেরা কতটা দায়ী হবে? সমাজ কতটা দায়ী হবে?

সেবা সেনগুপ্ত থাকে তাদের পাশের ঘরে। বয়সে কয়েক বছরের বড় তার থেকে। একটি স্কুলে সংস্কৃত পড়ায়। আশ্চর্য ক্ষমতা তার ছড়া তৈরি করার। অনায়াসে ছড়া তৈরি করে আলাপ চালাতে সক্ষম সে। চিঠিপত্রও লেখে ছড়ার মাধ্যমে। প্রথম প্রথম সরস্বতী অস্বস্তি বোধ করেছে। সে নিজে ছড়া রচনায় সিদ্ধহস্ত নয়। অনেক ভেবে চিন্তে কসরৎ করে যদিও বা কিছু বলার চেষ্টা করে, তা তেমন লাগসই হয় না। হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত হয়েছে সরস্বতী। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার সে অস্বস্তি দূর হোল। সেবা তার মনোভাব টের পেয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

—কি বোকা রে তুই। ছড়া তৈরি করতে কি দারুণ প্রতিভার প্রয়োজন হয়? এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার, একটা ঝোঁকের ব্যাপার। আমার ছোটবেলা থেকেই ওদিকে ঝোঁক আছে। হঠাৎ করে কি আর এসব অভ্যাস তৈরি হয়? আর এটা কেন ভাবছিস না, যে গুণ আছে তোর, আমার তা নেই। বাসন্তী আর বিশাখাদির কাছে দু'চারদিন তালিম দিয়ে কি সুন্দর সেতার আর গীটার বাজানো শিখে গেলি। সেদিন তোদের ঘর থেকে সেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শুনে আমি ভেবেছি, বাসন্তী বুঝি বাজাচ্ছে। পরে শুনি, তুই বাজিয়েছিস। বাসন্তী আরও বলল, তুই নাকি বিশাখাদির কাছে গীটার বাজানো শিখে গীটারেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দারুণ চমৎকার বাজাস। এত তাড়াতাড়ি সেতার বা গীটারে গানের সুর বাজানো কি কম প্রতিভার পরিচয়? কজন পারবে তোর মত স্বরলিপি ছাড়া তাড়াতাড়ি সেতার বা গীটারে গানের সুর বাজাতে?

সরস্বতী লজ্জা পাচ্ছিল। আত্মপ্রশংসা শুনলে অস্বস্তি হয়। সে তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ তুলে কথাটা চাপা দিল। কিন্তু তার হীনমন্যতাবোধ চলে গেল। সেবাদির কথাটা নিয়ে সে পরে ভাবল। তার মনে হোল, ঈশ্বর তাকেও বঞ্চিত করেন নি। সত্যিই তো। অকৃতজ্ঞের মত সেই দান কেন সে অস্বীকার করবে?

হোস্টেলের সব কিছুই অবিমিশ্র ভাল নয়। সব বোর্ডাররা সমান নয়। কোন কোন মেয়ের মধ্যে অকারণ ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতাও লক্ষ করেছে সরস্বতী। বিশেষ করে পার্বতী সান্যাল সম্পর্কে তাদের মনোভাব দেখে খুবই খারাপ লেগেছে তার।

পার্বতী সহজ সরল স্পষ্টবাদী মানুষ। তার শুধু প্রতিভাই নেই। তার

মনের ঔদার্য ও প্রসারতারও তুলনা হয় না। নানা ব্যাপারে তার পরিচয় পেয়েছে সরস্বতী। তবে পার্বতীর মধ্যে একটা বেপরোয়া অহংকারও আছে। অনেককেই তার পছন্দ নয়। অনেকের সঙ্গেই তার ব্যবহার অত্যন্ত শীতল, ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ।

কিন্তু কারুর সম্পর্কে কোনরকম নিন্দামন্দ শোনে নি সে পার্বতীর কাছে। বিপদে আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পার্বতী অনেককেই।

তবু, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকেরই। সরস্বতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বও অনেকে ভাল চোখে দেখে না। পার্বতীর বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে তারা তার কাছে।

পার্বতীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করে নানা কথা বলে। সরস্বতী বোঝে, ভিত্তি-হীন এসব অভিযোগের মূলে কারণ আর কিছুই নয়। তাদের ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা আর হীনমন্যতাবোধই তার একমাত্র কারণ। হয়ত পার্বতী যদি তাদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করত, তাহলে এসব জটিলতা সৃষ্টি হোত না। কিন্তু পার্বতী অনমনীয়। তার এক কথা। সকলের সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছা করে না।

অমলাদিও তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন।

—ঐ মেয়ের সঙ্গে তোর এত দহরম মহরম কেন, বাবা? কেমন ভাবে আঙ্গুল উঁচিয়ে ট্যাক্সি ডাকে, দেখিসনি? আর গুমোরই বা কত! কেন, এখানে অন্য মেয়েরা কি কিছু কম? আমরা কি লেখাপড়া জানি না? না, আমাদের কোন গুণ নেই?

সরস্বতী হেসে ফেলে।

—থাক্ না, অমলাদি। ও আছে ওর মত। কারুর কোন অসুবিধা তো করছে না, তাই না?

অমলাদি আরও রেগে যান।

—বুঝবি, পরে বুঝবি। এখন আমাদের কথা ভাল লাগছে না। পরে যখন ঝামেলায় পড়বি, তখন এই গরীবের কথা মনে পড়বে।

বিশাখাদিকে দেখেও আশ্চর্য লাগে সরস্বতীর। কোন এক কোম্পানির বড় এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার। অনর্গল ইংরাজী বলেন। দারুণ স্মার্ট। চেহারা মোটামুটি। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যৌবন প্রায় অস্তমিত। ডিভোর্সী। একটি ছেলে আছে। দারুণ প্রাণবন্ত, খুব স্ফূর্তিতে থাকেন। উগ্র সাজসজ্জায় যৌবনকে ধরে রাখার প্রয়াস। পুরুষ বন্ধুর অন্ত নেই। স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু পুরুষের প্রতি আসক্তির কমতি নেই। বিশাখাদি তা গোপনও করেন না। মাঝে মাঝেই হোস্টেলে থাকেন না। এখানে ওখানে ছুটি কাটান, বেড়াতে যান। তার সঙ্গে কথাবার্তায় এটুকু বুঝতে সরস্বতীর অসুবিধা হয় নি যে, নিম্ফোম্যানিয়াক এই মহিলার প্রচলিত সতীত্ব, নারীজনোচিত লজ্জা, সংযম বা সৌকুমার্য নিয়ে আদৌ কোন মাথাব্যথা নেই।

সরস্বতী জীবনে এমন ভোগী, পুরুষাসক্ত মহিলা আর দেখে নি। বিশাখা-দির সঙ্গে বয়সের তার অনেক ফারাক। তবু কথাপ্রসঙ্গে বিশাখাদির কিছু কিছু

প্রবণতা লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে সে। পুরুষের প্রতি একাধারে চরম আসক্তি ও বিতৃষ্ণা রয়েছে এই মহিলার মনে। পুরুষের [illegible] অনুদারতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও নীতিবর্জিত ভোগলালসা সম্পর্কে সোচ্চার [illegible] মহিলাটির আবার পুরুষকে না হলে চলে না। ভোগ্যপণ্য হিসাবে মনে [illegible] পুরুষের শরীরকে। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিয়ে অপ্রয়োজনীয় [illegible] হিসাবে পুরুষকে ছুঁড়ে ফেলতেও দ্বিধা নেই তার। অমলাদি [illegible] পর মহিলা সংস্করণ বিশাখাদি।

বিশাখাদি সরস্বতীকে বলেছেন, স্বামী [illegible] আসক্ত বলেই তিনি ডিভোর্স চেয়েছেন। কিন্তু সরস্বতীর তা [illegible] ধারণা, বিশাখাদির উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য হয় নি স্বামীর। ডিভোর্সে [illegible] গিয়েছে ব্যাপার।

খুব কম সময়ই বিশাখাদি হোস্টেলে থাকেন। [illegible] বিস্তারিতভাবে এসব নিয়ে আলোচনা হয় নি। মাঝে মাঝে [illegible] এর ওর কাছে থেকে অনেক কিছু শুনেছে সরস্বতী। বিশাখাদি [illegible] হয় এবং এক ধরনের নিষিদ্ধ কৌতূহল কাজ করে তার [illegible] অনেক কিছুই ভাল। স্বভাবে দিলদরিয়া, আমুদে, স্ফূর্তিবাজ [illegible]। বোর্ডারদের জন্য মাঝেমাঝেই এটা সেটা খাবার আনান। [illegible] চাকরদেরও তাতে ভাগ থাকে। কখনও বা সিনেমার টিকিট [illegible] তার চালচলন নিয়েও হোস্টেলে কথা চালাচালি কম হয় না।

অমলাদির সম্পর্কেও অনেক কথা [illegible] সরস্বতী। [illegible] শুনেছে, ফরিদপুরে অমলাদির সঙ্গে পাড়ার [illegible] প্রেম হয়। বাড়িতে অমলাদিকে তার জন্য মারধর করা হয়। [illegible] প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। [illegible] বাড়িতে। পরে কাকার সেই বন্ধুর [illegible]। কাকার বন্ধুর স্ত্রী বর্তমান। অমলাদির সঙ্গে স্বামীর [illegible]। সংসারে নিত্য অশান্তি। অতএব অমলাদিকে [illegible] খুঁজে নিতে হয়েছে এই হোস্টেল।

ভদ্রলোককে দেখেছে সরস্বতী। [illegible] সঙ্গে দেখা করতে আসেন হোস্টেলে। সৌম্য, শান্ত, সুদর্শন [illegible] অনুমান করা সম্ভব নয়, অমলাদির সঙ্গে তার কোন রকম অবৈধ [illegible]। সরস্বতী লক্ষ করেছে, ভদ্রলোক এলে অমলাদি বেশ সাজগোজ [illegible] সঙ্গে বেরিয়ে যান। সরস্বতীর ইচ্ছা হয়, অমলাদিকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করে।

তার মনে হয়, যা শুনেছে, তা কতদূর সত্য, তা সে জানে না। অমলাদি খুবই বুদ্ধিমতী। সরস্বতীর মনোভাব ঠিক টের পাবেন। হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন। সরস্বতী জানে, অমলাদির ব্যক্তিগত জীবন যেমনই হোক, তিনি সরস্বতীর ভালই

চান। কোন কারণেই তার সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন হয়, তা সে চায় না।

মাঝেমাঝে এসব নিয়ে চিন্তা করে সরস্বতী। তার কেমন আশ্চর্য লাগে। কোথায় যেন সে পড়েছিল, আমাদের জীবন পোস্টকার্ডের মত খোলামেলা হওয়া উচিত। সরস্বতী ভাবে, কজন মানুষ নিজের জীবনকে পোস্টকার্ডের মত অপরের সামনে মেলে ধরতে পারবে?

আগে নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি ছিল তার। বাল্যবিবাহ, শ্বশুরবাড়ির তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাকে পীড়া দিত। মনে হোত, জীবনের সেই কালো অধ্যায়টুকু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই ভাল। নিজেকে তখন অন্ত্যজ মনে হোত। সরস্বতী ভাবত, সকলের সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হবার অধিকার বা যোগ্যতা তার নেই।

সে ভাবত, তাকে চিরকাল সন্তর্পণে সেই কালো ক্ষত ঢেকে রাখতে হবে। হোস্টেলে এসে সরস্বতী দেখল, তার একার জীবনটাই রাহুগ্রস্ত হয় নি। অনেকের জীবনেই ঘটেছে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ। বাইরে থেকে কতটুকু দেখা যায়, কতটুকু বোঝা যায়? মানুষের বাইরের চেহারা বড় প্রতারণা করে। আসল সত্যকে তা প্রকাশ করে না। কতজনকে দেখে বোঝাই যায় না, তাদের জীবন কত ঘটনাময়।

হোস্টেলে এত জন রয়েছে। এদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত তার জানা নেই। জানা অবশ্য সম্ভবও নয়। কিন্তু যতটুকু জেনেছে, যতটুকু শুনেছে, তাতেই তার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। পোস্টকার্ডের মত সাদামাটা খোলামেলা জীবন যাপন করে কতজন মানুষ?

কিন্তু কি এসে যায় এসবে? বহতা স্রোতের মত বয়ে চলেছে তার জীবন। সেই স্রোতধারা যেন রুদ্ধ না হয়, সেটাই তাকে দেখতে হবে। স্রোতের মুখে ফুলের সঙ্গে শ্যাওলাও ভেসে আসে। দুটোই সমান সত্য। কোনটাতেই তার কিছু এসে যায় না।

এই বয়সেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। মানুষের দোষত্রুটির চুলচেরা বিচার করার বিলাসিতা তার অন্ততঃ সাজে না। তার সঙ্গে কেউ শত্রুতা করেনি এখানে। হোস্টেলের ঠাকুর চাকররাও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। কারুর বিরুদ্ধে সরস্বতীর অভিযোগ নেই। অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত।

তার ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। দেবাশিস যে তাকে এই হোস্টেলে নিয়ে এসেছে, তার জন্য সরস্বতী কৃতজ্ঞ। পরিবারের নিরাপত্তা ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে সে। চার দেয়ালের বাইরে নানা বর্ণে, রূপে, ঢঙে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হচ্ছে জীবন। দূরে থেকে নয়, তীরে দাঁড়িয়ে নয়, জীবনসমুদ্রে সাঁতার কেটে সে শরিক হবে সেই বহুধা পরিব্যাপ্ত জীবনের। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরে উপলব্ধি করবে তার অনন্ত বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও রহস্য।

।। এগার ।।

গৃহত্যাগ করে আসার পর দেবাশিসের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দেখে সরস্বতীর ভালো লাগে নি। তার মনে দ্বন্দ্ব জেগেছিল। কিন্তু এখন তার সব সংশয় দূর হয়েছে। সে বোঝে, তার ভয় কত অমূলক ছিল। দেবাশিস তার সমস্ত দায়ভার নির্দ্বিধায় বহন করছে। সরস্বতীর শুভাশুভ নিয়ে সরস্বতীর চেয়ে সে-ই যেন বেশি চিন্তিত।

হোস্টেলে অভিভাবক হিসাবে নাম লেখানো রয়েছে দীপক ব্যানার্জীর। মাঝে মাঝে এসে খবরাখবর নিয়ে যায়। ছুটির দিনে দেবাশিস আসে হোস্টেলে। কোন সময়েই খালি হাতে আসে না সে। ফলটা, মাখনটা, বিস্কুটটা হাতে করে তবে উপস্থিত হয়।

নতুন একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে সরস্বতী। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে দেবাশিসই তাকে ভর্তি করেছে সেই কলেজে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন। তবে দেবাশিসের কাছে সে শুনেছে, বাড়ি ছেড়ে আসার পরদিনই তার দুই দাদা অলকার বাড়ি এসে তার খোঁজখবর করেছিল। ঐ পর্যন্তই। পরে তারা আর কোন খোঁজখবর করে নি।

সরস্বতী ভেবে পায় না, তার বাবার মত মানুষ কিভাবে এত অনায়াসে তার গৃহত্যাগের ব্যাপারটা মেনে নিলেন। মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টাই করলেন না।

অষ্টম হেনরির মত তার বাবাও একের পর এক স্ত্রীর জীবনান্ত ঘটিয়েছেন। মৃত্যুশোকেও তাকে বিচলিত হতে দেখা যায় নি। তার নিষ্ঠুরতা সরস্বতীর অজানা নয়।

তবু সে ভেবেছিল, তিনি তার খোঁজাখুঁজি করবেন, হয়ত বা থানা পুলিশেও পিছপা হবেন না। তাতে তার ঝামেলাঝঞ্ঝাটই বাড়ত। লাভ কিছু হোত না।

তাসত্ত্বেও, সরস্বতীর ভেতরে একটা অবুঝ মন দুঃখে অধীর হয়। বাবার কাছে তার দাম কানাকড়িও নয়। সরস্বতী জানত, সে তার বাবার প্রিয় সন্তান। কিন্তু সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, তা নিয়েও কোন চিন্তা নেই যেন তার। সরস্বতীই বা তার জন্য কেন উতলা বোধ করবে? তিনি সম্পর্ক রাখতে চান না—সরস্বতীও সেই সম্পর্কের দাবিতে তার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে যাবে না।

তবু অনেক সময়ই বাড়ির কথা মনে পড়ে। বাড়ির মানুষগুলোর জন্য মন কেমন করে। বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের কথা ভেবে মন উচাটন হয়। সরস্বতী ভাবে, সে বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত।

কিন্তু নিজেকে প্রবোধ দেয় এই বলে যে, তার বুদ্ধিই হোক, কিংবা তার ভাগ্যই হোক, যেখানে তাকে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেখান থেকে পিছু হঠার আর উপায় নেই। পিছনে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

দেবাশিস আছে বলে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে সে। ভরণপোষণের সমস্যা জীবনসংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ। দেবাশিস তাকে কম সাহায্য করেনি। তাছাড়াও, তার মনের দিকে তাকিয়ে দেবাশিস তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দেয়। সরস্বতীর কাছে দেবাশিস এখন অপরিহার্য। তাকে বাদ দিলে তার জীবন পঙ্গু হয়ে যাবে।

সরস্বতীর জ্বরজ্বর মতো হয়েছিল। চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল নিজের বিছানায়। একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ চিত্রিতার ডাকে ঝিমুনি ছুটে গেল তার। তড়াক করে উঠে বসল সে।

—কি রে? কি হয়েছে? ডাকছিস যে এভাবে?

চিত্রিতা উত্তেজিত।

—দেখে যা ভদ্রলোকের কাণ্ডটা। ঘাড়ে করে কিভাবে ট্রাঙ্ক নিয়ে এসেছেন। দেখলে মায়া হয়। ভদ্রলোক তোকে কি ভালই না বাসেন।

সরস্বতী বুঝতে পারল, দেবাশিসের কথা বলছে চিত্রিতা। দেবাশিসকে পছন্দ করে চিত্রিতা। সরস্বতীর কাছে তার অতীত ইতিহাসের অনেকটাই শুনেছে সে। দেবাশিস যে তার দায়িত্ব এভাবে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তার জন্য সে খুবই তারিফ করে দেবাশিসকে।

সরস্বতী সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার চোখে পড়ল, দেবাশিস ঘাড়ে করে একটা নতুন ট্রাংক নিয়ে আসছে। গিরিজা তাকে একটা পুরনো ট্রাঙ্ক দিয়েছিল। তার শাড়ী ব্লাউজ সে রেখে দিয়েছে তার মধ্যে। দেবাশিস তা জানে। কিন্তু সেজন্য ট্রাংক কিনে এভাবে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসবে, তা সত্যিই অকল্পনীয়।

নীচে নেমে সরস্বতী দেখে, দেবাশিস ঘামছে। বাসস্টপ থেকে এই পথটুকু রৌদ্রের মধ্যে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সরস্বতীকে দেখে দেবাশিস কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে গড় গড় করে একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল।

—গিরিজার ট্রাংকটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে তোমার কাছে। ওটা ফেরৎ দেওয়া দরকার। ওর শাড়ি ব্লাউজও রয়েছে তোমার কাছে। কতদিন আটকে রাখবে? ও ভাল মেয়ে, ভদ্র মেয়ে। কিন্তু তুমি কেন তার সুযোগ নেবে? আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, তোমার জন্য একটা ট্রাঙ্ক কিনব। কিন্তু হয়ে উঠছিল না। আজ কিনে সোজা তোমার কাছে নিয়ে এলাম। বড়সড় দেখেই কিনেছি। তোমার চলে যাবে। তোমার জন্য শাড়ি ব্লাউজ আর পেটিকোটও কিনে নিয়ে এসেছি। গিরিজার জামা কাপড় ওর ট্রাংকে করে ফেরৎ দিয়ে আসব আজই।

সরস্বতী অনুযোগ করে।

—এখনই কি দরকার ছিল ট্রাঙ্ক কেনার? আর শাড়ি ব্লাউজও তো রয়েছে আমার। এই রৌদ্রে অত কষ্ট করে—কোন মানে হয়?

দেবাশিস কর্ণপাত করে না।

—আমি আর দেরি করব না। গিরিজার বাড়ি যাব। তুমি তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কটা নিয়ে এস। সেই সঙ্গে ওর শাড়ি জামাগুলোও।

দেবাশিস প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে হোস্টেলে আসে, সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করে। তার খবরাখবর নেয়। সরস্বতী তার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়। দেবাশিস তার কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের ছক তুলে ধরে। নিভৃতে লালিত স্বপ্নকে একটু একটু করে সরস্বতীর চোখের সামনে মেলে ধরে। সরস্বতীও তার স্বপ্নের শরিক হয়। তাদের যৌথ সংসারের ছবিটাকে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে উদ্দীপিত বোধ করে।

তার শরীর খারাপ হলে দেবাশিসের দুশ্চিন্তা হয়। দেখে সরস্বতীর ভালো লাগে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

মাঝেমাঝে দেবাশিস দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। সরস্বতীকে নিজের কাছে টেনে এনে চুম্বন করে। সরস্বতীকে নিয়ে নিভৃতে কয়েকদিন কোথাও থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সরস্বতী মনে মনে খুশি হয়। একটি পুরুষের সপ্রেম কাঙালপনা দেখে মনে মনে আনন্দমিশ্রিত গর্ব বোধ করে। কিন্তু বাহ্যতঃ প্রশ্রয় দেয় না। সে জানে, অসংযমের ফল বড় ভাল হয় না। অনেক গুণগার দিতে হয় তার জন্য। তার চেয়ে যেমন চলছে, চলুক।

সরস্বতীর জীবন বেশিদিন সরলরেখায় চলল না। জীবনের যে জট অনেকটাই খুলে গিয়েছিল, আবার তা নতুন করে তৈরি হোল। তার জীবনে সংযোজিত হোল নতুন এক অধ্যায়।

পর পর তিন দিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। সরস্বতীরা হোস্টেলে একরকম বন্দী। তৃতীয় দিন দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা ধরে এল। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য সরস্বতী পার্বতীর ঘরে এসে গল্প করছিল। হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করল পার্বতী। প্রথমে দ্বিধান্বিত ছিল সরস্বতী। পরে রাজী হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে পার্বতী বলল—'কোথায় যাওয়া যায়, বল তো? উদ্দেশ্যহীনভাবে না ঘুরে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় গিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিই, চলো।'

সরস্বতী চিন্তা করল। তার মনে হোল দীপক ব্যানার্জীর কথা। কাগজে কলমে দীপক তার অভিভাবক। দু'বছর হোল সে এই হোস্টেলে আছে, অথচ কোনদিন মেসে যায় নি। আজ পার্বতী সঙ্গে আছে। এই সুযোগে দীপক ব্যানার্জীর মেসে গিয়ে হানা দিলে কেমন হয়? পার্বতী সব শুনে রাজী হোল।

ঠিকানা জানা ছিল সরস্বতীর। শিয়ালদার সেই মেসবাড়িতে একটুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল তারা। এক তলার ঘরগুলি তালাবন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে

দোতলায় ওঠে তারা। সামনেই একটি ঘরে এক ভদ্রলোক তক্তপোসের ওপরে বসে। খবরের কাগজ পড়ায় মগ্ন। গৌরবর্ণ, সুদর্শন চেহারা। পরনে পায়জামা গেঞ্জী।

দরজার সামনে এসে পার্বতী প্রশ্ন করে।

—আসতে পারি?

চমকে কাগজ থেকে চোখ তোলেন ভদ্রলোক। একটু অপ্রস্তুত দেখায় তাকে।

—আসুন।

পার্বতীর সঙ্গে সরস্বতীও ঘরের ভিতরে ঢোকে। ভদ্রলোক তাদের বসতে বলেন।

পার্বতী তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে।

—আমরা দীপক ব্যানার্জীর কাছে এসেছি। ওঁর ঘরটা কোথায়, একটু বলবেন, দয়া করে?

—দীপক তো এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। আপনাদের একটু বসতে হবে। পাশের ঘরটাই দীপকের। চলুন, আমি খুলে দিচ্ছি। চাবি আমার কাছেই আছে।

চাবি দিয়ে ঘর খুলে দিলেন ভদ্রলোক সরস্বতীদের জন্য। পরে সুইচ টিপে পাখা চালিয়ে দেন।

—আপনারা বসুন। ওর রুমমেট দেশে গেছে। দীপক আমার কাছে চাবি রেখে দিয়েছে। যদি দরকার হয়, এই মনে করে।

তাদের বসিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক নিজের ঘরে। সরস্বতীর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। এভাবে হুট করে ছেলেদের মেসে আসা ঠিক হয়নি। ভদ্রলোক নিশ্চয় তাদের অদ্ভুত ভেবেছেন। পার্বতীর আচরণ কিন্তু দিব্যি সহজ, স্বচ্ছন্দ। সরস্বতীর অস্বস্তি দেখে মৃদু তিরস্কার করল সে।

—কেন, অন্যায়টা কি হয়েছে?

বেশিক্ষণ তাদের একা থাকতে হোল না। পনর কুড়ি মিনিট পর দশাসই চেহারার শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন সেই ঘরে।

—আসুন, আমাদের ঘরে আসুন। সুনির্মলটা আস্ত গর্দভ। আপনাদের এভাবে একা বসিয়ে রেখেছে। দীপকের আসতে আরও খানিকটা দেরি। আপনারা 'বোর' ফিল করবেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সরস্বতীরা আবার এসে উপস্থিত হোল আগের ঘরে। আরও একজন বোর্ডার এসে উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে।

আলাপ জমে উঠল। নিখিল ঘোষ নামে দশাসই চেহারার ভদ্রলোকটি দারুণ আলাপী। তিনিই সকলের সঙ্গে সরস্বতীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সরস্বতীরা শুনলো, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের প্রথমে দেখা হয়েছিল, তার নাম

সুনির্মল গাঙ্গুলী। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। খুব কৃতী ছাত্র। খড়্গপুর থেকে বি. ই. করেছে। শিগগিরই জার্মানী যাবে। অপর ভদ্রলোকের নাম উৎপল নিয়োগী। কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে কাজ করেন।

সরস্বতীদের নাম ধাম পেশাও জেনে নিলেন তিনি। ভদ্রলোক একাই একশ। দারুণ জমাটি লোক। ওর ভাণ্ডারে রসদ বড় কম নেই। সরস্বতীরা দারুণ জমে গেল। তাদের মনেই হচ্ছিল না যে, মাত্র একটু আগে এদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছে।

নিখিলবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

—দিদিরা কেউ গান টান জানেন? একটু গানটান হোক্ না।

পার্বতী সরস্বতীকে দেখাল।

—ও খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

সরস্বতী বিব্রত হোল।

—একদম বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। আমি মোটেই ভাল গাই না। তাছাড়া আমার একদম চর্চা নেই।

নিখিলবাবু নাছোড়বান্দা। সুনির্মলও নম্র ভঙ্গীতে অনুরোধ জানাল। সরস্বতী রেহাই পেল না। উপায়ান্তর না দেখে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতই গাইতে হোল তাকে।

সুরুতে একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল সরস্বতী। পরে গানের বাণী ও সুরের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। পুজা পর্যায়ের একটি গান নিজের উপলব্ধির রসে জারিত করে আপন মনে বিভোর হয়ে গাইল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। গান শেষ হলে সম্মিলিত কণ্ঠে "বাঃ" শব্দে সরস্বতী বুঝল, তার গান শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

সরস্বতীর পর পার্বতীর পালা। সে একটি নজরুলগীতি গাইল। দারুণ সুরেলা তার গলা। তার সঙ্গে রয়েছে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কাজ। তার গানও উপভোগ্য হোল কম না।

সুনির্মল গান জানে শুনে পার্বতী তাকে অনুরোধ করল গাইতে। তার গান শুনে অবাক হয়ে গেল সরস্বতী। অনবদ্য গানের গলা ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের। সুনির্মল গাইল প্রেম পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। সরস্বতী যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গেল। মৃদুভাষী সুনির্মলের বাচনভঙ্গী তাকে আকৃষ্ট করেছিল আগেই। তার কণ্ঠের গান তাকে রীতিমত মোহমুগ্ধ করে তুলল।

বেলা শেষ হয়ে এল। বেলাশেষের আবছা অন্ধকার সরস্বতীর মনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আনন্দ ও বিষাদের এক যুগলবন্দী অনুভূতি জড়িয়ে ধরল তাকে ঘন করে। অচ্ছেদ্য এক নাগপাশের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল সরস্বতী।

একটু পরে দীপক ফিরল অফিস থেকে। সরস্বতীকে দেখে সে যুগপৎ

বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত বোধ করল। তারা সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে মেসে এসেছে শুনে তার সেই উৎকণ্ঠা দূর হোল বটে, কিন্তু সরস্বতীরা তার ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারল, তাদের এভাবে উপরপড়া হয়ে হঠাৎ এখানে আসা সে পছন্দ করছে না। ক্রমে মেসের অন্য বোর্ডাররাও একে একে এসে উপস্থিত হোল। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল সরস্বতীদের।

পার্বতীকে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে সরস্বতী রীতিমত বিস্মিত হোল। হোস্টেলে খুব চুপচাপ পার্বতী। নিজেকে গাম্ভীর্যের শক্ত খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে সে সেখানে। এখানে তার খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে পার্বতী। স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, আর দশ জন মানুষের মত তার আচরণ, ব্যবহার। হোস্টেলের মেয়েরা এই চেহারা দেখলে নিঃসন্দেহে তার মতই অবাক হয়ে যেত।

দীপক দু'একবার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের বেশি দেরি করা উচিত নয়। হোস্টেলে ঝামেলা হতে পারে। অন্যরা তাতে কর্ণপাত করল না। সকলে মিলে উৎসবের হাট বসিয়ে দিল। উৎসবের মেজাজে মশগুল হয়ে তারা খেয়াল করেনি, কখন ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। চা সিঙ্গাড়া মিষ্টি সহযোগে গল্পগুজবে মত্ত হয়ে তারা ভুলে গিয়েছিল, মেয়ে দুটিকে হোস্টেলে ফিরতে হবে। রাত বেশি হলে হোস্টেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যখন খেয়াল হোল, তখন আর ফেরা যায় না।

দীপক তার বিরক্তি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করল।

—আমি বারবার বলেছি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরে হোস্টেলে ফেরা মুশকিল হবে। কিন্তু আপনারা কি তাতে কান দিলেন? এখন কি করবেন? দেখছি, আমিও বিপদে পড়ে যাব। আপনাদের না হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেয়!

সরস্বতীর দিকে রুষ্ট চোখে তাকায় সে।

—তেমন কিছু ঘটলে দেবাশিসকে কি জবাবদিহি দেব, বলতে পারেন? ও আমাকে দায়ী করবে না? বলবেনা, কেন আপনারা হঠাৎ এখানে এলেন? আমিই বা কেন আপনাদের সতর্ক করে দিই নি?

উত্তেজনায়, বিরক্তিতে তীক্ষ্ম হয়ে উঠল দীপকের গলা। নিখিলবাবু অনায়াসে তার সমাধান বাতলান।

—তুমি এত দুশ্চিন্তা ভোগ করছ কেন, বাপু? যারা এসেছে, তারা কি তোমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেবে, ভাবছ? তাদের সেটুকু দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই থাকবে। আর রাত্রে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। দিদিমণিরা আজ আমাদের এখানে অতিথি হয়ে থাকবেন। কাল সকালে ওঁরা হোস্টেলে ফিরে যাবেন। পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন ওঁরা নিজেরাই।

—সে কি? এখানে? তা কি করে সম্ভব?

নিখিলবাবু নির্বিকার। শান্ত হয়ে পালটা প্রশ্ন ছোঁড়েন তিনি।

—সম্ভব নয় কেন? তোমার অন্য দুজন রুমমেট এখন দেশে। তুমি অনায়াসে দেবেশের ঘরে থাকতে পার। দেবেশ এখন ওর ঘরে একা। দিদিমণিদের থাকার ব্যবস্থা হবে তোমার ঘরে।

দীপক তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারে না।

—বলছেন কি, নিখিলদা? হোস্টেলে না ফিরলে, তার ফলটা কি দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছেন?

পার্বতী জবাব দেয়।

—আপনি ভাববেন না। আমরা ঠিক সামলে নেব।

সরস্বতী পার্বতীর অবিচলিত, নিরুদ্বেগ ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হচ্ছিল। এরকম ডাকাবুকো স্বভাবের বলেই কি অমলাদিরা ওকে এত অপছন্দ করেন? পার্বতীর স্বভাবের এই দিকটির সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল না। আজ নতুন পরিস্থিতিতে পার্বতীর নতুন চেহারা দেখে সরস্বতীর মনে হোল, পার্বতী সত্যিই অসাধারণ। আর দশটা মেয়ের তুলনায় অনেক বেশি সাহসী, নির্ভীক আর বেপরোয়া।

রাত্রে রীতিমত ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হোল অতিথিদের জন্য। তবু সুনির্মল আপশোস করে।

—আজ ভাল করে আপনাদের আপ্যায়ন করা গেল না। আরেকদিন নিমন্ত্রণ রইল আমাদের মেসে।

পার্বতী রসিকতা করে।

—ঠিক আছে। সেদিন এসে চব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খেয়ে যাব। আপনাদের আপশোসের কোন কারণ থাকবে না।

রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে বেশ ভালই ঘুম হোল তাদের। প্রত্যূষে মুখহাত ধুয়ে তারা যখন হোস্টেলে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন ছেলেরা অনেকেই এসে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। আরেকদিন আসার নিমন্ত্রণও জানিয়ে গেল তারা সেই সঙ্গে।

দীপককে গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সরস্বতী মনে মনে কুণ্ঠিত বোধ করছিল। অভিভাবক হিসাবে দীপকের নাম দেওয়া আছে। ঝুটঝামেলা হলে, তার ওপরও কিছুটা দায়িত্ব বর্তায় বৈ কি!

অন্য ছেলেদের ব্যবহার অমায়িক। সরস্বতীর খুব ভালো লাগছিল। সুনির্মলের সান্নিধ্যের রেশ হালকা ঝিরঝিরে বাতাসের মত নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল তাকে। তার শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। সচেতন মনে সরস্বতী সেই অনুভূতিকে প্রতিহত করতে চাইছিল। তার বিবেক তর্জনী তুলে তাকে ক্রমাগত শাসাচ্ছিল।

—সাবধান, সরস্বতী। দেবাশিসের কথা কি ভুলে গেছ তুমি? সুনির্মলের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তার প্রতি অন্যায় করবে? আদর্শচ্যুত হবে?

সরস্বতীরা ঠিক করল, হোস্টেলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" নীতি অনুসরণ করে বলবে যে, তারা সরস্বতীর দাদার বাড়ি গিয়েছিল। কথাবার্তায় দেরি হয়ে যাওয়ায় রাতটা সেখানেই কাটিয়েছে।

দীপক সম্পর্কে না হলেও, কাগজে কলমে তার দাদা, তার অভিভাবক। তার আস্তানায় তারা রাত কাটিয়েছে। একেবারে নির্জলা মিথ্যাভাষণ হবে না।

সরস্বতীরা ভেবেছিল, হোস্টেলে অনেক ঝড় উঠবে তাদের নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু হোল না। সকালে তাদের বহাল তবিয়তে, নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে সুপার সহ অমলাদিরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পার্বতীকে কেউ কিছু বলল না। সবাই পড়ল সরস্বতীকে নিয়ে। সরস্বতী শুনল, অনেক রাত পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন সকলে। হাসপাতালে ফোন করা হয়েছে। কোন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে কিনা জানার জন্য। থানায় খবর দেবার কথাও ভেবেছিলেন তারা। শেষ পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পালটেছেন নানা চিন্তাভাবনা করে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন।

কেউই তেমন অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করল না। সরস্বতীর খুব আশ্চর্য লাগল। তারা ভেবেছিল, কেমন সম্পর্কের দাদা, তার বাড়ির ঠিকানা কি, কিংবা বাড়িতে আর কে আছে, এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীণ হতে হবে। তাদের আশঙ্কা অলীক প্রমাণিত হোল। নির্বিচারে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিল সকলে তার কথা।

সুপার ছায়াদি সস্নেহ তিরস্কার করলেন।

—দু'জন অল্পবয়সী মেয়ে এভাবে না বলে কয়ে হোস্টেলের বাইরে থাকলে চিন্তা হয় না? যদি তেমন কিছু ঘটত, তাহলে আমাদের কি দুর্ভোগটা হোত, জান? সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করিনি আমরা তোমাদের জন্য। আর কোনদিন এভাবে না বলে কয়ে বাইরে রাত কাটাবে না।

অমলাদি সরস্বতীকে একান্তে ডেকে নিলেন।

—শোন, দিব্যি পার পেয়ে গেলে। কিন্তু তোমাকে অনেকবার বলেছি—আবারও বলছি, ঐ বেপরোয়া মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো। আমরা তো ভয়ে মরি। ঐ মেয়ে কাউকে পরোয়া করে না—ওর সঙ্গে যখন বেরিয়েছ, তখন কপালে তোমার দুর্ভোগ আছে। দাদার বাড়িতে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব তোমার মাথা থেকে আসেনি—ঐ মেয়েই নিশ্চয় বলেছে, আজ হোস্টেলে না গেলেই হয়, তাই না?

সরস্বতী সবেগে মাথা নাড়ল।

—না, না, অমলাদি। পার্বতীর কোন দোষ নেই। আসলে কথাবার্তায় আমরা এমন জমে গিয়েছিলাম যে, খেয়াল করিনি, অত রাত হয়ে গেছে।

অমলাদি তাকে থামিয়ে দিলেন।

—থামো। ওর হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না। যা বোঝার, বুঝে নিয়েছি আমরা। তবে তোমার ভালর জন্যই বলছি—ওর সঙ্গে মেলামেশাটা একটু কম করো।

সরস্বতী নির্বাক থেকে শুনে গেল তিরস্কার। গুরু পাপে এমন লঘু দণ্ড সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কোন রকম ছি ছি নেই, জিজ্ঞাসাবাদ করে নাজেহাল করা নেই। সরল বিশ্বাসে তাদের কথা সকলে মেনে নিল। ভাবা যায় না। দেবাশিস শুনলে বিশ্বাসই করবে না।

সরস্বতীর মনে হচ্ছিল. ঘটনাটার জের এত সহজে মুছে যাবে না। সুনির্মলের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেনা সে। এক জটিল সমীকরণ খেলায় মেতেছে তার মন। সুনির্মলের পাশে দেবাশিস ম্লান, নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। নিজের ওপর রাগে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছা করল সরস্বতীর। এই দুর্বলতা অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। দেবাশিসের কাছে তার ঋণ অপরিসীম। তার জীবনের এক অপরিহার্য অধ্যায় দেবাশিস।

সেদিন বিকালে পার্বতীর প্রশ্ন শুনে প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোল সরস্বতী।

—সুনির্মল গাঙ্গুলীকে তোমার কেমন লাগল?

মনের চঞ্চলতা গোপন করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সরস্বতী।

—খারাপ লাগেনি।

—শুধু তাই? আর কিছু নয়?

সহাস্যে প্রশ্ন করে পার্বতী।

ইচ্ছা করেই ধরা দেয় না সরস্বতী।

—তুমি কি বলতে চাইছ?

পার্বতী হেঁয়ালী করে না।

—ভদ্রলোককে দেখে বুঝেছি, তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে ওঁর। তোমার মনোভাব কেমন, জানতে ইচ্ছা করছে।

সরস্বতী বিরক্ত হোল।

—তুমি জান, দেবাশিসের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। সুনির্মলের সঙ্গে আমাকে জড়াতে চাইছ কেন এভাবে?

পার্বতীর জবাব আগের মতই স্পষ্ট।

—আমি নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন তুলছিনা, সরস্বতী। দেবাসিসের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে বলে অপর কোন পুরুষকে ভাল লাগবে না, এরকম অদ্ভুত যুক্তি আমি বিশ্বাস করি না। অমন সহজ হিসাবে যদি জীবন চলত, তাহলে তো কিছু বলারই ছিল না।

সরস্বতী অপ্রস্তুত হয়।

—ঠিক কথা। তবে মানুষের বিবেকবোধ আছে, ন্যায় অন্যায় বোধ

আছে। নিজেকে কখনও কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, নিজের অনিচ্ছার রাশ টেনে ধরতে হয়।

পার্বতী হাসে।

—বুঝেছি। সুনির্মলকে তোমার ভাল লেগেছে!

সরস্বতী হাসে না। গম্ভীর, অপ্রসন্ন দেখায় তাকে।

—আমি এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাইনা। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আশা করি, বুঝবে।

পার্বতীকে থামিয়ে দিল বটে, কিন্তু সরস্বতীর অবাধ্য মন কোন নিষেধ শুনল না। সুনির্মলের কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়তে লাগল। দেবাশিসের জন্যও বিচিত্র এক মায়া বোধ করল সে। দেবাশিস তাকে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার সাহায্য না পেলে ভেসে যেত সে, উত্তাল ভয়াল স্রোতের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে শেষ হয়ে যেত।

সুনির্মল দু'দিনের অতিথি—তার আকর্ষণ নতুনত্বের, বৈচিত্র্যের। দেবাশিস দীর্ঘদিনের পরিচিত, আপনজন। শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও অপরিহার্য—সরস্বতীর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে।

পরদিন দেবাশিস যথারীতি এসে উপস্থিত হোল তার হোস্টেলে। দুজনে বেড়াতে গেল। সরস্বতীর কাছে সবকিছু কেমন বেসুরো, বেতালা লাগছিল।

তাকে অন্যমনস্ক দেখে দেবাশিস উদ্বেগ প্রকাশ করল।

—তোমার কি শরীর খারাপ?

চমকে উঠে ত্বরিতে জবাব দিল সরস্বতী।

—তেমন কিছু নয়। একটু গা ম্যাজম্যাজ করছে।

দেবাশিসের কাছে তাদের দ্বৈত অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সে প্রকাশ করল না। দেবাশিস স্বভাবে রক্ষণশীল। এসব পছন্দ করে না। হুট করে ছেলেদের মেসে গিয়ে তারা উপস্থিত হয়েছে, আবার সেখানে রাত্রিবাসও করে এসেছে—এই খবরটা খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে না। সুনির্মল বৃত্তান্ত তার কাছে গোপন রইল সেকারণে।

মাঝখানে দু'দিন বাদ দিয়ে সুনির্মল এসে উপস্থিত হোল হোস্টেলে। অপ্রত্যাশিত ঐ ঘটনায় সরস্বতী দারুণ চমকে গেল। ভজহরির কাছে ভিজিটার আসার খবর পেয়ে নীচে নেমে সে যখন সুনির্মলকে দেখতে পেল, তখন তার বুকের মধ্যে তুমুল ওঠাপড়া সুরু হোল।

তাকে দেখে সহজভাবে হাসল সুনির্মল।

—চলে এলাম। অবাক হচ্ছেন তো দেখে? ভাবতেই পারেননি যে, আমি আসব?

সরস্বতী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে কি জবাব দেবে, বুঝতে পারল না।

সুনির্মল সেসব কোন কিছুই লক্ষ না করে আপন খেয়ালে কথা বলতে থাকে।

—চলুন, বেড়িয়ে আসি। দারুণ আবহাওয়া। খোলা হাওয়ায় মাথার জট খুলে যাবে। শরীর মন তাজা হবে।

সরস্বতী না বলতে পারল না। সুনির্মলের আহ্বানে কোন মালিন্য নেই। সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের আহ্বান। হোস্টেলের অনতিদূরে একটি পার্কে তাকে নিয়ে গেল সুনির্মল। নানা বিষয়ে কথা হোল। সুনির্মলই বেশি কথা বলল। সরস্বতী শুনে গেল। মাঝে মাঝে দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিল মাত্র।

একটু পরে সুনির্মলের খেয়াল হোল।

—আমিই কেবল বকবক করে যাচ্ছি। আপনি তো কিছুই বলছেন না।

সরস্বতী হাসল।

—আমার শুনতে ভাল লাগছে। আর দুজনেই যদি বক্তা হই, তাহলে শ্রোতা হবে কে?

—বাঃ! সুন্দর বলেছেন। তবে আপনি কেবল শ্রোতার ভূমিকা পালন করবেন—তা হবে না। আমারও তো শুনতে ইচ্ছা করতে পারে।

—কি শুনবেন? বলার মত কি-ই বা আছে আমার? আর আপনার মত বলিয়ে নই আমি।

—সে দেখা যাবে। আপনি যা বলবেন, তাই বেদবাক্য বলে মেনে নেব না কি? আপনার বিনয় নির্ভেজাল মনে হচ্ছে না। আমি যেন তার মধ্যে অহংকারের গন্ধ পাচ্ছি।

সরস্বতী জোরে হেসে ওঠে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে সুনির্মল।

—আপনার হাসি তো ভারী সুন্দর! এভাবে সবাই কিন্তু হাসতে পারে না। আপনার মনটা খুব পরিষ্কার।

সুনির্মল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল সরস্বতীর। তার বাবা নেই। দুই ভাই, এক বোন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ডাক্তার। পসার ভাল। দাদাও পেশায় ডাক্তার। রোজগার ভালই। সুনির্মল সকলের ছোট। খড়গপুর থেকে বি. ই. পাশ করেছে। একটি আণ্ডারটেকিং কোম্পানিতে কাজ করছে। শিগগিরই জার্মানী যাওয়ার কথা।

সরস্বতী নিজের সম্পর্কে যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই বলল। সুনির্মলের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে গেল। তার খুব ভাল লাগছিল সুনির্মলের সান্নিধ্য। সুনির্মলের মুগ্ধতা তার কাছে গোপন থাকছিল না। সে যুগপৎ বিষণ্ণ ও আনন্দিত বোধ করছিল। সুনির্মলের রুচির সঙ্গে তার রুচির খুব মিল। সুনির্মলও তার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত, মিষ্টির ভক্ত। তার প্রিয় গায়ক গায়িকা, সুনির্মলেরও প্রিয় গায়ক গায়িকা। তার প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী, সুনির্মলেরও প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী।

হোস্টেলের কাছে এসে তাকে ছেড়ে দিয়ে গেল সুনির্মল। সরস্বতীর মনে ভ্রমরের মত গুঞ্জন তুলল একটি চিন্তা—'দেবাশিসের সঙ্গে রুচিতে আমার এত মিল

নেই, যত মিল আছে সুনির্মলের সঙ্গে রুচিতে।' তার মন বিষাদে ভরে গেল। 'সুনির্মলের সঙ্গে আরও অনেক আগে আমার দেখা হোলনা কেন?'

॥ বার ॥

সরস্বতী বোঝে, ভাগ্যদেবতা তাকে নিয়ে আবার এক নতুন খেলা সুরু করেছে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, নীতি নৈতিকতা, খড়কুটোর মত ভেসে যায় ঘটনাস্রোতের মুখে।

সুনির্মল প্রায়ই চলে আসে তার হোস্টেলে। দুজনে কাছাকাছি কোন পার্কে বা অন্য কোথাও বেড়াতে চলে যায়।

সুনির্মল তাকে 'তুমি' সম্ভাষণ করে এখন। সরস্বতীকেও বাধ্য করেছে সে 'তুমি' সম্ভাষণে। তারা গল্প করে, একত্রে কোন কিছু খায়, নানা বিষয়ে মত বিনিময় করে। সুনির্মলের সঙ্গে থাকলে সময়ের ভার টের পায়না সে। পাখির ডানায় ভর দিয়ে সময় উড়ে যায় আকাশের দিকে, মাটির থেকে অনেক উঁচুতে কল্পলোকের সীমানায়।

মাঝে মাঝে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয় সুনির্মলকে। কখনও বা বাড়িতে যায়। তখন সরস্বতীকে চিঠি লেখে। বাংলার থেকে ইংরাজীতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ সে। তাই ইংরাজীতেই লেখে চিঠি। সরস্বতী অমূল্য সম্পদের মত রেখে দিয়েছে সেগুলি যত্ন করে। সুনির্মলের আবেগ, অনুভূতির প্রতিফলন তার চিঠিতে। সরস্বতীর কাছে তার স্বাদ অনবদ্য।

সরস্বতী একটি ব্যাপার লক্ষ করল। সপ্তাহের যে দু'দিন দেবাশিস আসে, সেই দু'দিন ভুলক্রমেও হোস্টেলে আসেনা সুনির্মল। সুনির্মল সরস্বতীর অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা দেখায়না।

সরস্বতীও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে সম্পর্কে কিছু জানায় না। দেবাশিসের প্রসঙ্গ তাই অনুক্ত থেকে যায়। কিন্তু সরস্বতীর ধারণা, সুনির্মল অবশ্যই দেবাশিসের সম্বন্ধে কিছু শুনেছে। সেই কারণেই শুক্র ও শনিবার বাদ দিয়ে অন্য দিন তার সঙ্গে দেখা করে।

সুনির্মল স্পষ্ট করে তাকে ভালোবাসার কথা জানায়নি। কিন্তু সরস্বতী তার মনোভাব বুঝতে পারে।

সরস্বতীর পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে তার সজাগ কৌতূহল, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সাজানো ছক তার সামনে মেলে ধরার প্রবণতা, কিংবা তার মুগ্ধ চাহনী সরস্বতীর কাছে অনেক কিছুই ব্যক্ত করে। গোপন অপরাধবোধে পীড়িত হয় সরস্বতী। ত্রিভুজের জটিলতা কেন সে আবাহন করে আনছে তার জীবনে? পরিণতি কি তার?

কখনও কখনও আনমনা হয়ে যায় সে। সরস্বতী ভাবে, সুনির্মল না জিজ্ঞাসা করুক, তার সুনির্মলকে সব খুলে বলা উচিত। দ্বিধাদ্বন্দ্বে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখনও যদি সে মনস্থির করতে না পারে, তাহলে সমূহ বিপদ।

সুনির্মল প্রশ্ন করলে সহজে মোকাবিলা করা যেত। কিংবা 'অঙ্কুরে বিনষ্ট' করার সংকল্পে যদি সে দৃঢ় থাকত, তাহলে এতখানি গড়াতে পারতনা ব্যাপারটা। এখন অনেক ভেবেও সরস্বতী কোন কূলকিনারা পায়না। সুনির্মলের মনোকষ্টের কথা ভেবেই সে দ্বিধাগ্রস্ত।

আশ্চর্যের কথা, হোস্টেলের অধিকাংশের ভোট সুনির্মলের অনুকূলে। কি অমলাদি, কি বিশাখাদি, কি পার্বতী—সকলেই সুনির্মলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেবাশিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক কারুর অজানা নেই। তবু তাদের পছন্দ সুনির্মলকেই।

পার্বতীর যুক্তি হোল, কৃতজ্ঞতাবোধ নিঃসন্দেহে মানবিক বৃত্তি। দেবাশিসের কাছে সরস্বতীর ঋণ অপরিসীম। কিন্তু সব কিছুর ওপরে জীবনের দাবি। জীবনের সুখশান্তির মূল্যে কি সরস্বতী ঋণশোধের কথা ভাবছে? তাহলে তার দেউলিয়া হতে বাকি থাকে কি? অত চড়া দাম দেবে কেন সরস্বতী?

সরস্বতী একমত হতে পারে না। সুনির্মল দেবাশিসের চেয়ে রূপে গুণে বিদ্যায় আভিজাত্যে ও প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে শ্রেয়। কিন্তু দেবাশিসও অপাংক্তেয় নয়।

অমলাদি পার্বতীর মত স্পষ্ট করে তার মনোভাব ব্যক্ত করেননা। তিনি একটু ঘুরিয়ে সরস্বতীর কাছেই তার মনোভাব জানতে চান। কিন্তু তার প্রশ্নের মধ্যে, তার শব্দচয়নের মধ্যে, পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়।

একমাত্র ব্যতিক্রম চিত্রিতা। সে খুব বিরক্ত। তার মতে, সরস্বতীর এভাবে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সরস্বতীকে সে অভিভাবকসুলভ ভঙ্গীতে শোধরাতে চেষ্টা করে।

—এ তুই ভাল করছিস না, সরস্বতী। সুনির্মলকে এত প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নয় তোর। দেবাশিসের জন্য সত্যিই কষ্ট হয়। কি-না করেছে ও তোর জন্য? আমার এখনও মনে পড়ে, কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে ঘাড়ে করে তোর জনট্রাংক বয়ে নিয়ে আসার কথা। একদিন তোর পেট খারাপ হয়েছিল। ও সে কথা শুনে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল। তোর জন্য বার্লি, লেবু, গ্লুকোজ কিনে নিয়ে এল। মনে পড়ে? না, সব ভুলে গিয়েছিস? যখনই আসে, তোর জন্য হাতে করে মাখনটা, বিস্কুটটা, মিষ্টিটা নিয়ে আসে। তোর শরীর খারাপ দেখলে কত চিন্তা করে। সুনির্মল দু'দিনের অতিথি। ওর জন্য দেবাশিসকে কষ্ট দিবি তুই? অত্যন্ত অন্যায়। তোর একজনকে বেছে নিতে

হবে। দু'জনকে নিয়ে এমন ভয়ংকর খেলা তুই খেলিসনা, সরস্বতী। আগুন জ্বলবে, দেখিস। সেই আগুনে তুইও রক্ষা পাবিনা!

সরস্বতী চিত্রিতার উত্তেজনা দেখে কৌতুক বোধ করে। ওকে রাগাতে চেষ্টা করে।

—দু'জনকেই দরকার আমার! একজনকে বেছে নিই কি করে, বল? একজন আমার কাছে দিন, অন্যজন রাত। কাকে বাদ দিয়ে কাকে বেছে নেব, বল?

তর্জনী তুলে শাসায় চিত্রিতা।

—এতদিন চুপ করে ছিলাম। ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে না। কিন্তু আর আমি চুপ করে থাকবনা। এবার আমি সুনির্মলকে সব কিছু জানিয়ে দেব। দরকার বুঝলে, দেবাশিসকেও বলতে হবে। ও যদি তোকে সামলাতে পারে!

কপট ত্রাসে আর্তনাদ করে ওঠে সরস্বতী।

—খবরদার, না। তোর মত এত সুন্দরী মেয়েকে দেখলে আমার দিকে আর ফিরেও তাকাবেনা সুনির্মল। তুই ভাই আমার অত ক্ষতি করিসনা।

চিত্রিতা হতভম্ব।

—তুই কি, সরস্বতী? তোকে তো এত হালকা বলে ভাবিনি?

—বেশি ভারি হলে বইতে মুশকিল হয়, জানিসনা? তাই কিছু বোঝা ফেলে দিয়েছি।

শিগ্‌গিরই ব্যাপারটা একটা পরিণতির দিকে এগোল। সুনির্মলের সঙ্গে যথারীতি বেড়াতে যাচ্ছিল সরস্বতী। দেবাশিসের আসার কথা নয় সেদিন। গলির মুখে হঠাৎ অমলাদির সঙ্গে দেখা। সুনির্মল একটু আগে, সরস্বতী তার পিছনে।

—সরস্বতী, দেবাশিসকে দেখলাম। মোড়ে পানের দোকানে সিগারেট কিনছে।

সরস্বতীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখায়।

অমলাদি বুঝতে পেরে সমাধান বাতলান।

—তুই হোস্টেলে ফিরে যা। আমি সুনির্মলকে বলছি, ওর বাড়ির লোক দেখা করতে আসছে।

সরস্বতীর মনোমত হলো না সেই প্রস্তাব। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে সে সেখানেই। এই মুহূর্তে সুনির্মলকে অগ্রাহ্য করে হোস্টেলে ফিরে যাওয়া, কিংবা দেবাশিসকে অগ্রাহ্য করে সুনির্মলের সঙ্গে যথারীতি বেরিয়ে যাওয়া, কোনটাই সম্ভব নয়। সুনির্মল প্রায় রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল। সরস্বতীকে না দেখে পিছন ফিরে তাকায়। সরস্বতীকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফিরে এসে শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে।

—শরীর খারাপ লাগছে? হোস্টেলে ফিরে যাবে?

সরস্বতীর জবাব দেওয়া হোলনা। তার চোখে পড়ল, হনহন করে এগিয়ে আসছে দেবাশিস। সুনির্মল আর সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। অমলাদি তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ত্বরিতে পরিস্থিতি সামলাতে চেষ্টা করেন।

—আর একটু পরে আসলেই সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হতো না। ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। এই ভদ্রলোক হলেন—

দেবাশিস ঠাণ্ডা গলায় বাধা দেয়।

—জানি। ওকে চিনি। দীপকের মেসে থাকেন উনি।

অমলাদি নিরস্ত্র হননা।

—ভালই হয়েছে, আপনি এসে গেছেন। তা, হোস্টেলে চলে আসুন। চা টা খেয়ে যান।

দেবাশিস আপত্তি জানায়।

—না না, চায়ের দরকার নেই। আমি বরং পরে আসব। সরস্বতী তো দেখছি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে। আবার হোস্টেলে আসার দরকার কি?

অমলাদি আর কথা বাড়ান না। সমাধানের উপায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যান হোস্টেলে।

এবার সুনির্মল উদ্যোগী হল পরিস্থিতি রক্ষা করতে।

—চলুন, সকলে মিলে আড্ডা দেওয়া যাক। কাছেই পার্কে বসে চুটিয়ে গল্প করা যাক।

দেবাশিস রাজী হোল না। বেজার মুখে কাজের ওজুহাতে সুনির্মলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সুনির্মল জোর করে। সরস্বতীও তার দেখাদেখি অনুরোধ করে।

—চল না, বলছেন যখন!

স্থির চোখে সরস্বতীকে লক্ষ করে দেবাশিস।

—তুমি বলছ যেতে?

সরস্বতী তার অস্বস্তি গোপন করে স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিতে চেষ্টা করে।

—নিশ্চয়। তোমার ভালই লাগবে। খারাপ লাগবেনা।

পার্কে গিয়ে তিনজন একটি বেঞ্চিতে বসে। দুপাশে দুইজন পুরুষ, মাঝখানে সরস্বতী। দেবাশিসই সরস্বতীকে পাশে রেখে এক ধারে বসল।

সুনির্মলের কোন বিকল্প ছিলনা। তাকে সরস্বতীর পাশে বসতে হোল।

সুনির্মল সহজভাবে কথা বলে গেল। তার মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর বা আড়ষ্টতা না দেখে সরস্বতী চমৎকৃত হয়ে গেল। দেবাশিস একেবারেই কথা বলছিল না। যেটুকু বলছিল, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। সরস্বতীও বেশি কথা বলছিল না। তার মন দাঁড়িপাল্লায় তুলে ধরছিল দুজনকে। সুনির্মলের পাশে দেবাশিসকে ব্যক্তিত্বহীন, আড়ষ্ট ও বেজার দেখাচ্ছিল। সুনির্মলকে অনেক বেশি সপ্রতিভ,

স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

অন্য দিনের মত আলাপ জমলনা। অনেক চেষ্টা করেও সুনির্মল সহজ আবহাওয়া তৈরি করতে পারল না। দেবাশিস সাড়া দিল না।

একটু পরেই দেবাশিস উঠে দাঁড়াল।

—আমি উঠি। আপনারা গল্প করুন। আমার কাজ আছে।

সুনির্মল তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে।

—একদিন নয় কাজের কথা ভুলে যান। কাজ তো থাকেই। কিন্তু গল্প করার সময় সুযোগ তো রোজ আসে না?

দেবাশিস নির্বিকার।

—মাপ করবেন। আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়।

যাবার সময় সরস্বতীকে কিছু বলে গেলনা দেবাশিস। সরস্বতীর খুব খারাপ লাগছিল। সেও উঠে পড়তে চাইল। সুনির্মল তাকে উঠতে দিল না।

—আর একটু বসো। পাঁচ মিনিট। খুব দেরি হবে না।

সরস্বতী আবার বসে পড়ে। কিন্তু সুনির্মল কিছু বলে না। নির্বাক হয়ে সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অস্বস্তিবোধ করে সরস্বতী। সুনির্মল কি দেবাশিসের প্রসঙ্গ তুলবে? তার সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু জানতে চাইবে? সে কি ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চাইছে আজ? সরস্বতীকে কি আজ এই মুহূর্তেই চরম ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিতে হবে? দুজনের একজনকে বেছে নিতে হবে? অন্যজনকে নির্মমভাবে ছেটে বাদ দিতে হবে জীবন থেকে?

তার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হোল। সুনির্মল দেবাশিসের প্রসঙ্গ তুলল না। কিন্তু তার একটি কথা শুনে চমকে গেল সরস্বতী। কোনদিন সুনির্মল এমন কথা বলে না। তার কথার নির্গলিতার্থ সরস্বতীর বুকে কাঁপন ধরায়।

—সরস্বতী, 'ভালবাসি' কথাটা অবলীলাক্রমে বলে ফেলার মত নয়। তার আগে ভাল করে নিজেকে যাচাই করে নিতে হয়। কথাটা মনে রেখ।

সরস্বতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কথাটার অর্থ তার কাছে দুর্বোধ্য নয়। তার কাছে অনেক বেশি দুর্বোধ্য তার নিজের মন। বাঁধাধরা মসৃণ পথ বাদ দিয়ে যে কেবলি ঘুরপথে বিচরণে অভ্যস্ত।

হোস্টেলের কাছে এসে হঠাৎ সুনির্মল হ্যাচকা টান দিল দিল তার হাত ধরে। সরস্বতী অন্যমনস্ক ছিল। সামনে যে গাড়িটি এসে পড়েছিল, সেটাকে লক্ষ করেনি। সুনির্মলের শরীর স্পর্শ করে তার শরীর। এভাবে কোনদিন স্পর্শ করেনি তাকে সুনির্মল। তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কদম ফুলের ছোঁয়া লাগল যেন সমস্ত শরীরে। নেশাগ্রস্ত মাতালের মত টলতে টলতে সে ঢুকে গেল হোস্টেলে। সুনির্মলকে বিদায় জানাবার কথা মনে রইলনা তার।

পরদিন সকালেই দেবাশিস এসে হাজির। সরস্বতী ভাবেনি, রাত শেষে সকালেই সে এসে উপস্থিত হবে এভাবে। দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল সরস্বতী।

রাতের অনিদ্রার ছাপ তার চোখেমুখে। দেবাশিসকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত, ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে।

সরস্বতী তাকে কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই দেবাশিস হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। হোস্টেলের সুপার সহ দু'একজন বোর্ডার এসে জল বাতাস দিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করল। ভিজিটর্স রুমের লম্বা সোফায় শুইয়ে দেওয়া হোল তাকে। একটু পরে জ্ঞান ফিরে আসে দেবাশিসের। উঠে বসে সে।

সরস্বতী বাধা দিল।

—উঠোনা। বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। এত শরীর খারাপ নিয়ে বেরোবার কি দরকার ছিল?

দেবাশিস সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

—দরকার আছে। খুব দরকার। আমার সমূহ বিপদ। তোমার সঙ্গে কথা আছে সরস্বতী। এখানে বসে তা সম্ভব নয়। চলো, পার্কে যাই।

সরস্বতী অবাক হয়।

—এই সময়ে পার্কে? রোদে তোমার শরীর আরও খারাপ করতে চাও? কেন, এখানে অসুবিধা কি? এখন তো আমরা দুজনে ছাড়া আর কেউ এ ঘরে নেই। অন্য কোন ভিজিটরও এখন আসবে না।

দেবাশিস করুণ মিনতি করে। প্রায় কাঁদোকাঁদো শোনায় তার গলা।

—না, সরস্বতী, এখানে নয়। বাইরে চলো।

পার্ক খুব দূরে নয়। তবু দেবাশিস রিক্সা ডাকল। রিক্সায় উঠেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। তার কান্না দেখে সরস্বতী ভারী বিব্রত বোধ করে। রোদ আসছে, এই ওজুহাতে সামনের পর্দা টেনে দিল সে।

দেবাশিস সরস্বতীর দুই হাত তার বুকের ওপর ন্যস্ত করে।

—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়োনা, সরস্বতী। আমি বাঁচব না। আমায় তুমি দয়া করো।

সরস্বতী সব বুঝল। তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় খাক হয়ে যাচ্ছিল। দেবাশিসের যন্ত্রণা তার বুকটাকে করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করছিল। সরস্বতী আরও বুঝছিল, দেবাশিসের যন্ত্রণা দূর করতে সুনির্মলকে যে যন্ত্রণা সে দেবে, তার কষ্টও তাকে কম যন্ত্রণা দিচ্ছে না।

পার্কের সামনে এসে দাঁড়াল রিক্সা। সরস্বতী স্পষ্ট দেখল, রিক্সাওয়ালা অবাক হয়ে লক্ষ করছে দেবাশিসকে। দেবাশিসের কান্নার শব্দ তার কানে গিয়েছে।

সরস্বতীর মনে হোল, বড় ব্যক্তিত্বহীন দেবাশিস। মর্যাদাবোধ বড় কম তার। সে নিঃসন্দেহ, অনুরূপ পরিস্থিতিতে সুনির্মলের প্রতিক্রিয়া কখনই এরকম হোত না।

দেবাশিসের দুশ্চিন্তার কারণ যে সুনির্মল, তা আগেই বুঝেছিল সরস্বতী। কিন্তু সে জানত না, গত রাত্রে দেবাশিস তাদের ধারে কাছেই ছিল। মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়েছিল সে কাজের। তার উদ্দেশ্য ছিল, তাদের লক্ষ করা। সে দূর থেকে

অনেকক্ষণ অন্ধকারে তাদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেছে, গল্প করতে দেখেছে। সুনির্মল যে তাকে হাত ধরে আকর্ষণ করেছে, তাও তার চোখ এড়ায়নি। সরস্বতীদের পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ করেছিল সে হোস্টেল পর্যন্ত।

দেবাশিস শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সারা রাত সে বিনিদ্র থেকেছে। ভোর হতে না হতেই, প্রতিকারের জন্য হোস্টেলে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সরস্বতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। এসব তার অকল্পনীয়। সে জানত, দেবাশিস আর দশটা মানুষের মত দোষেগুণে সাধারণ মানুষ। কিন্তু আড়াল থেকে তাদের ওপর এভাবে সে গোয়েন্দাগিরি করবে, তা তার কাছে রীতিমত অভাবনীয়।

দেবাশিস যতটুকু চোখে দেখেছে, তাকেই অনেক বাড়িয়ে, রং চড়িয়ে নিজের মত করে একটি ছবি এঁকে নিয়েছে। সরস্বতীর প্রবৃত্তি হোল না, দেবাশিসের ভুলটুকু শুধরে দেয়।

হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত দেবাশিস। গত রাতেও সে লক্ষ করেছে, দেবাশিস নিজের হীনতাবোধ কাটিয়ে উঠে সহজ হতে পারছে না। কিন্তু তার নীচতা, সর্বোপরি তার নির্বুদ্ধিতা দেখে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা বোধ করল সরস্বতী।

একটু আগে দেবাশিসের জন্য সে মমতা বোধ করছিল। দেবাশিস যদি তার স্বভাবের ঐ অসুন্দর দিকটি এমন নির্বোধের মত তার সামনে অনাবৃত করে না দেখাত, তাহলে ভাল হোত। এই বিতৃষ্ণার ভার সে বইতে পারছে না। দুর্বলচিত্ততা সহ্য হয়, গোয়েন্দাগিরির নীচতা অসহ্য।

দেবাশিস ইনিয়ে বিনিয়ে একই কথা বলে চলল। সরস্বতী যেন তাকে ছেড়ে না যায়। তাহলে সে বাঁচবে না। আত্মহত্যা করবে। সরস্বতীর জন্য সে কি না করেছে? সরস্বতীর সুখের জন্য, তার শান্তির জন্য এতদিন যা কিছু করেছে, তা কি ভুলে গেছে সরস্বতী?

সরস্বতী তাকে আশ্বস্ত করল। নিজের মনকে শক্ত করে বেঁধে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল।

—শোন, তুমি কি চাইছ, আমি সুনির্মলের সঙ্গে আর দেখা না করি? ঠিক আছে, তাই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা করব না।

সরস্বতী ভেবেছিল, দেবাশিস সম্বিত ফিরে পাবে। মন থেকে আন্তরিকভাবে না হোক্, অন্ততঃ মুখের কথায় কিছুটা উদারতা দেখাবে। বলবে, না, সেরকম কোন চরম সিদ্ধান্ত নিতে সে বলছেনা সরস্বতীকে।

কিন্তু দেবাশিসের প্রতিক্রিয়া দেখে সে হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারল না। দেবাশিস তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় তাকে মিনতি করে।

—তুমি কথা দাও, এর অন্যথা হবে না। আমি তাহলে বাঁচবনা, সরস্বতী।

একই সঙ্গে করুণা ও বিতৃষ্ণার অনুভূতি ভাসিয়ে নিয়ে গেল সরস্বতীকে। তার জীবনে এই মানুষটির এক অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। একে সে ত্যাগ করবে কি

করে ? বিরাগ, বিতৃষ্ণা, দুঃখ, হতাশার ঘূর্ণীস্রোতে খাবি খেতে খেতে খড়কুটোর মত একে আঁকড়েই তাকে জীবনসমুদ্র সাঁতরে যেতে হবে।

শক্ত গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করল সরস্বতী তার কথাগুলি।

—কথা দিচ্ছি। এর অন্যথা হবে না।

হোস্টেলে ফিরে এসে সরস্বতীর মনে হোল নিজের হাতে তার মৃত্যুর পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিয়ে এসেছে সে।

তিন দিন পরে সুনির্মল এল, তার হোস্টেলে। ভজহরিকে বলে দিল সরস্বতী, সে যেন নীচে গিয়ে বলে, সে নেই। ভজহরিকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে সরস্বতী কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে বলল —'কারণ আছে। কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারব না। কতগুলো অসুবিধা আছে। কিন্তু তুমি এসব ওর কাছে বলোনা।'

সরস্বতী হঠাৎ দুর্বল বোধ করল। তার ইচ্ছা করল, একবার পেছন থেকে অন্ততঃ সুনির্মলকে দেখে আসে। ছাদে উঠে দেখতে পেল সে সুনির্মলকে। সুনির্মল ফিরে যাচ্ছে। তার হাঁটার ভঙ্গী ক্লান্ত, মন্থর, আনমনা। সরস্বতীর বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ল দমকা কান্না। শক্ত হয়ে অনেক কষ্টে সামাল দিল সে নিজেকে।

পর পর আরও কয়েকদিন সুনির্মল এল তার হোস্টেলে। সরস্বতী দেখা করল না। তার নির্দেশমত ভজহরি বলে দিল, সে হোস্টেলে নেই।

সুনির্মল নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুমান করল। হোস্টেলে আসা বন্ধ করল সে। সরস্বতী নিশ্চিন্ত হোল। অতঃপর সুনির্মলের অধ্যায় শেষ হোল। আর তাকে টানাপোড়েন সইতে হবেনা।

কিন্তু কয়েকদিন পর নিখিলবাবুর কাছে থেকে একটি পত্র আসল সরস্বতীর নামে। সংক্ষিপ্ত, সাদামাটা তার বক্তব্য। শিগগিরই জার্মানী যাচ্ছে সুনির্মল। তার আগে সরস্বতী যেন সময় করে অবশ্যই একবার দেখা করে তার সঙ্গে। সুনির্মলের বিরুদ্ধে তার যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে স্পষ্ট করে সামনাসামনি তার মীমাংসা করে ফেলাই ভাল নয় কি? সুনির্মলের মত ছেলে হাজারে একটি মেলে না। এমন কি গর্হিত অপরাধ সে করে বসেছে যে, তার জন্য তাকে এমন গুরু দণ্ড পেতে হচ্ছে? একবার অন্ততঃ তার সঙ্গে দেখা করলে ক্ষতি কি?

অপ্রয়োজনবোধে জবাব দিল না সরস্বতী সেই চিঠির। কিন্তু ঘুরতে ফিরতে বুকের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল সুনির্মলের চিন্তা। সুনির্মল বিদেশে যাচ্ছে। তবু তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। দেবাশিসের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে। সুনির্মলের স্মৃতি এক গভীর দুরারোগ্য ক্ষতের মত তাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু সে নিরুপায়। তার কিছু করণীয় নেই।

নিখিলবাবু নাছোড়বান্দা। জবাব না পেয়ে আরও দু'বার পত্রাঘাত করলেন। শেষ চিঠির বক্তব্য হোল, আগামী পরশু সুনির্মল রওনা হচ্ছে। দয়া করে কয়েক

মিনিটের জন্যও কি তার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া সম্ভব নয় সরস্বতীর পক্ষে ? সুনির্মল খুব মনমরা হয়ে রয়েছে। তার কষ্ট চোখে দেখা যায়না। সুনির্মল তাকে লিখতে বারণ করেছিল। কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখছেন। সরস্বতী কি তার দাদার এই সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করবে না ?

বলাবাহুল্য, সরস্বতী এবারও কোন জবাব দিল না! সুনির্মলকে সে নির্মম হাতে ছেটে ফেলে দিল আগাছার মত। দেবাশিসের জন্য তাকে যে 'বাগান সাজাতে হবে, সেখানে সুনির্মল তো আগাছাই।

অতঃপর সব কিছু আবার আগের মত সহজ হয়ে গেল। দেবাশিস নিয়ম করে নির্দিষ্ট দিনে আসে, গল্প করে, সরস্বতীকে বেড়াতে নিয়ে যায়। সুনির্মলের নাম সে বা সরস্বতী ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করে না।

মাঝে মাঝে অমলাদি কিংবা পার্বতী সুনির্মলের প্রসঙ্গ তোলে। সরস্বতীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানায়। সুনির্মলের প্রতি সরস্বতী সুবিচার করে নি। তাকে এত কষ্ট দেওয়ার কোন অধিকার নেই তার।

নিঃশব্দে শুনে যায় সরস্বতী। প্রতিবাদ করে না। আত্মসমর্থনেরও চেষ্টা করে না। জীবনের গতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ভাগ্য তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কতটুকু ক্ষমতা তার ? ভাগ্য সর্বশক্তিমান। সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

কিন্তু সরস্বতীর চিন্তা এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। ভাগ্য কি ? তার সংজ্ঞা কে বলে দেবে তাকে ? জীবনে যা ঘটে, তার যোগফলই কি ভাগ্য ? তার বুদ্ধি, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কি কোন দায় নেই ?

সরস্বতী এর আগে কোনদিন এভাবে তলিয়ে ভাবে নি। এমনকি বাড়ি ছেড়ে যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনও এভাবে সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখেনি।

এখন ভাবতে গিয়ে বিপর্যস্ত বোধ করল। সে যেন গোলকধাঁধার মধ্যে কেবলি ঘুরপাক খেতে লাগল। ভাগ্য কি আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে, না আমরাই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করি ? আমাদের বুদ্ধিই কি সব কিছুর নিয়ন্তা, না কি ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের চিন্তাভাবনা, বুদ্ধি ?

আমরা যে বিশেষ পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষভাবে তার মোকাবিলা করি, তার কারণ কি, ভাগ্যই আমাদের ওভাবে চালিত করে ? তাহলে 'কর্মফল' কথাটা কি অর্থহীন নয় ?

কিংবা কর্মফল ভবিষ্যপ্রভাবী। ইহজন্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক পরজন্মের সঙ্গে। ইহজন্মের ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সুখদুঃখের কার্যকারণসূত্র তাই খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্বজন্মের সঙ্গেই থাকে তার সম্পর্ক ?

বড় জটিল এই প্রশ্ন। তার কোন সদুত্তর জানা নেই তার। আমরণ তাকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যেতে হবে। কিন্তু সে কি তার উত্তর খুঁজে পাবে কোনদিন ?

॥ তের ॥

কেউ চিরদিনের জন্য হোস্টেলে থাকতে আসেনা। সরস্বতীর রুমমেট চিত্রিতার ট্রেনিং শেষ হোল। সে চলে গেল তার বাড়ি। সরস্বতীর মন খারাপ হয়ে গেল। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পথে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দাদাদের। গাড়িতে বসে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকায় তারা পদচারিনীর দিকে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছোড়দা। সে নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্যমে, একটি কারখানা গড়ে তুলেছে। বেশ কয়েকজন লোক সেখানে কাজ করছে। চোখে পড়লে, গাড়ী থামিয়ে সরস্বতীর কুশল সংবাদ নেয় একমাত্র সে-ই।

বাড়ির খবরাখবর পায় সে ছোড়দার কাছে। দেবাশিসের কাছেও কখনও কখনও মেলে কোন বিশেষ সংবাদ। তবু পরিবারের লোকজন তার কাছে মৃতবৎ। জীবিত মানুষের মত লেনদেন যখন তাদের সঙ্গে নেই!

হোস্টেলের মানুষগুলি অনেক বেশি আপনজন এখন। সরস্বতী জানে, হোস্টেল আসলে এক পান্থনিবাস। প্রয়োজনে মানুষ এখানে আস্তানা খোঁজে। প্রয়োজন ফুরোলে, যে যার স্থায়ী আস্তানায় ফিরে যায়। এখানে কেউ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে থাকতে আসে না। তবু চিত্রিতা চলে যাওয়াতে বড় খালি খালি বোধ হোল তার।

কিছুদিন পর পার্বতীও চলে গেল। তার দাদা কলকাতায় চলে এসেছে। ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া করেছে। দাদা বউদি, তাদের একটি মেয়ে, আর তার বিধবা মায়ের সঙ্গে সে এখন থেকে ভবানীপুরেই থাকবে। মায়ের ইচ্ছা নয়, সে হোস্টেলে থাকে।

সরস্বতী আরও বেশি মুষড়ে পড়ল। পার্বতীর সান্নিধ্য তার কাছে অনেক দামী অনেকের চেয়ে। পার্বতীর পড়াশোনার পরিধি অনেক বিস্তৃত। তার কাছে সে বহির্জগতের বিষয়ে অনেক পাঠ নিয়েছে। পৃথিবীর সীমানা যে কত বিশাল, তা সে জেনেছে পার্বতীর কাছেই।

একে একে অনেকে চলে গেল হোস্টেল ছেড়ে। কারুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কেউ বা পড়া শেষ করেছে। কেউ হয়ত মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল এখানে। সমঝোতা হতে 'পুনর্মূষিকো ভব' হয়ে ফিরে গেছে বাড়িতে।

সরস্বতীর যাবার জায়গা কৈ? সে রয়ে গেল। ইতিমধ্যে বি. এ. পাশ করেছে সে। কাগজ দেখে চাকরি খুঁজছে এখন। দেবাশিসকে না জানিয়ে। দেবাশিস চাকরি করা পছন্দ করে না। কোনটাই তার কপালে লাগছে না।

এরমধ্যে বিশাখাদিকে নিয়ে এক কাণ্ড ঘটল একদিন। খুব বেশি মাত্রায় মদ্য পান করে এমন মাতলামি সুরু করলেন যে, সুপার বাধ্য হলেন তাকে জবাব দিতে। বিশাখাদির ওপরে এমনিতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিশাখাদির অবাধ পুরুষ-সংসর্গের কথা চাপা ছিল না। তাদের অনেকেই একাধিকবার হোস্টেলে এসেছে।

তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে কোন ধরনের, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবু বিশাখাদির প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভেবে সুপার ইতঃস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু মাতলামি একটা সঙ্গত কারণ হতে পারে। বিশাখাদি বিনা প্রতিবাদে হোস্টেল ছেড়ে চলে গেলেন।

সবকিছু সত্ত্বেও, সরস্বতীর মন খারাপ হয়ে গেল। বিশাখাদির এক তীব্র আকর্ষণ আছে। তার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা যতখানি সত্যি, ততখানিই সত্যি তার প্রাণপ্রাচুর্য ও হৃদয়বত্তা।

হোস্টেলের পরিবেশ অনেক নিরানন্দ হয়ে গেল। পুরনো বোর্ডারের জায়গায় নতুন বোর্ডার এলো। সকলের সঙ্গে সমান সম্পর্ক তৈরি হয় না। কিন্তু একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল সরস্বতীর।

কোন কিছুই নাকি শূন্য থাকেনা। শূন্য থাকতে পারে না। বিশ্বজগতের নিয়মনীতি সেকথাই বলে। পার্বতী চিত্রিতারা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, অমরজিৎ কাউর এলো হোস্টেলে। সরস্বতীর হৃদয়ের শূন্যতা অনেকখানিই পূরণ করল সে।

হোস্টেলের তিনতলাটি অবাঙ্গালী মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু অমরজিৎ যখন এল, তখন সেখানে একটি সীটও খালি নেই।

সরস্বতীর সঙ্গে তার পরিচয় হোল নাটকীয়ভাবে। তখন দুপুর বেলা। হোস্টেল প্রায় খালি, সুনসান। মেয়েরা যে যার কর্মস্থলে। সরস্বতীর মত দু' চারজন কোন না কোন কারণে রয়ে গেছে তখন হোস্টেলে।

একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল সরস্বতী। তার এক রুমমেট বাসন্তী চলে গিয়েছে স্কুলে। অপর রুমমেট বাড়ি গেছে দিন দুই আগে। আজকালের মধ্যেই ফেরার কথা তার।

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সরস্বতী।

—আসতে পারি?

চোখ তুলে সে দেখতে পায়, চুড়িদার পরা এক রূপসী পাঞ্জাবী মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সরস্বতী অবাক হোল। তার সঙ্গে এই মেয়েটির কি দরকার থাকতে পারে? দুপুরবেলা হোস্টেলের গেট বন্ধ থাকার কথা। অবাঞ্ছিত লোক-জন সুযোগ খোঁজে বিশেষ বিশেষ সময়েই।

খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই তার মনের সংশয় দূর হোল। মেয়েটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হোস্টেলের ঠাকুর ওরফে সর্বেসর্বা কর্তা বনমালী। সরস্বতী বুঝতে পারে, বনমালীই নিয়ে এসেছে মেয়েটিকে তার কাছে।

অবাঙ্গালীসুলভ উচ্চারণে বাংলায় কথা বলল মেয়েটি। সরস্বতীর ঘরে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় চায় সে। তিনতলায় কয়েকদিন পর একটি সীট খালি হবে। তখন সেখানে চলে যাবে। সরস্বতী যদি তাকে দয়া করে, তাহলে খুবই উপকৃত হয় সে।

সরস্বতী কিছু বলার আগেই বনমালী তার আর্জি পেশ করল।

—সরস্বতী দিদি, তোমার কাছে সাহস করে নিয়ে এসেছি। খুব অসুবিধায় পড়েছেন এই দিদি। কলকাতায় থাকার জায়গা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলতে সাহস হয় না।

কথাটা বেঠিক নয়। বনমালীর সঙ্গে সকলের সম্পর্ক ভাল না। তার কর্তৃত্ব-পরায়ণতা, তার অসাধুতা, তার ফন্দীফিকির অনেকেরই চক্ষুশূল। সরস্বতীকে সে প্রথম থেকেই কি জানি কেন, সুনজরে দেখেছে। সরস্বতী লক্ষ করেছে, অনেক সময়েই তার পাতে মাছের বড় টুকরোটা পড়ে, পায়েস হলে অপরের তুলনায় বেশি পরিমাণ পায়েস জোটে তার কপালে। সকলের সামনে বনমালীকে তা নিয়ে কিছু বলা যায় না। কিন্তু মনে মনে মরমে মরে থাকে সে।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মায়া হোল সরস্বতীর। সৌন্দর্যের সঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে চেহারায়। দেখলেই বোঝা যায়, ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে, এভাবে কেউ অনুরোধ করে না। একদিন তারও দরকার হয়েছিল এমন একটি আশ্রয়ের। ডাক্তার মেশোমশায়ের কাছে, গিরিজার কাছে, ও পরে এই হোস্টেলে আশ্রয় পেয়েছিল।

মনস্থির করতে দেরি হোল না সরস্বতীর। তিনতলার সীট খালি না হওয়া পর্যন্ত অমরজিৎ তার সঙ্গে থাকবে। তারা দুজনে এক খাটে শোবে। বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখন থেকেই। সরস্বতীর অনুমান যথার্থ। ধনী পরিবারের মেয়ে অমরজিৎ। বাবা মাকে অল্প বয়সে হারিয়েছে। পরে কলকাতায় চাচা চাচীর কাছে মানুষ হয়েছে। দিল্লীতে তাদের বাড়িঘর রয়েছে। চণ্ডীগড়ে রয়েছে তাদের অনেক সম্পত্তি। বর্তমানে আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজে কনডেন্সড কোর্সে ডাক্তারী পড়ছে।

চাচা চাচীর কাছে থাকা আর সম্ভব নয়। অমরজিৎ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের এক বাঙ্গালী ছাত্রের প্রেমে পড়েছে। চাচা চাচীর কানে গিয়েছে সে খবর। তাদের মনঃপুত নয় এই ব্যাপারটা। নিত্য কথা কাটাকাটি, বিবাদ বিসংবাদ তা নিয়ে। শেষে অতিষ্ঠ বোধ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে; এই হোস্টেলের খোঁজ পেয়েছে সে তার বন্ধু বিভাস মিত্রের কাছে।

দশ দিন ছিল অমরজিৎ তার সঙ্গে। সরস্বতীর প্রতি এত গভীর ছিল তার কৃতজ্ঞতাবোধ যে, তার জন্য কি করবে, ভেবে পেত না। সকালে বিকালে জলখাবারের খুব পটাবা অমরজিতের। রুটিতে পুরু করে মাখন মাখিয়ে, তার সঙ্গে ডিম, কলা দুধ দিয়ে সে তার নাস্তা সারত। সরস্বতীকে তার ভাগ নিতে হোত। না নিলে দুঃখ পেত অমরজিৎ। এমন আন্তরিক ছিল তার দুঃখ যে, সরস্বতীর কষ্ট হোত সেই ভালবাসার দান প্রত্যাখ্যান করতে। পয়সার অভাব ছিল না অমরজিতের। দেশ থেকে ভাল ঘি আসত, আসত ভাল দামী মিঠাই, ফল। সরস্বতী না খেলে, সেও খাবে না বলে শাসাত। সরস্বতীর কোন উপায় ছিল না তাকে অস্বীকার করে।

দশ দিনে তারা পরস্পর পরস্পরের অতীত ইতিহাস শুনলো। অত অল্প সময়ে এতখানি বন্ধুত্ব সম্ভব হোত না, যদি না ওরকম নাটকীয়ভাবে অমরজিৎ আশ্রয়ের খোঁজে তার কাছে আসত। দশ দিন পর, তিনতলার একটি সীট খালি হোল। অমরজিৎ চলে গেল সেখানে। কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকল। দেশ থেকে ভালমন্দ খাবার এলে তার ভাগ সরস্বতীকে না দিলে অমরজিতের যেন শান্তি হোত না।

সরস্বতীকে নিয়ে মাঝে মাঝে সে এখানে ওখানে বেড়াতে যায়। অমরজিৎ সরস্বতীকে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হতে বলে। সরস্বতীর অনাগ্রহ নেই সে ব্যাপারে। কিন্তু দেবাশিস আগ্রহ দেখায় না। সরস্বতীর তাই সঙ্কোচ হয়। দেবাশিসের ওপর আর কত চাপ দেবে?

অমরজিৎ সরস্বতীকে পীড়াপীড়ি করে। তার টাকার অভাব নেই। দান হিসাবে না নিক, অন্ততঃ ধার হিসাবে তো নিতে পারে সরস্বতী টাকাটা তার কাছে। পরে নয় শোধ করে দেবে। এভাবে বসে থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে কেন?

সরস্বতী রাজী হোল না। ঋণের বোঝা এত বাড়াতে চায় না সে। বরং যদি চাকরি পেয়ে যায়, তাহলে তার ভার অনেক লাঘব হয়। দেবাশিসের তাতে মত থাকবে না, সে জানে। তবে যেভাবে হোক, দেবাশিসকে রাজী করাবে।

অমরজিৎ একদিন তাকে এণ্টালীতে তার বন্ধু বিভাস মিত্রের বাড়ি নিয়ে গেল। বিভাসের কথা সে আগেই শুনেছিল। অমরজিৎ তাকে বিভাসের লেখা চিঠিপত্রও দেখিয়েছিল। তবে চাক্ষুষ পরিচয় বাকি ছিল। অমরজিতের ইচ্ছা, বিভাসকে দেখে সরস্বতী। বিভাস তো তার সমাজের লোক। সে বুঝতে পারবে, কেমন ধরনের ছেলে বিভাস।

বিভাসের বাড়িতে তার আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হোল সরস্বতীর। চমৎকার ছেলে সব। প্রায় সকলেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। সরস্বতীকে যে তাদের বেশ পছন্দ হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হোল না সরস্বতীর।

বিভাসের এক বন্ধু কাস্টম্‌স্‌-এ কাজ করে। নাম সুনীল সেন। দেবাশিসকে চেনে। অমায়িক স্বভাব। তার সঙ্গেও খুব আলাপ হোল সরস্বতীর।

বিভাসের সঙ্গে থাকে তার ছোট ভাই প্রভাস। বাবা থাকেন পূর্ববঙ্গে। বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই। সামনের এক রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়েছিল সে সকলের জন্য। তার সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল মদ্যপানের।

সরস্বতীর বাপের বাড়িতে মদ্যপানের রেওয়াজ আছে। তার বড় দাদাকে বাদ দিলে আর সকলেই মদ্যপানে অভ্যস্ত। বৌদিদের মধ্যেও কেউ কেউ অল্পস্বল্প মদ্যপান করে। সে নিজেও একটু আধটু চেখে দেখেনি, তা নয়। মদ্যপান সম্পর্কে তার মনে কোন সংস্কার নেই। অমরজিতের সঙ্গে সেও মদ্যপান করল। অবশ্যই মাত্রা বজায় রেখে।

বিভাসকে তার খুব ভাল লাগল। হোস্টেলে ফিরে অমরজিৎকে সেকথা জানাতে অমরজিৎ যেন নিশ্চিন্ত হোল। বিভাসের মা নেই। রংপুরে তাদের জমিদারী

আছে। বাবা সেখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। কলকাতায় আসতে চাননা। বিভাস ও প্রভাসের নামে মোটা টাকা আসে দেশ থেকে। অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে চলে যায় তাদের দুজনের।

অমরজিতের কথা সে এখনও জানায়নি তার বাবাকে। তার ধারণা, বাবা মত দেবেন না। তবে বাবার মতামতের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। অমরজিৎ সম্পর্কে সে মনস্থির করে ফেলেছে। তাদের বিয়ে কেউ আটকাতে পারবে না।

অমরজিৎ মাঝে মাঝে তার ভবিষ্যৎ সংসারের ছবি আঁকে। তাদের বিলেত যাওয়ার কথা। বিভাসের ইচ্ছা, যেখানেই থেকে যাবে। তার নিজের তা ইচ্ছা নয়। তবু বিভাসের ইচ্ছের বিরোধিতা করবেনা।

সরস্বতী সব শোনে। কেমন এক হীনমন্যতাবোধে সে আক্রান্ত হয়। দেবাশিস বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে না। সরস্বতীর ওপর দখলদারির ব্যাপারে সে যতখানি সজাগ, ততখানি সজাগ বিয়ের ব্যাপারে নয়। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? এর পরিণতি কি?

অমলাদিও সেকথাই বলেন। সরস্বতীকে তিনি বলেন, তার আগের বিবাহ বাতিলের জন্য সচেষ্ট হোক সে। দেবাশিসকে বলুক। নাহলে দেবাশিসের সঙ্গে তার বিয়ে তো বৈধ বলে গণ্য হবে না।

দেবাশিসের অফিস আছে, বাড়িতে দায়দায়িত্ব আছে। তার পক্ষে ব্যাপারটা নিয়ে লেগে থাকা সম্ভব হয় না। সরস্বতীর কথা শুনে এর তার সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুরাহাই হয় না।

অমলাদির কাকার বন্ধু স্বদেশ বসু দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজে ইতিহাস পড়ান। তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমান মুখার্জী পেশায় অ্যাডভোকেট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ বিভাগে আইন পড়ান। অমলাদির অনুরোধে এই বন্ধুটির সঙ্গে সরস্বতীর বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে সেই বিবাহ বাতিল করা যায়, তা নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ চলল দুজনের মধ্যে।

বিমান মুখার্জী সরস্বতীর মামাশ্বশুরকে চেনেন। তার হয়ে একাধিক মামলা লড়েছেন। গোপালকৃষ্ণের সঙ্গেও ভালরকম পরিচয় আছে। তবে তার বিবাহের কথা জানেন না। বন্ধুর কথামত সরস্বতীর স্বামী গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। তাকে অনুরোধ করলেন, সে যেন কোন ওজুহাতে বিয়েটা একতরফা বাতিল করে দেয়। বিবাহ বাতিলের জন্য যে সমস্ত কারণ আইনমতে সঙ্গত বলে গণ্য হয়, তার মধ্যে যে কোন একটি ইচ্ছামত বেছে নিক। সরস্বতী তার সঙ্গে সহবাস করছে না। আর কোনদিন যে করবে, তারও সম্ভাবনা নেই। বিয়ে বাতিল হলে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল।

গোপালকৃষ্ণ গা করল না। যা করার, মামারা করবেন বলে এড়িয়ে গেল বিমান বাবুকে। সব শুনে স্বদেশবাবু আপশোস করলেন।

—আমার মনে হয়, সরস্বতীকে ও সহজে মুক্তি দেবে না। ওকে ভোগাবে।

অমলার কাছে শুনেছি, সরস্বতীকে ও নিয়ে যেতে চেয়েছিল পরে। সরস্বতী রাজী হয়নি। ঐ অপমানের কথা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে?

বিমান বাবু কিছুদিন লেগে থাকলেন। নানাভাবে চেষ্টাচরিত্র চালালেন। কিন্তু গোপালকৃষ্ণকে কব্জা করতে পারলেন না। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল, আর এগোল না।

সরস্বতীর কানে সব কথাই গেল। সে বুঝল, তার রাশিচক্র তাকে আরও অনেকদিন ঘুরপাক খাওয়াবে। শত চেষ্টাতেও আর তার অন্যথা হবে না।

হঠাৎ একদিন সুনির্মল এসে উপস্থিত হোস্টেলে। সরস্বতী জানত, জার্মানীতে তার আরও কিছুদিন থাকার কথা। জার্মানী থেকে সুনির্মল তাকে দু'বার চিঠি লিখেছিল। তাতে সেরকমই ইঙ্গিত ছিল। এখনই তার ফেরার কথা নয়। ভজহরির কাছে ভিজিটর আসার খবর পেয়ে নীচে নেমে সুনির্মলকে দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। তাকে অভ্যর্থনা জানাতেও ভুলে গেল।

সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল।

—গত পরশু জার্মানী থেকে ফিরেছি। তোমায় দু'দু'বার চিঠি লিখেছিলাম জার্মানী থেকে। তুমি তার উত্তর দাও নি। বুঝেছি, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও না। কিন্তু তার জন্য এসবের কি দরকার ছিল? আমাকে স্পষ্ট করে বললেই আমি আর বিরক্ত করতাম না তোমাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও। যে ভদ্রলোককে তুমি নির্বাচন করেছ, তিনি যেন তোমায় সুখী করেন। আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। যদি কখনও দরকার হয়, তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। নিখিলদার কাছে আমার ঠিকানা পাবে।

এক তোড়ে এতগুলো কথা বলে চলে গেল সুনির্মল। সরস্বতী তাকে ভাল করে চেয়ে দেখতেও পারল না। কিন্তু সুনির্মল তার পুরনো কাটা ক্ষতে খুঁচিয়ে দিয়ে গেল। সরস্বতী দেখল, সুনির্মলকে সে আজও ভোলেনি।

সরস্বতী মাঝে মাঝেই বিমর্ষ বোধ করে। আগের স্ফূর্তি আর উচ্ছ্বাস একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছে সে। তার কেবলি মনে হয়, তার জীবন আর রাহুমুক্ত হবে না। ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে সে। ঘরে আর তার স্থান হবে না। হোস্টেলেই কাটিয়ে দিতে হবে তাকে আমৃত্যু। স্থিতি, নিরাপত্তা, সংসারের আশ্রয় তার বেদখল হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

অমরজিৎরা খুব শিগগিরিই বিয়ে করবে। বিভাসের পরীক্ষা হয়ে গেছে। অমরজিতেরও পড়া শেষ। ওরা আর দেরি করবে না। অতঃপর অমরজিতের পালাও শেষ। কিন্তু সরস্বতীর জন্য দেবাশিস এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখে গেছে যেন। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তার।

অমলাদি বয়সে সরস্বতীর চেয়ে অনেকটাই বড়। শাকায় বন্ধু স্বদেশ বসুর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে অনেক কথাই কানে এসেছে সরস্বতীর। কৌতূহল হলেও, সংকোচ বোধ করেছে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করতে। অমলাদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

কোনদিন কিছু বলেন নি। সরস্বতীও ভরসা করে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। অমলাদি তার হিতাকাংখী। তার বিরাগভাজন হতে মন চায়নি সরস্বতীর।

কিন্তু কিছুদিন পর অমলাদি যখন নিজের মুখে জানালেন যে, তিনি স্বদেশ বসুর বাড়িতে চলে যাচ্ছেন, তখন যেন বজ্রাহত হোল সরস্বতী। সে শুনেছিল, অমলাদির সঙ্গে স্বদেশ বসুর স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল না। ভদ্রমহিলা নাকি একবার মারধরও করেছিলেন অমলাদিকে। এক রকম বাধ্য হয়েই হোস্টেলে এসে উঠেছিলেন অমলাদি। আবার সেখানে সাধ করে কেন অপমানিত হতে যাচ্ছেন তিনি?

অমলাদি তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলেন, কে জানে? সলজ্জ ভঙ্গীতে কৈফিয়ত দিলেন যেন তিনি সরস্বতীকে।

—কাকিমা বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন। কাকার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছেন।

সরস্বতীর হাসি পেল। অমলাদি 'কাকা', 'কাকিমা' সম্বোধনগুলো বাদ দিলে পারেন।

সুপারের সঙ্গে অমলাদির সম্পর্ক বন্ধুত্বের। সুপার মানুষটি খারাপ না। অনেক খবর রাখেন তিনি অমলাদির কাকা কাকিমার সম্পর্কে। তার কথা শুনে সরস্বতী স্তম্ভিত। স্বদেশ বসু নাকি মারধর করে স্ত্রীকে তাড়িয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিলনা। অমলাদির আবির্ভাবের পর, সেই সম্পর্কের অনেক অবনতি ঘটেছে।

সুপারের এক আত্মীয় স্বদেশ বসুর প্রতিবেশী। তার কাছে এসব তথ্য জেনেছেন। সরস্বতী দেখল, সে অন্যদের কাছে যা শুনেছিল, তা মিলে যাচ্ছে। সুপার স্পষ্ট করে না বললেও সরস্বতীর বুঝতে অসুবিধা হোল না, স্বদেশ বসুর সঙ্গে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন অমলাদি। কোন বিবাহিতা স্ত্রী তা সহ্য করতে পারেন না। স্বদেশ বসুর স্ত্রীও পারেন নি। অতএব অমলাদির সঙ্গে খটাখটি হাতাহাতি লেগেই থাকত। তার জের হিসাবে স্বামীর কাছে জুটত নির্দয় প্রহার। এখন স্ত্রীকে তাড়িয়ে নিষ্কণ্টক হয়েছেন ভদ্রলোক। আবাহন জানিয়েছেন অমলাদিকে তার বাড়িতে।

অমলাদি হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে সরস্বতী আরও মুষড়ে পড়ল। ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে অমরজিৎ খুব ব্যস্ত এখন। বিয়েটা সেরে যাবে তারা এখানেই। সরস্বতীকে সেই কারণে সময় দিতে পারেনা অমরজিৎ।

সরস্বতীর একা একা লাগে। মাঝে মাঝে তার খুব অভিমান হয় দেবাশিসের ওপর। দেবাশিস যেন কেমন আলগা হয়ে আছে। সে যদি একটু উঠে পড়ে চেষ্টা করত, তাহলে হয়ত ডিভোর্সটা পাওয়া যেত। তাদের দুজনের বিয়েটা ঠেকে থাকত না। নিজের মুখে এসব বলতে তার বাধে। নিজেকে এত ছোট করা যায় না।

ঈশ্বর বোধ হয় সব সময় উল্টা বোঝেন। হোস্টেলের পরমায়ু তারও ফুরিয়ে

এল শিগগির। শুধু সে নয়, অনেকেই বাধ্য হোল হোস্টেল ছাড়তে। হোস্টেল আর তাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় রইল না। অথচ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত, তা অত্যন্ত তুচ্ছ, মামুলী একটা বিষয়।

পাম্প চালাতে দেরি করেছিল বনমালী। সাধনাদি খুব রগচটা স্বভাবের। স্নান করতে ঢুকে জল না পেয়ে বনমালীকে কষে ধমক লাগান। বনমালী তার দোষ স্বীকার না করে উল্টে এমন বিশ্রীভাবে তার জবাব দিল যে, সাধনাদি মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। বৈশাখ মাসের গরম তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পায়ের চটি খুলে বনমালীর দিকে তেড়ে গেলেন তিনি। বনমালী সেই অপমান সহ্য করার মানুষ নয়। সেও তার চটি খুলে সাধনাদিকে মারতে গেল।

অন্য মেয়েরা ক্ষেপে গেল। তাদের তেড়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে চলে গেল বনমালী তখনকার মত। মেয়েরা সুপারের কাছে বনমালীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। তাদের দাবি, বনমালীকে ছাড়াতে হবে। এরকম দুর্বিনীত বেয়াদব লোককে হোস্টেলে রাখা চলবে না।

সুপারের ইচ্ছে ছিলনা, অতটা চরম ব্যবস্থা নেন। তিনি একটি শান্তিপূর্ণ ফয়সালা করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মেয়েদের সকলের সম্মিলিত দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। অতএব বনমালীকে ডেকে তাকে হোস্টেল ছাড়ার নোটিস দিলেন। মেয়েরা কয়েকজন থানায় গিয়ে এফ. আই. আর. করে এল বনমালীর বিরুদ্ধে।

বনমালী ভয় পেয়ে হোস্টেল ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু বিপদ কাটল না। সে দু'চারজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রায় নিয়ম করে প্রতি রাত্রে মত্ত অবস্থায় মেয়েদের ঘরের দরজায় জানলায় ধাক্কা দিতে লাগল, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগল।

ক্রমাগত এরকম ঘটনা ঘটতে থাকায় মেয়েরা ভয় পেয়ে গেল। একে একে অনেকেই হোস্টেল ছেড়ে চলে গেল। সরস্বতী ভারী বিপদে পড়ল। নতুন হোস্টেল খুঁজে নেওয়া বড় সহজসাধ্য নয়। দেবাশিসের পক্ষে বাইরে থেকে হোস্টেল খোঁজা সম্ভব নয়।

অমরজিৎ তার বিপদভঞ্জন করল। বিভাসের যে বন্ধুটি কাস্টমসে কাজ করে, তাদের পৈত্রিক বিরাট বাড়ি। তারা সাত ভাই। তাদের কোন বোন নেই। বিভাসের অনুরোধে সে অমরজিৎ ও সরস্বতীকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তার মা খুশি হয়েই গ্রহণ করলেন দুজনকে।

শিগগিরই অমরজিৎ চলে গেল দিল্লী। বিয়েটা সেখানেই হবে। বিভাস মিত্র কলকাতায় তার জরুরী কাজকর্ম সেরে পরে দিল্লী যাবে। সরস্বতী একা হয়ে গেল সেই বাড়িতে।

কিন্তু তার নিঃসঙ্গতা পীড়াদায়ক হলোনা এই কারণে যে, সুনীল সেনের মা তাকে কন্যাবৎ স্নেহ করেন। সুনীল সেন ও তার ভাইরা তাকে বোনের মত দেখে। কোন রকম অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হোলনা তাকে। বরং

এখানে সকলের আদরযত্নে নিজের হৃতমূল্য সে পুনরুদ্ধার করে। সরস্বতী ভাবেনি সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক পরিবারে এত সমাদর পাবে।

এ বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে রয়েছেন, ছেলেদের মা আর একজন রাঁধুনি। কিন্তু বাড়ির সাতজন ছেলের একজনের মধ্যেও কোন বৈপরীত্য চোখে পড়ল না সরস্বতীর। সরস্বতীকে কেন্দ্র করে তাদের বঞ্চিত আকাঙ্খা যেন পরিতৃপ্ত হোল। তারা সাত ভাই চম্পা, তাদের এক বোন পারুল সরস্বতীকে তাদের স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে দিল।

তাসত্ত্বেও, সরস্বতীর মনে মাঝেমাঝে হানা দেয় একটি প্রশ্ন। 'এভাবে আর কতদিন?' সরস্বতী বোঝে, বহমান জীবনস্রোতে পাড়ি দিয়ে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। যে ঘাট থেকে তার যাত্রা সুরু হয়েছিল, সে ঘাটে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা গৌণ হয়ে গেছে। ক্রমাগত এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে এসে উপস্থিত হচ্ছে সে। সে এক চিরন্তন মুসাফির। যাকে ক্রমাগত তল্পিতল্পা নিয়ে বারবার পুরনো আস্তানা ছেড়ে পথে নেমে আসতে হয়। আবার নূতন আস্তানা খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু সেই নূতন আস্তানাও শিগগিরই পুরনো আস্তানা হয়ে যায়। আবার 'চল মুসাফির' বলে বেরিয়ে পড়তে হয় পথে।

সরস্বতীর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মনও বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে স্থিতি চাইছে. সরস্বতী ভাবে, কেন তাকে এভাবে বাসাবদল করতে হচ্ছে বারবার? সে কি কোনদিন কাকের বাসা ভেঙ্গে দিয়েছিল দুষ্টুমি করে? ছোটবেলায় ডানপিটে ছিল সে। কোনদিন আর পাঁচটা মেয়ের মত পুতুল নিয়ে খেলেছে বলে মনে পড়েনা। তবে ছেলেদের মত পাখির গায়ে ঢিলও ছোড়েনি কোনদিন। প্রজাপতি ধরে তাকে দুহাতে পিষে মেরে ফেলেনি। কুকুর বিড়ালের গায়ে জল ছিটিয়ে, কিংবা তাদের গায়ে লাঠির আঘাত করে নিষ্ঠুর আনন্দ খোঁজেনি!

ছোটবেলায় ভায়েদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলেছে। তাদের সঙ্গে বিশাল বিস্তৃত বাঁশবনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। খেলাচ্ছলে বাঁশের মাথায় হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে এসেছে। বাঁশটা বাড়তে পারেনি। তার ডগাটা দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে গিয়েছে। কিন্তু কোন অবোলা প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে মজা লোটার কথা ভাবেনি।

বরং সরস্বতী তাদের বাড়ির অনেক নিষ্ঠুর রীতিনীতি পছন্দ করেনি। তাদের বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান ঘিরে যে পুকুর ছিল, সেখানে বোয়াল মাছ অন্য মাছেদের খেয়ে ফেলত বলে মাঝে মাঝে তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হোত। বোয়াল মাছের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। সরস্বতীর কষ্ট হোত। সে কাঁদত, রাগ করত, তার বিরুদ্ধে অক্ষম জেহাদ ঘোষণা করত। তার দাদারা মজা পেত। তারা তাকে ক্ষেপাত, উত্তেজিত করত।

জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় তাদের বাড়িতে পাঁঠাবলি দেওয়া হোত। বলির পাঁঠার আর্তনাদ শুনে সরস্বতী কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে দূরে সরে যেত। অথচ বাড়ির

অন্য বাচ্চারা সেখানে উপস্থিত থাকত। হাড়িকাঠে বাঁধা পশুকে দেখে তীব্র উল্লাসে ফেটে পড়ত। বলির পশুর রক্ততিলক কপালে পরার জন্য তাদের সে কী আগ্রহ!

সরস্বতীর কাছে কুৎসিত মনে হোত তাদের সেই উল্লাস, আগ্রহ আর আনন্দের উত্তেজনা। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে দানবীয় নিষ্ঠুরতা বলে মনে হোত। তার মা বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। তিনিও মনেপ্রাণে বলির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস করেন নি।

বড় হয়ে সরস্বতী কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়েছিল। স্বয়ং তার বাবার কাছে। দিব্যনারায়ণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মেয়ের কথা শুনে।

—আচ্ছা বাবা, জগদ্ধাত্রী কি খুশি হন, এভাবে জীবহত্যা করলে? অবোলা অসহায় জীবকে বলি দিলে পুণ্য হয় বলে মনে কর তোমরা?

তার বাবা যথারীতি অবিচলিতভাবে জবাব দিয়েছিলেন।

—তুমি একে জীবহত্যা বলছ কেন, সরস্বতী? পাঁঠা হোল কামের প্রতীক। কামবলি হচ্ছে বলে মনে করবে।

সরস্বতীর মনে অপ্রতিরোধ্য একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। তাদের পরিবারে সন্তান সন্ততির সংখ্যা তো বড় কম না। কামবলি সত্ত্বেও, এতগুলি সন্তানের আবির্ভাব ঘটল কি করে এ বাড়িতে?

মনের প্রশ্ন মনেই থেকে গিয়েছিল। মুখে সেটি উচ্চারণ করা সমীচীন নয়। নির্বাক থেকে পিতৃমুখনিঃসৃত পরম বাণী শ্রবণ করেছিল সরস্বতী। আলোচনা আর এগোয়নি। কিন্তু কোনদিন তাদের বাড়ির সেই নিষ্ঠুর প্রথা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি সে।

সরস্বতী শুনেছে, এখন নাকি তাদের বাড়িতে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁঠার বদলে কুমড়ো বলির প্রচলন হয়েছে। তবে বলি প্রথা অপরিহার্য বলে মনে করা হয় এখনও।

আজকাল মাঝেমাঝেই আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় সরস্বতী। নিজের আচরণ, নিজের কাজকর্ম যাচাই করে দেখে অনেক সময়েই। অনেক চেষ্টা করেও কারুর প্রতি গুরুতর কোন অন্যায়, কিংবা কোন অবিচার করেছে বলে মনে করতে পারেনা।

শ্বশুর বাড়ির কথা মনে করলে অবশ্য একটু থমকে যায় সে। কিন্তু সেখানেও আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি খুঁজে পায়। তার স্বামীর আচরণই তাকে বাধ্য করেছে, বাড়ি ছেড়ে আসতে। তার দায় সে ব্যাপারে কতটুকু?

বাবার কথা চিন্তা করলেও সে হোঁচট খায়। রক্ষণশীল বাবাকে তার জন্য বেইজ্জত হতে হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পরও, তিনি তাকে তিরস্কার করেননি। তাকে সব রকম সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন, নিজেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অপদার্থ কন্যা তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি।

বাবার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে বলেই কি তার কপালে কোন স্থায়ী আশ্রয় জুটছেনা ?

অমলাদির সঙ্গে তার যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অমলাদি ও স্বদেশ বসু স্বামী স্ত্রীর মত সহবাস করছেন। তাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে মাঝেমাঝেই গিয়ে উপস্থিত হয় সরস্বতী। অমলাদি তাকে আমন্ত্রণ জানান। হাসিগল্পে কেটে যায় অনেকটা সময়।

অমলাদিকে দেখে বিস্মিত বোধ করে সে। সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তার। তাকে দেখলে কে বলবে, এই বাড়ির আসল কর্ত্রী তিনি নন, অন্য একজন ?

স্বদেশ বসুর ব্যবহারও তথৈবচ। তার স্ত্রীকে চাক্ষুষ দেখেনি সরস্বতী। তার সম্পর্কে প্রশ্নও করা চলে না অমলাদিদের। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কিভাবে আছেন, জানতে কৌতূহল হয় বৈকি সরস্বতীর। কিন্তু জানার কোন উপায় নেই।

পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক নেই অমলাদিদের। সরস্বতী তা বোঝে। সে আরও বোঝে, তার কারণ একটাই। নেপথ্যবাসিনী মহিলাটির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তা কেউ মেনে নিতে পারেনি। অমলাদিরাও সেই অধ্যায়কে পিছনে ফেলে আসতে চান। বর্তমানকে কণ্টকিত করে তোলার ইচ্ছা তাদের নেই।

সরস্বতীর চারপাশে কিন্তু ঘোরাঘুরি করেন তিনি ছায়ার মত। স্বদেশ বসু ও অমলাদির পাশে মাঝে মাঝেই উঁকি দেয় তার ছায়াবৃত মুখ। তার কি অপরাধ, সরস্বতী জানেনা। কোন্ গর্হিত অপরাধের শাস্তি হিসাবে তাকে চরম অসম্মান ও অপমানের লজ্জা সহ্য করে বিতাড়িত হতে হয়েছে বাড়ি থেকে, বঞ্চিত হতে হয়েছে নিজের ন্যায্য অধিকার থেকে, তা জানার কোন উপায় নেই।

সুপারের কাছে যতটুকু শুনেছে, তাতে ভদ্রমহিলার মারাত্মক কোন দোষ আছে বলে মনে হয়নি। তবে প্রকৃত সত্য এভাবে জানা যায় না। অনেক যাচাই করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, তবে তা জানা যায়।

সরস্বতী নিজের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। তার অত সময় কই ? আর, কি হবে প্রকৃত সত্য জেনে ? সে কি অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবে ?

তার বাবার প্রথম স্ত্রীকেও তো বিনা দোষে বিতাড়িত করা হয়েছিল। সেই কিশোরী দুঃখে কষ্টে অকালে মারা যায়। বাবা কি তার জন্য কোন মনস্তাপ ভোগ করেছেন ?

অমলাদিদের দেখলে তাদের সেই অধ্যায়টার কথা মনে করে তার অস্বস্তি হয়, বিস্ময় হয়, অসহায় এক যন্ত্রণা বোধ হয়। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে স্বার্থবোধ। সব কৌতূহল, বিস্ময়, বিবেকবোধ, আর যন্ত্রণা চাপা পড়ে যায়।

অমলাদি তাকে মায়ের মত স্নেহ করেন। তার হিতাহিত নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তাকে পরামর্শ দেন, সময়োচিত উপদেশ দেন। সরস্বতী সাধ করে কেন তা থেকে বঞ্চিত করবে নিজেকে ? তার পুঁজি অনেক নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

যৎসামান্য যা পড়ে আছে, তা সে বুদ্ধির দোষে নষ্ট করবে কেন ?

পৃথিবীতে কত কি ঘটছে। কত অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, শয়তানি। তার মত মানুষদের অসহায় দর্শক বা নির্বাক শ্রোতা হয়েই থাকতে হবে।

সরস্বতী তবু অবাক হয়, যখন দেখে, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমত চিন্তাগ্রস্ত অমলাদি ও স্বদেশ বাবু। মানবচরিত্রের দুজ্ঞের্য় জটিলতার কুলকিনারা খুঁজে পায় না সে।

শেষ পর্যন্ত তাদের শুভেচ্ছাই যেন সমাধানের উপায় আবাহন করে নিয়ে এল। ট্রেনে ইনস্পেকশানের সময় একদিন আকস্মিকভাবে দেবাশিসের সঙ্গে পরিচয় হোল সাগর নন্দী নামে একজন অ্যাডভোকেটের। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন ভদ্রলোক। দেবাশিসের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠল। কথাপ্রসঙ্গে দেবাশিস জানতে পারল, ভদ্রলোক বিমান মুখার্জীকে চেনেন।

চকিত ঝলকের মত দেবাশিসের মনে হানা দিল একটি চিন্তা। স্বদেশ বসুর অনুরোধে বিমান মুখার্জী সরস্বতীর বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কিছুদিন আগে তৎপর হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উপায় খুঁজে না পেয়ে নিবৃত্ত হন তিনি। কথায় বলে, একটি মাথা যা না পারে, একাধিক মাথা তা অনায়াসেই পারে। সাগর নন্দী ও বিমান মুখার্জীর এক পেশা। দুজনে মিলে একটা সহজ উপায় বার করলেও করতে পারেন। দেখবে নাকি চেষ্টা করে ?

সরস্বতীকে আজকাল খুব বিমর্ষ দেখায়। দেবাশিস নিজেও তার অক্ষমতার জ্বালা বোধ করে। আলাপের প্রথম দিনেই এসব বলা যায় না। দেবাশিস পরে দরকার হতে পারে বলে ভদ্রলোকের ঠিকানা, টেলিফোন নং, ইত্যাদি জেনে নিল।

দেবাশিসের কথামত সরস্বতী অমলাদিকে সেই খবরটা দিয়ে আসল। সেই সঙ্গে অনুরোধ করল যে, স্বদেশ বাবু যেন বিমান মুখার্জীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আরেকবার যোগাযোগ করেন।

বিমান মুখার্জী ও সাগর নন্দী শেষ পর্যন্ত সত্যিই একটা উপায় খুঁজে বের করল। সরস্বতীর স্বামী যদি সরস্বতীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে, তাহলে অনায়াসে সব সমস্যার সমাধান হয়।

সরস্বতীর দাদাশ্বশুর কিছুদিন আগে গত হয়েছেন। বিমান মুখার্জী গোপালকৃষ্ণ ও তার মামাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সময় সরস্বতীর অনুকূলে ছিল। তারা আপত্তি করলেন না। নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন বিমান মুখার্জীর প্রস্তাব। সরস্বতীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা দায়ের হোল। অভিযোগ আনলেই হয় না, তার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণেরও প্রয়োজন হয়। অন্ততঃ একদিনের জন্যও যে সরস্বতী দেবাশিসের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছে, সেটি প্রমাণিত হলেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

দেবাশিসকে সঙ্গে নিয়ে সরস্বতী গিয়ে যোগাযোগ করল পার্বতী সান্যালের সঙ্গে ভবানীপুরে। পার্বতী বাড়ির কাছেই দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। একটি

কোচিং ক্লাস খুলেছিল। পার্বতী পছন্দ করত সুনির্মলকে। দেবাশিসকে সে সরস্বতীর যোগ্য বলে মনে করত না। সরস্বতীর মনে তাই দ্বিধা ছিল। একমাত্র অনন্যোপায় হয়েই পার্বতীর দ্বারস্থ হোল সে।

সরস্বতীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ পার্বতীর মনঃপূত হোল না। শুধু সরস্বতীর জীবনমরণ সমস্যা বলেই রাজী হয়ে গেল সে সাক্ষ্য দিতে। আদালত থেকে পুলিশ এসে যখন তার কাছে সরস্বতীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য কিনা জানতে চাইল, তখন সে বিনা দ্বিধায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, সরস্বতী একদিন নয়, বহুদিন তার কোচিং ক্লাসের ঘরে দেবাশিসের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছে। সরস্বতীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগে গোপালকৃষ্ণের তরফে আনা বিবাহবিচ্ছেদের মামলার একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আইন মাফিক সরস্বতীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

মামলার রায় বেরোনোর পরে, দেবাশিসের বাবা এসে সরস্বতীকে নিয়ে গেলেন বরানগরে নিজের বাড়িতে। সুনীল সেনের বাড়িতে কয়েক মাস ছিল সরস্বতী। যাবার সময় মাসিমার চোখে জল দেখে, সুনীল সেনদের সাত ভাইয়ের কষ্ট দেখে, সে প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করল। সেই সঙ্গে, আর তাকে যাযাবরের মত আজ এখানে, কাল ওখানে, ঘুরে বেড়াতে হবে না ভেবে, এক ধরনের শান্তিও বোধ করল।

গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল সরস্বতী। এতদিনে তার কষ্টের অবসান হোল। আর দশটি মেয়ের মত নিজের সংসারে সে স্থিতি পেতে চলেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে। দেরি হোক, তবু তো হয়েছে।

দেবাশিসের বাবা দুজনকে নিয়ে ঠাকুরঘরে উপস্থিত হলেন। গৃহদেবতার সামনে দেবাশিস সরস্বতীর সিঁথিতে তার আয়ুচিহ্ন রঞ্জিত করল। দুজনে মালাবদল করল ঠাকুরের সামনে। তাদের একত্রে সহবাসের সহজ সমর্থন পাওয়া গেল এভাবে।

সরস্বতী ভেবেছিল, সেটি অবশ্যই আপাতসাধ্য সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র হয়ে থাকবে। দেবাশিসের বাড়ি থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দেবাশিসের পরিবারের কাছেই শুধু নয়, সমাজের আরও দশজনের কাছে সামাজিক স্বীকৃতি পাবে তারা। উৎসব অনুষ্ঠান, লৌকিকতা, নিমন্ত্রণ—এসবের প্রয়োজন তো সেই কারণেই।

তার প্রত্যাশা পূরণ হোল না। শ্বশুরবাড়ির কেউই উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করল না। সরস্বতী হতাশ হোল। দেবাশিসকে ভয়ে ভয়ে একবার তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে গিয়ে দারুণ আঘাত পেল সে।

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল তার স্বামী। সরস্বতীর নির্বুদ্ধিতা দেখে উপহাস করল।

—উৎসব হবে? কেন? কিসের জন্য? এটা কি আর দশটা বিয়ের মত বিয়ে?

তুমি আর হাসিয়ো না, সরস্বতী। এ হোল, ক্যাংলার ল্যাংড়া আম খাওয়ার সাধ। আর টাকাটা আসবে কোথা থেকে? সেটা ভাবছ না? তোমার বাবা কি আমাদের—

সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল দেবাশিস। তার দু'চোখে আগুন আর জল সহাবস্থান করছে। তার ঠোঁট কাঁপছে। সরস্বতী মেজাজী। রেগে গেলে যা মুখে আসে, বলে ফেলে। আগে দু'একবার তার প্রমাণ পেয়েছে।

সরস্বতী বেশি কথা বলল না। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিষেধবাক্য উচ্চারণ করল।

—কোনদিন 'বাবা' তুলে কথা বলবে না। আমার বাবা এর মধ্যে আসেন না।

দেবাশিস জবাব না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সরস্বতীর কাছে সবকিছু কেমন বেসুরো ঠেকল। সে অবাক হয়ে ভাবল, দেবাশিস কি তাকে বিয়ে করে খুশি হয় নি? তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য অত কাঠখড় পোড়াবার দরকার কি ছিল? তারা যেমন ছিল তেমন থাকতে পারত। কিন্তু হঠাৎ এ বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এমন কি ঘটল যে, দেবাশিস অন্য মানুষ হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি এমন পরিবর্তন হয় কি করে?

কে বলে, নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়? পুরুষ গলার জোরে ঘোষণা করেছে বলেই নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয় হয়ে যাবে? পুরুষের প্রকৃতি অনুধাবন করা অনেক বেশি দুঃসাধ্য। তার যতটুকু ব্যক্ত হয়, তার অনেক বেশিই গোপন থাকে। তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

।। চোদ্দ ।।

শ্বশুরবাড়িতে অনেক লোকজন। সেখানে হৈচৈ হট্টগোল যথেষ্টই। তবু সরস্বতীর একরকম করে কেটে যাচ্ছিল। দেবাশিস আগের মত সপ্তাহে দুটি দিন কলকাতায় থাকে, ছুটি ফুরোলে আবার চলে যায় তার কর্মস্থলে। সেই দুটি দিনও দেবাশিসকে বেশিক্ষণ কাছে পায় না সরস্বতী। সরস্বতীর সান্নিধ্যের জন্য আগের মত আর সে লালায়িত নয়। হঠাৎ যেন সরস্বতীর সম্বন্ধে মোহভঙ্গ ঘটেছে তার।

অনেক ভেবেও, সরস্বতী কারণ খুঁজে পায় না। বিয়ের আগে তার জন্য দেবাশিসের মনে যে আবেগ অনুভূতির ঢল ছিল, তা হঠাৎ যেন সরে গেছে। শুকনো মাটি, ইঁট, কাঠ, পাথর বেরিয়ে পড়েছে।

শ্বশুর বাড়ির লোকজন সহনীয়। মানুষ হিসাবে তারা দোষে গুণে আর পাঁচজনের মতই। তাদের নিয়ে সরস্বতীর কোন সমস্যা নেই। তাদের কাছে তার কোন রকম প্রত্যাশা নেই। তাই প্রত্যাশা পূরণ হলোনা বলে কোন জ্বালা বোধ করেনা সে।

তার সব সমস্যা দেবাশিসকে নিয়ে। যাকে নিয়ে সে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই মানুষটির এখন নাগাল পাওয়া শক্ত ! সরস্বতীর নাগাল এড়িয়ে সে কেবলি দূরে সরে যাচ্ছে। তার মনোযোগের কেন্দ্র বাবা, মা, ভাই বোনেরা। দেবাশিসের ব্যবহারে সরস্বতীর মনে হয়, তাদের পরিবারে সে এক উটকো লোক। জবরদস্তি করে ঢুকে পড়েছে। নেহাত ভদ্রতায় বাধছে বলে, তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেনা কেউ।

তবু যতদিন একান্নবর্তী পরিবারে ছিল, ততদিন সব কিছু সত্ত্বেও, নিঃসঙ্গতার তার তেমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনি। বাড়িতে আর পাঁচটা লোক রয়েছে। তাদের সঙ্গে কথায় বার্তায় অনেকটা সময় চলে যায়।

তার সমস্যা তীব্রতর হোল তখনই, যখন তাদের থাকার ব্যবস্থা হোল হাতীবাগানের ফ্ল্যাটে। দুই কামরার ছোট ফ্ল্যাটটি দেবাশিসের বাবাই কিনে রেখেছিলেন অনেক আগে। এতদিন সেখানে ছিল দেবাশিসের ছোড়দি। এখন তার জামাইবাবু কার্শিয়াঙে বদলি হয়ে যাওয়াতে ফ্ল্যাট খালি হয়ে গেল। একই সঙ্গে দেবাশিসের কলকাতায় বদলির আদেশ এল। দেবাশিসের বাবাই তাদের সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে বললেন।

বরানগরের বাড়িতে যে ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, তা ছিল খুবই ছোট। সরস্বতী তাই প্রথমে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তার আরও মনে হয়েছিল, পরিবারের বেষ্টনীর বাইরে দেবাশিসকে হয়ত অনেক বেশি নিবিড় করে পাবে।

সরস্বতীর অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হোল অচিরেই। নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘর গৃহস্থালীর জিনিষপত্র কিনতে দেবাশিসের যে উৎসাহ দেখা গেল, তা দেখা গেল না সরস্বতীর সান্নিধ্যের জন্য।

বরানগরের বাড়িতে পরিস্থিতি তুলনায় অনেক ভাল ছিল। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে সেখানে খটাখটি লাগত না। নতুন বাড়িতে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল সরস্বতী। উঠতে বসতে অশান্তি। কোন কিছুই দেবাশিসের পছন্দ নয়। তার রান্না খেয়ে মুখ বিকৃত করে। তার অসংসারী অগোছালো স্বভাব দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে।

সরস্বতী যা বলে, তার উল্টোটা করেই তার আনন্দ। তার সামান্যতম অনুরোধ রক্ষা করতেও দেবাশিসের আপত্তি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে ভেতরের বিরক্তি আর অসন্তোষ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন ঘুরে ফিরে একই কথা শোনে সরস্বতী।

—কি যে একটা বিয়ে করলাম ! কিছুই পেলাম না। কোন গুণই নেই। একেবারে নির্গুণ, আমার যে কি ভীমরতিতে ধরল !

সরস্বতীর সান্নিধ্যও যেন তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। যতটা সময় পারে, বাইরে কাটিয়ে আসে। বরানগরের বাড়ির জন্য দেবাশিসের এত টান দেখে সরস্বতী বিস্মিত হয়। অফিস থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়েই, 'আসছি' বলে

বেরিয়ে পড়ে দেবাশিস। বলে যায়, বরানগরে যাচ্ছে। ফিরতে রাত হবে। একা একা হাঁপিয়ে উঠে সরস্বতী। এমন অনাদর, অসম্মান, আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করা যায় না। তার ভেতরে রাগের বারুদ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে দেবাশিস যখন বলে, 'খাবনা, খেয়ে এসেছি', তখন অপমানে তার মাথার ভেতরে জ্বালা করে। রাত্রে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে সে। দেবাশিসের দিকে পিঠ রেখে। যতটা সম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে।

কোন কোনদিন দেবাশিস তাকে নিজের দিকে টেনে আনতে চায়। সরস্বতী সাড়া দেয় না। দেবাশিসের হাত ঠেলে সরিয়ে, মুখ গোঁজ করে, দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।

একেক দিন সরস্বতীর ভেতরে অন্য ক্ষুধা জেগে ওঠে। তার ইচ্ছা করে, দেবাশিসকে জড়িয়ে ধরে তার নিবিড় সান্নিধ্য ভোগ করে। নির্মম তাচ্ছিল্যে দেবাশিস তাকে সরিয়ে দেয়। 'বিরক্ত করোনা, কাজ আছে', বলে উঠে পড়ে। অসম্মানে লজ্জায় সরস্বতীর ভেতরটা খাক্ হয়ে যায়।

রাত্রে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দেবাশিসই ক্ষুধাতাড়িত হয়ে নিবিড় করে পেতে চায় তাকে। কিন্তু সকালের সেই নির্মম প্রত্যাখ্যান মনে করে শক্ত হয়ে যায় সরস্বতী। দেবাশিসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। 'কি ভেবেছ তুমি? তোমার ইচ্ছামত সব হবে?' দেবাশিস আর জোর করেনা।

সরস্বতী বোঝে, দেবাশিস জোর করলে, কি শারীরিকভাবে, কি মানসিকভাবে, দেবাশিসকে সে প্রতিহত করতে পারত না। কিন্তু দেবাশিসের স্বভাবে স্নেহ, ভালবাসা, আবেগ, কোনটাই যেন জোরদার নয়। দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে, হাজারটা অসঙ্গতির মধ্যে, তার জীবনীশক্তি যেন নিঃশোষিত হয়ে যায়।

একদিন সকালে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। দেবাশিস বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ছিল। সরস্বতী চা টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢোকে। দেবাশিস তাকে দেখে উঠে বসে। হাত থেকে খাবারটা নিয়ে চিন্তিত গলায় বলে—'দেখেছ, কি বৃষ্টি? আজ বাজারে যাব কি করে? খুব ভোগাবে দেখছি। ঘরে কিছু আছে? না কি, যেতেই হবে বাজারে?'

বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির ধারা দেখতে দেখতে, তার শব্দ শুনতে শুনতে, হঠাৎ সরস্বতীর মনটা খুব নরম হয়ে গেল। তার শরীরে মনে তীব্র লয়ে একটা বাজনা বেজে উঠল। দেবাশিসের পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ রাখল সরস্বতী।

—আজ বেরোতে হবে না। খিচুড়ী রান্না করব। তার সঙ্গে আলু ভাজা, পাপর ভাজা। তুমি অফিসে যেয়োনা। আজ দুজনে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনব। অনেক গল্প করব।

দেবাশিস কাঠকাঠ গলায় জবাব দিল।

—অফিসে আমায় যেতেই হবে। নাও ছাড়ো, দেরি হয়ে যাবে।

সরস্বতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই দেবাশিসই না একদিন তাকে নিভৃতে পাওয়ার

জন্য কত কাঙালপনা করেছে ? তাকে জড়িয়ে ধরেছে, চুমু খেয়েছে ? কতদিন প্রস্তাব করেছে, কোন হোটেলে গিয়ে থাকবে তারা। সরস্বতী রাজী হয়নি। তখন যে বাধা ছিল, আজ তা সরে গেছে। তারা এখন স্বামী স্ত্রী। আশ্চর্য ! দেবাশিসের সব তাপ এত তাড়াতাড়ি বিকীরিত হোল কি করে ? বেলাশেষের আগেই এমন হিম ঠাণ্ডা মেরে গেল সে কি করে ?

নির্জন দুপুরে নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকবার দেখল সে। লোকে তাকে সুন্দরী বলে। তার গাত্রবর্ণ, মুখশ্রী ভাল। তার উত্তুঙ্গ বক্ষসুষমা, ক্ষীণ কটি, তার মোহময় নিতম্বসৌন্দর্য, দেবাশিসকে আর আকৃষ্ট করেনা। কিন্তু কেন ? দেবাশিস অন্য নারীতে আসক্ত নয়। তা সে ভাল করেই জানে। তাহলে কেন সে এমন শীতল, নিরুত্তাপ ?

সরস্বতীর মনে ভেসে উঠল জগদ্বাত্রীর মুখ। 'মা গো, এত কষ্ট কেন দিচ্ছ ? আমি কি অপরাধ করেছি যে, সারা জীবন এমনভাবে শাস্তি পেতে হচ্ছে ?'

দেবাশিসের সঙ্গে তার মতপার্থক্য, রুচিপার্থক্যও দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। অকারণে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দেবাশিসের। অনেক সময়েই তার খেই পায়না সরস্বতী। বাজারে তার দেনাও অনেক। স্বভাবে মিতব্যয়ী দেবাশিসের কি করে এত দেনা হোল, তা সরস্বতী বুঝে উঠতে পারেনা। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—'সে তুমি বুঝবে না। তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই, তুমি বুঝবে কি করে ?'

সবচেয়ে খারাপ লাগে, যখন মাত্রাছাড়া মিথ্যা কথা বলে পাওনাদারকে ঠেকায় দেবাশিস। একদিন এক দোকানদার এসে উপস্থিত হয় তাদের ফ্লাটে। সরস্বতী শুনতে পায়, দেবাশিসের কাছে সে তার প্রাপ্য টাকা চাইছে। দেবাশিসের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল সরস্বতী। দেবাশিস অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলছে।

—কাল আমার পকেটমার হয়ে গেছে, ভাই। এ মাসটা একটু টানাটানি যাবে। সামনের মাসে তোমার টাকা তুমি ঠিক পেয়ে যাবে।

দোকানদার চলে গেলে পর, সরস্বতী তার বিস্ময় ব্যক্ত করে দেবাশিসের কাছে।

—তোমার পকেটমার হয়েছে কাল ? কই, আমায় তো বলনি ?

অম্লানবদনে নির্বিকার ভঙ্গীতে জবাব দিল দেবাশিস।

—আরে, না না। ওকে ঠেকাবার জন্য ওটা বলেছি। দেখলে না, শুনেই চলে গেল। আর কিছু বলল না।

সরস্বতী বিরক্তি প্রকাশ করল।

—এভাবে অকারণে মিথ্যা কথা বললে ? ছি ছি, টাকাটা নয় দিয়েই দিতে। যাহোক করে চলে যেত। তাই বলে এমন নির্জলা—

দেবাশিস ঝাঁঝ দেখিয়ে থামিয়ে দেয় তাকে।

—থামো ! সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। অত বড় বড় কথা বলোনা, বুঝলে ? টাকা তো রোজগার করো না। অন্যের ঘাড়ে বসে খাচ্ছ। নীতি আওড়ানো সোজা।

কি দিয়ে কি হয়, তা তুমি বুঝবে কি করে ?

এরকম ঘটনা লেগেই থাকে। বিয়ের আগে দেবাশিসের প্রকৃতির এসব দিক তার কাছে উদ্ঘাটিত হয় নি। এখন যত দেখে, তত সে বিস্মিত হয়। তার বিরক্তি বিতৃষ্ণা বেড়েই চলে।

দেবাশিস যদি তার প্রতি অতটা উদাসীন না থাকত, তাহলে হয়ত সে সবকিছু সত্ত্বেও, মানিয়ে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু দেবাশিস তার ব্যবহারিক বা মানসিক কোন প্রয়োজনের দিকেই দৃক্‌পাত করে না।

সংসার খরচের টাকা দেবাশিসের কাছে থাকে। সরস্বতীর হাতে টাকা দেয়না দেবাশিস। যেমন যেমন প্রয়োজন মনে করবে, তেমন তেমন খরচ করবে দেবাশিস। প্রয়োজনেও টাকা বের করতে পারেনা সরস্বতী। অনেক সময়েই অপ্রস্তুত হতে হয় তাকে। ঠিকে কাজের লোক কোন সময়ে হয়ত তার কাছে দুটো একটা টাকা চাইল। সরস্বতীর কাছে টাকা নেই শুনে অবাক হয়ে যায় সে। সরস্বতীর কথা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় তার। নিজেকে দীনাতিদীন মনে হয়।

একদিন কত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেছে সে। অভাব কি জিনিষ, জানত না। হোস্টেলে থাকার সময়ও দেবাশিসের কাছে নিয়মিতভাবে মাসোহারা পেয়েছে। তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনেছে তা দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ দেবাশিস যেন হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

সরস্বতীর বিস্ময় যেন আর বাগ মানতে চায় না। এই মানুষটিকে তো আজ নতুন দেখছে না ? একদিন তার জন্য কম করেনি দেবাশিস। শরীর খারাপ হলে চিন্তিত হয়েছে। তার জন্য ওষুধ, ফলমূল, কিনে এনেছে। নিয়মিতভাবে তার হোস্টেলের খরচ জুগিয়েছে, পড়ার খরচ জুগিয়েছে। তার জন্য বিস্কুট, খেজুর, হরলিক্স কিনে এনেছে।

এক গ্রীষ্মের দুপুরে মাথায় করে তার জন্য ট্রাঙ্ক বয়ে নিয়ে এসেছিল দেবাশিস। চিত্রিতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'ভদ্রলোক তোমায় এত ভালবাসেন। তুমি ওকে কোনদিন কষ্ট দিও না।' সরস্বতী অকৃতজ্ঞ নয়। দেবাশিসকে কষ্ট দেবেনা বলেই সে সুনির্মলকে কষ্ট দিয়েছিল। তার সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করেছিল। আজ তার এই প্রতিদান পাচ্ছে দেবাশিসের কাছে ? অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বর্তমানের হাজারটা অসুবিধা কি অগ্রাহ্য করা যায় ?

বাড়িতে খুব কম সময় থাকে দেবাশিস। সরস্বতীর কাছে টাকা থাকেনা বলে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করে সে। একদিন লজ্জা শরম ত্যাগ করে বলেই ফেলল তার অসুবিধার কথা :

—বেশী না পার, মাসে পাঁচটা করে টাকা দিলেও তো পার।

পরে দেবাশিস সরস্বতীকে বলেছিল যে, তার মা নাকি সেকথা শুনে বলেছিলেন, —'তা পাঁচটা টাকাই তো। দিলেই পারিস। ওর তো দরকার হতেই পারে।' সরস্বতীর লজ্জা রাখার আর জায়গা রইল না। দেবাশিস তার এটুকু সম্মানও

রাখতে পারল না। তাকে অপরের কাছে এতটা ছোট করল? সরস্বতী সেই টাকা নেয় নি। আর কোনদিন চায়ও নি।

দেবাশিস স্বভাবে রক্ষণশীল। তার পছন্দের সঙ্গে সরস্বতীর পছন্দ পুরোপুরি মেলে না। তার স্বভাবে কতগুলি সংকীর্ণতা আছে। সরস্বতী বিয়ের আগেই তার প্রমাণ পেয়েছে। আড়াল থেকে তার আর সুনির্মলের ওপর সে যেভাবে নজর রেখেছিল, তা খুব সুরুচির পরিচয় দেয়না। তার হীনমন্যতাবোধ ও ঈর্ষার আরও প্রমাণ পেয়েছে সে।

একবার দেবাশিসের সঙ্গে সুনীল সেনের কি একটা বিষয়ে তর্কাতর্কি হয়। সরস্বতী সুনীল সেনের পক্ষ নেয়। দেবাশিস দারুণ চটে যায়। দুই দিন আগে সরস্বতীর জন্য একটি শাড়ি কিনেছিল সে। সরস্বতীর খুব পছন্দ হয়নি। একটু ম্যাড়ম্যাড়ে বুড়োটে ধরনের ছিল শাড়িটা। সরস্বতী হেসে রসিকতা করেছিল —'আমি কি এতটাই বুড়ো হয়ে গিয়েছি যে, বেছে বেছে যত ম্যাড়ম্যাড়ে শাড়ি কিনে নিয়ে আসছ আমার জন্য?' দেবাশিস লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল—'ঠিক আছে। পরের বার তোমার পছন্দ বলে দিও। আমি ঠিক সেরকম শাড়ি নিয়ে আসব। এবার এটাই পর। ফেরৎ হয়ত নিতে চাইবে না।' সরস্বতী আর কিছু বলেনি। শাড়িটি রেখে দিয়েছিল।

সুনীল সেনের বাড়িতে তার সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটার পর, দেবাশিস শাড়িটা ফেরৎ চাইল। সরস্বতী প্রথমে কারণটা বোঝেনি। সে ভেবেছিল, দেবাশিস বুঝি ওটা ফেরৎ দিয়ে তার জন্য অন্য শাড়ি নিয়ে আসবে। কিন্তু দেবাশিস ঠাণ্ডা গলায় তাকে যে কথা বলেছিল, তা শুনে চমকে গিয়েছিল।

—তোমার যখন ওটা অপছন্দ, তখন ফেরৎ দিয়েই আসব। টাকা ফেরৎ দেবে না। ভাবছি, মায়ের জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আসব।

সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সরস্বতীর কাছে। দেবাশিস তার ওপর রেগে গেছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য শাড়িটা ফেরৎ চাইছে। সরস্বতী নিঃশব্দে শাড়িটি এনে সমর্পণ করেছিল দেবাশিসের হাতে।

সরস্বতীর খুব খারাপ লেগেছিল। দেবাশিসের নীচতা, তার অপরিণত আচরণ, তাকে কষ্ট দিয়েছিল। তবু তা সহনীয় ছিল। সরস্বতী বুঝেছিল, আসলে দেবাশিস তার ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলেই ওরকম আচরণ করেছে। সরস্বতীর প্রতি ভালবাসাই তাকে অবুঝ করে তুলেছে। সরস্বতী যে তাকে সমর্থন না করে অপর কাউকে সমর্থন করেছে, তা তার পছন্দ হয়নি। তার ইচ্ছা, সরস্বতী নির্বিচারে তার কথা মেনে নেয়।

বিয়ের পর দেবাশিসের সেই ভালবাসা কোথায় গেল? সরস্বতীর কোন কিছুই তার পছন্দ নয়। প্রতিটি ব্যাপারে সরস্বতীর সঙ্গে তার মতের অমিল হয়। সরস্বতী মনে, হয় বিয়েটা না হলেই ভাল ছিল। অষ্টপ্রহর এমন যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

একবার শাশুড়ী হাতীবাগানের ফ্ল্যাটে এলেন। কয়েকটা দিন তাদের কাছে থাকবেন। দেবাশিস বাড়িতে সংসার খরচের টাকা ছাড়াও হাতখরচের জন্য মাকে পঞ্চাশ টাকা করে দিত। সেবার সে সরস্বতীকে বলল, হাতে করে টাকাটা দিতে।

সরস্বতী আপত্তি জানাল।

—আমি পারব না। মা ভাববেন, আমি কর্ত্রী হয়ে গেছি। ওঁর খারাপ লাগতে পারে। বরাবর তুমি হাতে করে দিচ্ছ। হঠাৎ আমি হাতে করে টাকা দিলে কি ভাল দেখাবে?

দেবাশিস বিরক্ত হোল।

—একটা কথাও যদি শোন! প্রতিটি ব্যাপারে গোয়ার্তুমি। কিসে ভাল হবে আর কিসে খারাপ হবে, সেই বুদ্ধি যদি তোমার থাকত, তাহলে আর কথা ছিলনা। আমার কপালে জুটেছিল বটে একখানা!

পরে সরস্বতী ভেবে দেখল, সত্যিই তার সাংসারিক বুদ্ধির অভাব রয়েছে। সংসারে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তা সে জানেনা।

দেবাশিস যদি একটু ধৈর্য দেখাত, একটু সহনশীলতা দেখাত, তাহলে সরস্বতী হয়ত নিজেকে শোধরাতে পারত। কিন্তু উঠতে বসতে দেবাশিসের বিরক্তি আর অসন্তোষ তাকেও অসহিষ্ণু করে তুলল, জেদী করে তুলল।

দেবাশিস শুধু বাড়ির মধ্যে নয়, বাড়ির বাইরেও সরস্বতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বন্ধুদের কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে, পরিচিত লোকেদের কাছে সরস্বতীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। কেউ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে নিবৃত্ত করে।

—ক্ষেপেছ? ও কি আর দশজনের মত স্বাভাবিক মানুষ? ও লোকজন একেবারে পছন্দ করে না। হয়ত তেড়ে আসবে।

সরস্বতী কত অপদার্থ, তার রান্না কত অখাদ্য, সে কত মেজাজী, কত অস্বাভাবিক, এসব বলে বেড়ায় দেবাশিস সকলের কাছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পরে সেসব জানতে পেয়ে লজ্জায় বিরক্তিতে এতটুকু হয়ে যায় সরস্বতী।

সরস্বতীর ছোট ননদ পর্যন্ত সরস্বতীর কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে তা নিয়ে।

—দাদা যেন কি, বৌদি! সব সময়ে তোমার নিন্দে করে। বলে, তোমার রান্না নাকি মুখে দেওয়া যায় না। কই, আমার তো খারাপ লাগে না? পরের কাছে নিজের লোকের নিন্দে করলে যে নিজেরই অসম্মান, তা বোঝে না।

সরস্বতী চুপ করে শোনে। কোন মন্তব্য করে না। মন্তব্য করারই বা আছে কি? তার মানসম্মান কি তাতে বাড়বে? নিজেকে আর হেয় করতে চায় না সে। কিন্তু ভেতরের দাপাদাপি বন্ধ করতে পারে না। তার ইচ্ছে করে, এই বাড়ি ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, কোথাও চলে যায়। এভাবে লোকদেখানো সংসার সাজিয়ে রেখে কি লাভ?

বাইরের লোকের চোখেও তাদের সম্পর্ক ধরা পড়ে যায়। দেবাশিস ইচ্ছা করে

তাকে অপ্রস্তুত করে। সরস্বতী মরমে মরে যায়। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ আসলে দেবাশিস তাদের দোকান থেকে খাইয়ে আনে। সরস্বতী খাবার আনাবার কথা বললে জানা যায়, অতিথি খেয়ে এসেছে। খেয়ে এসেছে দেবাশিসও। সরস্বতীর জন্য কিছু নিয়ে আসে না সে কখনই।

দেবাশিসের বাবা হামেশাই বলেন—"ছেলে আমার হাতী পুষছে"। সরস্বতীর কানে পেঁছয় সে কথা। দেবাশিসও রেখে ঢেকে বলে না। অপমানে শরীরে জ্বালা ধরে সরস্বতীর। কতটুকু খায় সে? তার বাপের বাড়িতে, তার প্রথম শ্বশুর বাড়িতেও খাবারের কত প্রাচুর্য। খাওয়ার জন্য তাকে সাধাসাধি করত সকলে। এখানে সে কি-ই বা খায়? বিকালে খিদে পেলেও তেমন কিছু খাওয়ার থাকে না। বিকালে জলখাবারের কথা ভুলেই গেছে সরস্বতী। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।

কিন্তু অপমানটা গায়ে বাজে। তাকে বাদ দিয়ে দেবাশিস কি করে খেয়ে এল? বাইরের লোক এসবের কি অর্থ করবে, তা ভেবে দেখল না? যে দেবাশিসকে সে আগে চিনত, সেই দেবাশিস আর আজকের দেবাশিস কি এক মানুষ? এতখানি পরিবর্তন সম্ভব এত অল্প সময়ের মধ্যে?

ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায়না সরস্বতী। কত রকম চিন্তার উদয় হয় তার মনে। দেবাশিস কি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিল না? সে কি স্ফূর্তি করতে চেয়েছিল? বাবার আজ্ঞা পালনে বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করেছে? তাই তার এত রাগ? নাহলে বিয়ের পরে পরেই এমন অচিন্তনীয় রূপান্তর ঘটবে কেন? হঠাৎ সরস্বতী তার কাছে এতখানি অবাঞ্ছিত হয়ে উঠবে কেন?

আবার অন্য কথাও মনে হয়। দেবাশিস উদ্যোগী হয়েছিল বলেই শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স পেয়েছে সরস্বতী। বিয়েটা বৈধ করার জন্যই তার প্রয়োজন ছিল। তাহলে দেবাশিসের এত বিরক্তির কারণ কি?

কখনও মনে হয়, দেবাশিস হয়ত ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তার বাড়ি থেকে মেনে নেবে তাদের বিয়ে। সরস্বতী বঞ্চিত হবে না, পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ থেকে। কিন্তু কি সরস্বতী, কি তার বাপের বাড়ি—কোন তরফেই কোন চেষ্টা না দেখে হতাশ হয়েছে।

সরস্বতী ভাবে, দেবাশিস হয়ত পুরোপুরি নির্লোভ নয়। তার হয়ত প্রত্যাশা ছিল। সেই প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সরস্বতীকে আর সে সহ্য করতে পারছে না।

সরস্বতী ভাবে আর ভাবে। কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁছতে পারেনা। সে কি রায় দেবে? দেবাশিসের আচরণ তার কাছে দুর্বোধ্য। দেবাশিসের চরিত্র তার বিশ্লেষণক্ষমতার বাইরে।

সরস্বতী আজকাল দেবাশিসের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। একসঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকলে যতটুকু দরকার, ততটুকু বলে। দেবাশিস নিয়ম করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। একা একা বসে বসে আকাশপাতাল ভাবে সরস্বতী। কত রকম

পরিকল্পনা করে। কখনও ভাবে, সে চলে যাবে। বিয়েটা অস্বীকার করা যায় না। অনুষ্ঠান না হলেও রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। কাগজে কলমে তারা স্বামী-স্ত্রী। ডিভোর্স না হলে বিয়ে বাতিল হবে না।

দেবাশিস উঠতে বসতে যেকোন ওজুহাতে গানের ধ্রুবপদের মত এক কথা বলে। শুনে শুনে ঝালাপালা হয়ে যায় সরস্বতীর কান। সে ভাবে, এভাবে থাকা যায় না।

—এত যে দূর ছাই করি, তাও বিদায় হয় না। আমার ঘাড়ে বসে আছে ঠিক।

সরস্বতী ছেড়ে দেয় না। সে চিৎকার করে। দেবাশিসকে গালাগালি দেয়, জিনিষপত্র ছুঁড়ে মারে। রাগের পারা নেমে গেলে গভীর অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে সরস্বতী। সে বুঝতে পারছে, এভাবে বেশিদিন চললে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শরীরে মনে বিকল হয়ে পড়বে। তার মস্তিষ্কবিকৃতি অবশ্যম্ভাবী।

সব কিছু সত্বেও, দেবাশিস সন্তান চেয়েছিল। সরস্বতী তাকে প্রশ্রয় দিল না। দেবাশিসকে সে কাছে ঘেঁষতেও দেয় না। নিঃসঙ্গতার কষ্ট ভুলতে কুকুর পুষেছে সরস্বতী। বিছানায় দুজনের মাঝখানে কুকুর শুয়ে থাকে। অপার বাৎসল্য তার সেই কুকুরের প্রতি। দেবাশিস অনেক কটূক্তি করেও সেটি ঠেকাতে পারেনি।

সরস্বতীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে একমাত্র তার ছোড়দার। সে নিজের উদ্যমে একটি কারখানা খুলেছে। এর মধ্যে সেটি মোটামুটি দাঁড়িয়েও গেছে। জনা বিশ বাইশ লোক সেখানে খাটে। ছোড়দা তার দুঃখময় ইতিহাসের অনেকটাই জানে। তার ইচ্ছাতেই আইন পড়তে সুরু করল সরস্বতী। ছোড়দাই পড়ার যাবতীয় খরচ দিতে থাকল।

এতদিন ছোড়দার কাছেও হাত পেতে টাকা নেয়নি সরস্বতী। এখন নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে সাগ্রহে ছোড়দার প্রস্তাব গ্রহণ করল। সরস্বতী যেন প্রাণ ফিরে পেল। ক্লাসে সকলের সঙ্গে হাসিগল্পে, আলাপ আলোচনায়, মৃতসঞ্জীবনী সুধা লাভ করল। দেবাশিসের এক ভাইকে সহপাঠী হিসাবে পেল সরস্বতী। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোল তার। দেওর হিসাবে নয়, বন্ধু হিসাবে আপনজন হয়ে গেল সে সরস্বতীর। আশ্চর্যের কথা, সরস্বতীর দুঃখযন্ত্রণা বোঝে সে। স্বামী পর হয়ে গেলেও দেওর তার অনেক আপন হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে শাসায় দেবাশিস।

—তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করে নাও। চিরদিন আমি এভাবে হাতী পুষতে পারব না। পড়া শেষ হয়ে গেলে ডিভোর্স করব আমি।

অপমানে, দুঃখে, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবে সরস্বতী। কখনও ভাবে, অপর কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করবে। দেবাশিসকে ছেড়ে চলে যাবে। পরক্ষণেই বুঝতে পারে, তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তার প্রেম করার সাধ নেই। রুচিও নেই। দেবাশিসের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ তিক্ততার মধ্যেও এতদিন ধরে যে বন্ধনে বাঁধা পড়েছে, তা ছিন্ন করা সহজসাধ্য নয়।

আরেকটি কথা ভাবে সরস্বতী। পুরোপুরি স্বার্থপর চিন্তা সেটি। সে ভাবে,

তার দু'বার বিবাহ হয়েছে। সব শুনে কোন পুরুষই তাকে বিবাহ করতে রাজী হবেনা। দেবাশিস পুরুষ মানুষ। ডিভোর্সের পর দ্বিতীয় বার বিবাহে কোন বাধা থাকবে না। এদেশে তার পাত্রীর অভাব হওয়ার কথা নয়।

এসব চিন্তা করে সে ভাবে, দেবাশিসকে এখনই ডিভোর্স করবে না। আরও কয়েক বছর যাক। দেবাশিস তার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। এরপর বেশি বয়সে যখন ভাল পাত্রী জুটবে না, তখনই তাকে ডিভোর্স করবে সরস্বতী। দেবাশিসের সেটাই হবে যথোচিত শাস্তি।

॥ পনর ॥

বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও, ছোড়দার মারফৎ অনেক খবরই কানে আসে সরস্বতীর। ইদানীং সরস্বতীর ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায় সে। তার কাছে সরস্বতী শুনল, বাবার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আগের সেই প্রতাপ আর নেই। সরস্বতীর গৃহত্যাগের পর দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যতটা ভেঙ্গে পড়বেন বলে বাড়ির লোক ভেবেছিল, ততটা ভেঙ্গে পড়েন নি। সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছেন ছোট ছেলের কাছে।

জ্যাঠতুতো দাদার বড় মেয়েকে—যে কিনা সম্পর্কে তার ভাইঝি হয়—তাকে বিয়ে করেছে নিলয়। তলে তলে কতদিন ধরে গোপনে মেলামেশা চলছিল, তা বাড়ির কেউ জানতে পারে নি। জানতে পারল, অনেক পরে। জয়ন্তী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরে।

নিলয় অগতির গতি ছোড়দার কাছে এসে ভেঙ্গে পড়েছিল। জয়ন্তীর গর্ভপাত করাতে চায় সে। নাহলে বাড়ির মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তারা। তাদের বাবার কানে কথা গেলে রক্ষা থাকবে না।

ছোড়দা নিলয়কে সম্পূর্ণ অন্য পরামর্শ দিল। গর্ভপাতের পরিণাম প্রায়ই ভাল হয়'না। মায়েরও জীবনসংশয় দেখা দিতে পারে। নিলয় সাবালক। সে স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে জয়ন্তীর সঙ্গে ওরকম সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। পরিণামের কথা তার অজানা থাকার কথা নয়। ভ্রূণহত্যা করে আরেকটি অন্যায় করবে সে?

তার উচিত, জয়ন্তীকে নিয়ে আলাদা সংসার করা। প্রথমে নিলয় অনেক গাইগুঁই করেছিল। পরে ছোড়দার উপদেশের যৌক্তিকতা বুঝে মেনে নেয় সেই প্রস্তাব।

কথাটা চাপা থাকল না। দিব্যনারায়ণের কানে গেল সেই খবর। রাগে দুঃখে লজ্জায় ক্ষিপ্তপ্রায় দিব্যনারায়ণ বন্দুক নিয়ে গুলি করতে গিয়েছিলেন ছেলেকে। কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে নিলয়। নিলয় ও জয়ন্তী বাড়ি ছেড়ে চলে

গিয়েছে। তারা এখন টালিগঞ্জে আছে। তাদের মেয়েটি নাকি ভারী সুন্দর হয়েছে দেখতে। একমাত্র অভয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ রয়েছে তাদের।

সরস্বতীর মত তারও বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দিব্যনারায়ণ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। নতুন করে উইল তৈরি করেছেন তিনি। অভয় শুনেছে, তিনি লিখেছেন যে, তার ছোট ছেলে যে গর্হিত অপরাধ করেছে, তার শাস্তি হিসাবে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করছেন। অতঃপর পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকল না।

সরস্বতীকেও সম্পত্তির ভাগ দেননি দিব্যনারায়ণ। সরস্বতীর প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে আমি তার বিবাহ দিয়েছি। বিবাহের খরচ যথাসাধ্য বহন করেছি। এই সম্পত্তিতে তার কোন দাবি বা অধিকার থাকবে না।'

ছোড়দা মানুষটা এমনই। মিথ্যা কথা বলতে পারে না। সরস্বতী কষ্ট পাবে জেনেও, তার কাছে সত্য গোপন করার বা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করল না।

ছোড়দার জন্য বিচিত্র এক মায়া বোধ করে সরস্বতী। পড়াশোনায় ভাল ছিল ছোড়দা। ডিস্টিংশানে বি. এস. সি. পাশ করেছে। দাসত্ব করবেনা বলে চাকরি খোঁজেনি। কারখানা খুলে বসেছে। নিজের চেষ্টায়, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও পুঁজির ওপর নির্ভর করে এতবড় কারখানা গড়ে তুলেছে। একদিনে কারখানা অত বড় হয়নি। প্রথম দিকে ব্যাগে করে মালপত্র নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে সরবরাহ করেছে। কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেনি। লেগে থেকেছে।

শক্ত সবল মজবুত চেহারা তার ছোড়দার। গায়ের রং ময়লা বটে, কিন্তু কাটাকাটা নাক চোখ। খুব মাতৃভক্ত ছিল ছোড়দা। বাড়ির সকলের প্রতিই রয়েছে তার টান। বাড়িতে কিংবা বাইরে যে কেউ অসুবিধায় পড়ে, সে-ই ছোড়দার শরণাপন্ন হয়। উদার, পরোপকারী, দানশীল ও সৎ তার ছোড়দা।

এখনও পর্যন্ত অকৃতদার সে। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু সে দৃঢ়সঙ্কল্প, বিয়ে করবে না। কারণ সরস্বতীর অজানা নয়। ছোড়দা একজন মহিলাকে ভালবাসে। সেই মহিলা কুমারী না বিবাহিতা, কিংবা বিধবা, তা সরস্বতী আজও জানে না। তবে এটুকু জানে যে, মাঝে মাঝেই মহিলার বাড়িতে রাত্রিবাস করে তার ছোড়দা।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই ছোড়দার স্বভাবে। নেই কোন অসাধুতা কিংবা ধূর্তামি। কত পুরুষমানুষ অবৈধ নারীসংসর্গ করে। তাসত্ত্বেও, তারা বিবাহ করে, সন্তানের পিতা হয়। সমাজের আর দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। সরস্বতীর ছোড়দার মত অকৃতদার থাকেনা।

কি পরিণতি এই সম্পর্কের? সরস্বতীর কষ্ট হয় ছোড়দার জন্য। কিন্তু তার কিছু করার নেই। ছোড়দা কারুর কথা শোনার পাত্র নয়। চিরকাল স্বাধীনচেতা সে। নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

ছোড়দা জানে তার পারিবারিক অশান্তির কথা। কতদিন চেপে রাখা যায়

সে কথা ? সরস্বতীর সেজদা অজয়ের শালার সঙ্গেও দেবাশিসের আলাপ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে সে সরস্বতীদের ফ্ল্যাটে চলে আসে। দেবাশিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে পর্যায়ে পেঁাছেছে, তাতে লোকচক্ষে গোপন থাকার কথা নয় তাদের পারস্পরিক অসদ্ভাব ও অবনিবনা।

অভয় চায়না, সরস্বতী এমনভাবে আত্মাবমাননার পথ বেছে নেয়। তার মতে, সরস্বতীর অবিলম্বে ডিভোর্স চাওয়া উচিত। শুধু তার নিজের প্রয়োজনে নয়, দেবাশিসের হিতার্থেও ডিভোর্সের কথা চিন্তা করা উচিত। সুখশান্তি জোর করে আদায় করা যায় না। শুধু শুধু লোক দেখানো স্বামী-স্ত্রী সেজে নিজেদের জীবন নষ্ট করবে কেন তারা ?

সরস্বতীও কি তা ভাবে না ? বরং অনেক তলিয়ে ভাবে বলেই চরমপন্থা গ্রহণের কথা ভাবতে পারেনা। আজকাল অনেক সময়েই তার সুনির্মলের কথা মনে হয়। সুনির্মলের চেহারা, তার গান. তার উচ্চকিত হাসি, তার কথা। মনে পড়ে শেষ যেদিন হঠাৎ ধূমকেতুর মত সে আবির্ভূত হয়েছিল হোস্টেলে। সরস্বতী একেবারে প্রস্তুত ছিলনা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাল করে সুনির্মলকে চেয়ে দেখতেও পারেনি। একটি কথাও বলার সুযোগ পায়নি। সুনির্মল ঝড়ের মত এসে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছিল আবার ঝড়ের মত।

সরস্বতীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একটি কথা বলারও সুযোগ দেয়নি। যে মানুষটির কথা ভেবে সুনির্মলের মত সর্বাংশে প্রার্থিত মানুষটিকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কষ্ট দিয়েছিল, সেই মানুষটির কাছে আজ তার কোনই মূল্য নেই। দশ বছরের যৌথ জীবনে ঐ লোকটি তাকে কেবলই অপমান করেছে, অসম্মান করেছে। কতভাবে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। কেউ বিশ্বাস করবে, একদিন রীতিমত নাটক করেছিল ঐ লোকটি ? তাকে না পেলে আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল ?

সুনির্মলের থেকেও বেশি করে মনে পড়ে বাবার কথা। মাঝেমাঝেই বাবাকে সে স্বপ্নে দেখে। কখনও দেখে, বন্দুক হাতে নিয়ে তিনি সরস্বতীকে গুলি করতে আসছেন, আর সরস্বতী ভয়ে হিম হয়ে আছে। কখনও বা দেখে, তিনি সস্নেহে সরস্বতীর হাত ধরে বলছেন—'আমি তোকে ক্ষমা করেছি, সরস্বতী। তুই আমার কাছে ফিরে আয়'।

প্রচণ্ড আনন্দে ঘুম ভেঙে যায় সরস্বতীর। চোখ মেলে দেখে, পাশে তার কুকুরটা শুয়ে। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন তো সত্যি নয়, তা মিথ্যা মরীচিকা ! কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে কান্না চাপে সরস্বতী। এ জীবনে বাবার সঙ্গে পুনর্মিলন হবে না। সরস্বতীর চেয়ে সে কথা আর বেশি কে জানে ?

একদিন আবার তার বাবাকে স্বপ্নে দেখল সরস্বতী। সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। অত্যন্ত করুণ, বিষণ্ণ তার চোখের দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। এত স্পষ্ট আর জীবন্ত সেই স্বপ্ন যে, সে কিছুতেই তার স্মৃতি মুছে ফেলতে

পারল না মন থেকে। সারাদিন সেই দৃষ্টির কথা মনে করে তার বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কান্না। বাবার অত্যন্ত আদরের ছিল সরস্বতী। বাবা কি তার জন্য কম কষ্ট পেয়েছেন? সারা জীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে তাকে।

দুই দিন পর, সেজদার শালার কাছে সেই চরম সংবাদ পেল সরস্বতী। দুই দিন আগে তার বাবা মারা গেছেন। কাগজেও বেরিয়েছে সে খবর। দেবাশিস জানালো, সে সেটি দেখেছে। সরস্বতী সে খবর রাখে না দেখে অজয়ের শালা খুব অবাক হয়ে গেল।

—সে কি? এত বড় একটা খবর তুমি জান না? না দেবাশিস, এটা তুমি ঠিক করোনি। সরস্বতীকে তোমার বলা উচিত ছিল।

দেবাশিস দোষ স্বীকার করল না।

—আমাকে তো কেউ জানায় নি। কাগজ পড়ে জেনেছি আমি। আমি কি কাউকে কাগজ পড়তে নিষেধ করেছি?

দেবাশিসের নিষ্ঠুরতা দেখে সরস্বতী কথা খুঁজে পেল না। সকালে উঠে রোজকার মত সে চা করেছে, রান্না করেছে। এতটা সময় চলে গেছে, কিন্তু দেবাশিস তাকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। মৃত্যু অনেক তিক্ততা নিয়ে যায়। দেবাশিসের তিক্ততা কি এ জীবনে যাবার নয়?

অন্য দিনের মতই ভাত খেয়ে অফিস চলে গেল দেবাশিস। আগেই রান্না হয়ে গিয়েছিল। নিজেই ভাত বেড়ে খেল। যাবার সময় একটিও সান্ত্বনার কথা বলে গেল না।

একটু পরে ঠিকে কাজের লোকটি তার হাতে পনরটা টাকা দিয়ে বলল—'বৌদি, দাদাবাবু দিয়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যা করার, করে আসতে বলেছে।' সরস্বতী তাকে সঙ্গে নিয়ে পুরোহিত যোগাড় করে যা করণীয় করল।

সরস্বতী কাঁদতে পারছিল না। কাঁদতে পারলে বেঁচে যেত। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিলনা, প্রবোধ দিলনা। কাছে এসে কেউ তার দুঃখের ভার লাঘবের চেষ্টা করল না। পিতৃবিয়োগের দুঃসহ আঘাত একা একা সহ্য করতে হোল।

অন্য দিনের মতই অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল দেবাশিস। সরস্বতীর সঙ্গে একটিও কথা না বলে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। সরস্বতী খেয়েছে কিনা, কিংবা সে কি খাবে, সেই প্রশ্ন করাও প্রয়োজন বোধ করল না। দাঁতে দাঁত চেপে সরস্বতী স্মৃতি-চারণা করে সেই রাতটি কাটিয়ে দিল অভুক্ত, অনিদ্র অবস্থায়।

পরদিন সকালে দেবাশিস নিজেই চা তৈরি করল। সরস্বতীর সামনে এক কাপ চা রেখে ভাববাচ্যে প্রশ্ন করল—'বাজারে যেতে হবে? রান্না হবে?' ফেটে পড়ল সরস্বতী। চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠল।

—তুমি কি মানুষ? মানুষের চামড়া গায়ে আছে তোমার? নির্লজ্জ কোথা-কার। সাধারণ মনুষ্যত্ববোধটুকু পর্যন্ত যার নেই, তার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা করে

আমার। কি ভেবেছ তুমি আমায়? দিনের পর দিন কি চালাচ্ছ তুমি আমার ওপরে? আমি যদি সুনির্মলকে বিয়ে করতাম, তাহলে আমার জীবন এভাবে নষ্ট হোত না। তখন হাতে পায়ে ধরে সেকি কান্না। 'তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়োনা।' সুনির্মলের মত ছেলেকে আমি বিনাদোষে কষ্ট দিয়েছি শুধু তোমার জন্য। তার প্রতি অবিচার করেছি! আমার সঙ্গে যদি এরকম ব্যবহার করবে, তাহলে সুনির্মলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে বলেছিলে কেন? আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? আমার জীবন এভাবে নষ্ট করলে কেন?

দেবাশিস ঠাণ্ডা গলায় কেটে কেটে জবাব দিল।

—দরকার কি নষ্ট করার? আমি তোমাকে বেঁধে রাখিনি।

সরস্বতী ভাঙ্গা কাচের টুকরোটা ছুঁড়ে মারল দেবাশিসের কপাল লক্ষ্য করে। অল্পের জন্য বেঁচে গেল দেবাশিস। 'ডিস্গাস্টিং'—তীব্র ঘৃণায় মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেবাশিস।

সরস্বতী চরম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবতে পারল না। কিন্তু ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিল। বাবার মৃত্যু তাকে যেন অকল্পনীয় এক শূন্যতার গর্ভে নিক্ষেপ করল। তার মনে হোল, যদি একটি সন্তান থাকত, তাহলে তাকে আশ্রয় করে নিজের দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারত। দেবাশিস সন্তান চেয়েছিল। হয়ত সন্তান হলে তাদের সম্পর্ক এত তিক্ত হোত না। নিশ্চয় করে অবশ্য কিছুই বলা যায় না। সেই সন্তানকে কেন্দ্র করেও অশান্তি দেখা দিতে পারত।

সরস্বতী তার পোষা কুকুরটিকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরল। তার কষ্ট ভুলতে। কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'। কয়েকদিন পরে সেই কুকুরটিও মারা গেল। সরস্বতীর কাছে মর্মান্তিক মনে হোল সেই আঘাত। মানুষের কাছে পাওয়া আঘাত ভুলতে সেই মনুষ্যেতর প্রাণীকে আশ্রয় করে সে অনেকটাই সান্ত্বনা পেয়েছিল। তার কপালে সেটুকুও টিঁকল না।

এবারও দেবাশিস কোন সান্ত্বনার কথা, কোন সহানুভূতি বা মমতার কথা বলল না। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার ভার সরস্বতীকে বইতে হোল একা। কেউ তা লাঘব করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলনা।

সরস্বতী আবার একটি কুকুর পুষল। আগেরটির মত বিলেতী নয়, দেশী। আবার তার মায়ায় জড়িয়ে পড়ল সে। আগের শোক থিতিয়ে এল একটু একটু করে।

অভয় মাঝে মাঝে এসে দেখা করে তার সঙ্গে। সরস্বতীর এভাবে থাকা তার মনঃপূত নয়। দিব্যনারায়ণ এখন জীবিত নেই। সরস্বতী অনায়াসে গিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে পারে। আবার নতুন করে জীবন সুরু করতে পারে।

সরস্বতী মনস্থির করতে পারে না। এত কাণ্ডের পর আবার সেখানে? তাকে কি ভালভাবে গ্রহণ করবে বাড়ির লোক? সকলে ছোড়দার মত নয়। অন্য দাদারা, বউদিরা কি খুশি হবে তাকে দেখলে? এতদিন যারা তার খোঁজখবর করেনি, দুঃখের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি, এমনকি পথে দেখা হয়ে গেলে যারা অনায়াসে মুখ

ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে, এখন নিজের জন মনে করে জোর করে তাদের সঙ্গে থাকতে চাইলে সেটা কি খুব সম্মানজনক সমাধান হবে তার সমস্যার ?

অভয়ের স্পষ্ট কথা।

—যে যা-ই বলুক। আমি তো আছি। আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি যতদিন আছি, তোর কোন ভাবনা নেই।

সরস্বতী বোঝে, তার ছোড়দা খুব তলিয়ে দেখছে না। এত বছরের ইতিহাস এত সহজে মুছে ফেলা যায় না।

নির্জন দ্বীপের মত সেই সংসারে একটি একটি করে দিন কাটে সরস্বতীর। উত্তাল লোনা সমুদ্র তার চারপাশে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। তবু সাহস করে, লজ্জা ভয় জয় করে, অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না।

বাবার মৃত্যুর পর, সরস্বতী দেবাশিসের সঙ্গে এক ঘরে, এক বিছানায় থাকে না। অন্য ঘরে কুকুরটাকে নিয়ে শোয় সে। দেবাশিস মাঝে মাঝেই দু'চারদিন করে অন্যত্র কাটিয়ে আসে।

সরস্বতী সিঁদুর পরা ছেড়ে দিল। তাকে দেখে কুমারী মেয়ে মনে হোত। এক অর্থে সে তো কুমারীই। স্বামী সহবাসের অভিজ্ঞতা তার হোল কই ? আগে শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ দেওর, জায়েরা আসত তাদের ফ্ল্যাটে। ইদানীং দেবাশিসের নির্দেশেই কিনা, সরস্বতী জানে না, তারা আসাযাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম তার আইন ক্লাসের সহপাঠী দেওরটি। সে মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে। সরস্বতীকে অনুরোধ করে, আবার ক্লাসে যেতে।

কিন্তু সরস্বতী সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তার আর কিছু করতে ইচ্ছা করে না। আগের সেই সাহসিকা ছোট মেয়েটির কথা ভাবলে তার নিজেরই অবাক লাগে। বাড়ি থেকে একবস্ত্রে পথে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

সময় কত কি নিয়ে নেয়। যা সে নেয়, আর তা ফিরিয়ে দেয় না রত্নাকরের মত। নিজের ভাগ্য নতুন করে তৈরি করার আর সে স্পৃহা নেই। যেমন চলছে, চলুক।

কিন্তু তার রাশিচক্রের গ্রহসন্নিবেশন তাকে আবার ঠেলে দিল অন্যখানে। সরস্বতীর সংসারবাসের পালা শেষ হোল।

কার্শিয়াঙে দেবাশিসের যে জামাইবাবু বদলি হয়েছিলেন, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে দেবাশিস তৈরি হল, সেখানে যাবার জন্য। বিচিত্র এক অনুভূতি হোল সরস্বতীর মনে। তার মনে হোল, দেবাশিসের জামাইবাবু বাঁচবেন না এবং দেবাশিসের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। দুটি ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। তবু সরস্বতীর মনে এই দুটি চিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে স্থান করে নিল।

দেবাশিস কয়েকদিনের সংসারখরচের টাকা রেখে, সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন রওনা হচ্ছে, তখন তীব্র এক কষ্টবোধ করল সরস্বতী বুকের মধ্যে। তার মনে হোল, ভালবাসা, ঘৃণা, দুঃখ, যন্ত্রণার টালমাটাল যৌথ জীবন সে যাপন করেছে যে

লোকটির সঙ্গে, তাকে শেষ বারের মত দেখে নেয় আর একবার।

দেবাশিস বা সে, কেউ কাউকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো না। সরস্বতী ছুটে বেরিয়ে বারান্দায় গেল। যতক্ষণ দেবাশিসকে দেখা গেল, ততক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করল। দেবাশিস দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে পর, ঘরে এসে উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সরস্বতী।

এই অপ্রতিরোধ্য কান্নার উৎস তার নিজেরই অজানা। তার বুকের মধ্যে হিমবাহের বরফপুঞ্জ গলতে সুরু করেছে। হঠাৎ সরস্বতীর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কুকুরটা। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্ষিপ্ত হয়ে আঁচড়াতে কামড়াতে সুরু করল।

সরস্বতীর কান্না থেমে গেল। দারুণ ত্রাসে প্রাণপণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কুকুরটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কুকুরটা দুর্বার। সরস্বতীর ঘাড়ে, গলায়, বুকে সমানে দাঁত দিয়ে মাংস খুবলে নিতে লাগল। তার রোষ, ক্ষিপ্ততা ও উত্তেজনা তখন তুঙ্গে।

কোন রকমে একটা লাঠি খুঁজে পেয়ে সরস্বতী উপায়ান্তর না দেখে সেটা দিয়ে কুকুরটাকে জোরে জোরে মেরে দ্রুত বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। পাশের দোকানে গিয়ে সেখান থেকে ফোন করল তার ছোড়দাকে। একটু পরে পশু চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে এসে উপস্থিত হোল তার ছোড়দা। পশু চিকিৎসক কুকুরকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঠাণ্ডা করল।

সরস্বতীর আর থাকতে ইচ্ছা করল না সেখানে। এতদিন ধরে বলেও তার ছোড়দা তাকে বাড়িছাড়া করতে পারেনি। এখন এই দুর্ঘটনা ঘটার পর, সে মনস্থির করে ফেলল। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে ছোড়দার সঙ্গে চলে আসল সে বাপের বাড়ি।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই সকলের গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখচোখ দেখে সরস্বতী বুঝতে পারল, সে এখানে অবাঞ্ছিত। তার হঠাৎ এভাবে উদয় হওয়া কেউ ভাল চোখে দেখছে না। একমাত্র তার ছোড়দার টাকার জোর আছে বলেই প্রকাশ্যে কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করছে না।

বাবা-মায়ের অবর্তমানে বিবাহিতা মেয়ে পিতৃগৃহে পূর্বের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও জোর খুঁজে পায়না। দু'একমাস যেতে না যেতেই মর্মে মর্মে সেসব উপলব্ধি করল সরস্বতী। সে ঠিক করল, ছোড়দা যা-ই বলুক, এভাবে থাকা চলে না। দাদারা, বৌদিরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা, কেউই তাকে নিজেদের পরিবারভুক্ত মনে করছে না। নিজের জনের কাছে পরের মত থাকা বড় কষ্টকর!

সরস্বতীর ন'দার কর্মস্থল রাঁচি। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। সরস্বতীকে সে অনুরোধ করল, তাদের সঙ্গে গিয়ে রাঁচিতে থাকতে। সরস্বতী শুধুমাত্র পরিবর্তনের আশাতেই রাজী হয়ে গেল। তার মনের অবস্থা হোল, নশ্বর পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তার মধ্যে যতটুকু শান্তি পাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ।

আরেকটি কথা চিন্তা করল সে। শান্তি চাইলেই শান্তি পাওয়া যাবে না, স্থিতি চাইলেই স্থিতি পাওয়া যাবে না। ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ানই হয়ত তার নিয়তি। তার নিয়তিই হয়ত তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার বার ঘোরাবে। অতএব স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলো।

ন'দার বাড়িতে প্রথম কয়েকমাস বেশ ভাল কাটল। তার পরেই সুরু হোল অশান্তি। তাকে কেউ সহ্য করতে পারছে না। সকলের ভাবখানা, 'আপদ বিদায় হলে বাঁচি'।

সরস্বতী বুঝল, আবার তাকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। মনে মনে হাসল সে। পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুনের মত অবস্থা তার। কারুর কাছেই সে বাঞ্ছিত নয়। পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে কেবলি এবাড়ি ওবাড়ি করে যেতে হবে।

ইতঃপূর্বে ছাড়াছাড়ি চেয়ে সরস্বতী কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। একতরফা ভাবে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তাদের আইনসম্মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। অভয়ের এক ঘনিষ্ঠ উকিল বন্ধুর সহায়তা লাভ করেছিল সরস্বতী সে ব্যাপারে। দেবাশিস কোন উকিল নেয় নি। খোরপোষ বাবত চারশ টাকা নির্দিষ্ট হয়েছিল সরস্বতীর জন্য।

সরস্বতী ভাবল, কলকাতায় ফিরে যাবে। একটা ঘর ভাড়া করে স্বাধীনভাবে থাকবে। চাকরির চেষ্টা করবে। অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকা আর নয়।

সরস্বতী ছোড়দাকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখল। তাকে অনুরোধ করল, অল্প ভাড়ায় একটি ঘর খুঁজে দিতে। জবাবে তার ছোড়দা লিখল, সে নিলয়কে বলেছে, সরস্বতীর জন্য সম্ভব হলে তার বাড়ির কাছাকাছি একটি ঘর খুঁজে দিতে। নিলয় রাজী হয়েছে। সরস্বতীর যদি রাঁচি ভাল না লাগে, সে আপাততঃ বরানগরের বাড়িতে এসে উঠুক। বাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সরস্বতী যেন চিন্তা না করে।

সরস্বতী দাদা বৌদিকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল। তাদের অখুশি হওয়ার কথা নয়। একাধিকবার তারা তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছে। কিন্তু সরস্বতী অবাক হোল দেখে যে, সামান্যতম ভদ্রতার প্রলেপ দিতেও যেন তাদের অনিচ্ছা। তাদের ভাবখানা, আপদ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয়, মঙ্গল।

তার বৌদি সোল্লাসে লুফে নিল তার কথা।

—ঠিকই তো। স্বাধীনভাবে থাকাই তো ভাল। তুমি কেন অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকবে ?

সরস্বতী জবাব দিলনা সে কথার। 'অন্যের' কথাটা তার বুকে এসে ধাক্কা দিল। তার সহোদর ভাই এখন আর আপনজন নয়। তার বাড়িতে থাকার অধিকার সরস্বতীর নেই।

অনেকদিন পরে মনে হোল বড়দার কথা, বড় বৌদির কথা। সহোদর ভাই ছিল না সে। কিন্তু কি অসীম ছিল তার স্নেহ, কি অপার ছিল তার ভালবাসা।

একদিনের জন্যও তার ব্যবহারে সরস্বতীরা বোঝেনি, সে তাদের সহোদর ভাই নয়। অনেক পরে তারা জেনেছিল সেই কথা।

বড় বৌদিও অনেকের চেয়েই ভাল ছিল। তার মধ্যে নীচতা, শয়তানি ছিলনা। এখন সরস্বতী নিজের সাংসারিক অভিজ্ঞতার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখে অনেক কিছু। সে বোঝে, তার দাদা একটু বেশি রকমের মাতৃভক্ত ছিল। তাদের প্রতি তার টানটা যদি আর একটু কম দেখাত, তাহলে বোধ হয় বড় বৌদির মনে কমপ্লেক্স তৈরী হোত না।

দেবাশিসের মা বা ভাইবোনেদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত টান যেভাবে তাদের সহজ স্বাভাবিক দাম্পত্যসম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়েছে, সেভাবেই হয়ত তার দাদাবৌদির স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের পথেও তা অন্তরায় হয়েছে।

এত বছর এভাবে সে ভেবে দেখেনি। এতদিন পরে তার মনে হোল, তার বড় বৌদির ওপর অন্যায় করা হয়েছে, অবিচার করা হয়েছে। তার ভালমানুষ দাদাও পুরোপুরি নির্দোষ ছিলনা। বড় বৌদির জন্য বুকটা টন্‌টন্‌ করে উঠল।

বড় বৌদি তাকে কিন্তু ভালবাসত। তার ওপর যেন কন্যাস্নেহ ছিল। অভিমানে দুঃখে বরানগরের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে। কৃষ্ণনগরে বাপের বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে বলে শুনেছে সরস্বতী। কতদিন দেখেনি তাদের। মেয়ে তিনটি কেমন আছে, কে জানে? তারাও অনেক বড় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। তার দাদারাও তাদের খোঁজখবর করে না। দাদাদের দোষ দিয়ে কি হবে? তার বাবাই খোঁজখবর রাখতেন না।

বড় বৌদির কাছে হয়ত সে অনেক ভাল থাকবে। কিন্তু এতদিন পরে নিজের স্বার্থে তার কাছে সম্পর্কের দাবি তোলা যায় না। অতখানি নির্লজ্জতা সে দেখাতে পারবে না।

আর কে জানে? সরস্বতী ভাবল, বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের মনোভাব হয়ত অনেকটাই পাল্‌টে যায়। সে তো আর আগের সরস্বতী নেই? অভিজ্ঞতার পোড় খাওয়া এই সরস্বতীর এখন অন্য রূপ, অন্য প্রকৃতি, অন্য মেজাজ। তার সান্নিধ্য এখন হয়ত কারুর কাছেই বাঞ্ছনীয় মনে হবে না।

কলকাতায় তার ন'দাই তাকে সঙ্গে করে পেঁছে দিল। এ বাড়িতে নিলয় আসে না। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পর এবাড়ির সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন হয়েছে তার। অভয় তাকে সঙ্গে করে নিলয়ের বাড়ি উপস্থিত হোল।

নিলয় বাড়ি খুঁজে পায় নি। তবে তার জন্য চিন্তিত নয়। সরস্বতীকে সে বলল, তার বাড়ির দেড়তলার ঘরটি খালি আছে। সরস্বতী সেখানে থাকতে পারে। ঘর ভাড়ার টাকা বেঁচে যাবে তার। খাওয়া খরচ বাবত তাকে মাসে দুশো টাকা করে দিলেই হবে।

সরস্বতী নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গেল। ভাল প্রস্তাব। ছোট ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকছে না সে। এ বরং ভাল হোল। চোরের মত, অপরাধীর মত মাথা নীচু করে

থাকতে হবে না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে টাকা নেব না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অসন্তোষ প্রকাশ করব, আমরা তোমাকে প্রতিপালন করছি, তুমি আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছ,—এই ভাবটা অনেক অসহ্য।

টালিগঞ্জের বাড়িটি দোতলা। একতলায় রয়েছে নিলয়ের ওষুধ তৈরির কারখানা। তার আয় উপার্জন ভালই। ছোড়দার মত সেও নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে তার কারখানা। ছোড়দার মত যোগ্যতা তার নেই, সততা তো নয়ই। আর পুঁজিও অনেক কম। তবু এই বাড়িটি কিনেছে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করছে ভালভাবে।

সরস্বতী তার ঘরটি দেখে হতাশ হোল। আয়তনে খুব ছোট নয়। কিন্তু ঘরে ডাঁই করে রাখা হয়েছে দরকারী অদরকারী বহু জিনিষ। লোক থাকেনা বটে, তবে তাকে খালি বলা চলেনা।

মনে মনে আবার হাসল সরস্বতী। এখনও এভাবে বিচার করা কি তার সাজে? সে সহায়সম্বলহীন। তার প্রত্যাশা এত বেশি হওয়া উচিত নয়।

নিজেকে সে বোঝাতে চাইল। 'এটুকু যে পেয়েছ, তাই তোমার ভাগ্য। তবু তো নিরাপদ আশ্রয়। তার ওপরে, রান্না করে খেতে হবে না, বাজারে যেতে হবে না। নিজেকে অত টানটান করে রেখোনা, সরস্বতী,—নিজেকে ছেড়ে দাও, শিথিল করে দাও। পরিস্থিতি তোমাকে গড়ে পিটে নিক।'

সরস্বতী অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও চাকরি খুঁজে পেলনা। তবে কয়েকটা টিউশানি যোগাড় করে নিল। নিজের সাবান, তেল, টুথপেস্ট এবং আনুষঙ্গিক অনেক খরচই সে নিজে বহন করে। মাঝে মাঝে ভায়ের ছেলেমেয়ের জন্য কেক, মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে। ছুটির দিনে বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলাদা করে টাকা দেয় খাওয়ার মেনু পরিবর্তনের জন্য। খোরপোষের সমস্ত টাকাটাই ব্যয় হয়ে যায় এভাবে।

একদিন তার ছোড়দার সেই উকিল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। প্রশ্ন করে তার কাছে সব কিছু জেনে নিলেন।

সরস্বতীকে তিরস্কার করলেন তার নির্বুদ্ধিতার জন্য।

—কি বলছ তুমি? টাকা না জমালে চলবে কেন? টিউশানির ভরসা কি? আজ আছে, কাল নেই। খোরপোষের অর্ধেক টাকা নিয়মিতভাবে ব্যাংকে জমা করো। নয়ত মুস্কিলে পড়বে। তোমার ভাই-ই বা কেমন মানুষ? সে আপত্তি করে না, তুমি যে এভাবে খরচ করো?

সরস্বতী মুখরক্ষামত একটা জবাব দিল বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল কথাগুলো। তার সহায়সম্বল কিছু নেই। বাবা তাকে কিছু দিয়ে যাননি। মায়ের গয়না ভাগাভাগি হয়ে গেছে বৌদিদের মধ্যে। একেকজন বিশ পনর ভরি মত সোনা পেয়েছে। সরস্বতী তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার নিজের গয়না পর্যন্ত আত্মসাৎ করে নিয়েছে অন্যরা।

তার ছোড়দার কাছে যে ঘটনার কথা শুনেছে, তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ছোড়দার নেই। মানুষের লোভ তাকে কতখানি নীচ করে তোলে, তার প্রমাণ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে।

তার বাবা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তার ন'দা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ তাকে দেখতে এসেছিল। তার ছোড়দা শুনেছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার বৌদি মেয়েকে বলছে—'শোন, দাদুভাইয়ের কাছে পিসির হারটা চাইবি। বলবি, ওটা আমার খুব পছন্দ। দাদুভাই না করতে পারবে না।'

মরণাপন্ন রুগীর কাছে তার ভাইঝি মায়ের পরামর্শমতো আবদার করেছিল 'দাদু, আমাকে পিসির হারটা দাওনা। ওটা আমার খুব পছন্দ।' দিব্যনারায়ণ রাজী হননি প্রথমে। তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। বলেছেন—'না দিদি, ঐ হার তোমাকে দিতে পারব না। ওটা তোমার পিসির হার। সে ওটা গলায় পরত। তার জিনিষ আমার কাছে গচ্ছিত আছে। ওটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

মেয়ে মায়ের শিক্ষা ভালভাবেই রপ্ত করেছিল। সে নাছোড়বান্দা হয়ে পীড়াপীড়ি করেছিল। তার ছোড়দা তখন সেই ঘরে ছিল। দিব্যনারায়ণ নাতনীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই অভয়কে বলেছিলেন, চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে বাইশ ভরীর সেই ভারী হারটা নাতনীকে দিতে।

সরস্বতীর ছোড়দা একটু কিন্তু কিন্তু করেছিল। বলেছিল—'থাক্ না বাবা, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। পরে যা দেওয়ার, দেবে।' দিব্যনারায়ণ তখন জেদের সঙ্গে বলেছিলেন, 'না, না, আমি বলছি, তুমি দিয়ে দাও। অসুস্থ শরীরে এই উৎপাত সহ্য হয় না।' বাধ্য হয়ে তখন তার ছোড়দা সেই হার বের করে দিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, তার বৌদি চক্ষুলজ্জারও ধার ধারেনি। ভদ্রতা করেও আপত্তি জানায় নি। হার পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই ভয়ে।

ছোড়দার কাছে ঐ ঘটনার কথা শুনে সরস্বতী ভেবেছিল, ঐশ্বর্যই কি ঐশ্বর্যের লোভ বাড়িয়ে দেয়? সত্যিই কি 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব এবাভিভূয়বর্দ্ধতে?' স্কুলে সংস্কৃতের মাস্টারমশাই মাঝে মাঝেই কয়েকটি শ্লোক আওড়াতেন। বোর্ডে লিখে দিতেন। মুখস্ত করতে বলতেন। সেই শ্লোকের তাৎপর্য নিজের পরিবারের মানুষগুলিকে দেখে বুঝতে পারল সরস্বতী। সরস্বতীর মনে উদয় হোল একটি সক্ষোভ প্রশ্ন। এ কেমন পরিবার তার? এই সব লোভী, নীচ, অমানুষ লোকগুলি তার আত্মীয়?

অবশ্য সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত নয়। তার সেজ বৌদি অন্য ধরনের মানুষ। হয়ত বা ধনী পরিবার থেকে আসেনি বলেই তার মনে ধনৈশ্বর্যের লোভ তত উদগ্র নয়। দেবিকারানীর দশগাছা খালি সোনার চুড়ি, তার সঙ্গে একটি সরু হার ও টিকলি পেয়েছিল সে তার ভাগে।

কিছুদিন পরে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হতে সে তার দিকে চারগাছা চুড়ি এগিয়ে দিয়েছিল।

—এই চারগাছা চুড়ি তুমি রাখ। মায়ের গয়না আমরা বৌয়েরা পেলাম, আর

তুমি মেয়ে হয়ে তার কোন ভাগ পাবে না, এ বড় অন্যায়। এটুকু অন্ততঃ নাও।

সরস্বতী তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল।

—না না, বৌদি। আমি কেন তোমার গয়নায় ভাগ বসাব? ও তোমার জিনিষ। আমার কোন অধিকার নেই ওতে। তুমি কেন কিন্তু কিন্তু করছ? গয়না তুমি একাই পাওনি। অন্য বৌদিরাও পেয়েছে। তুমি কেন সংকোচ করছ?

সরস্বতীর সেজ বৌদি তবু জোর করেছিল।

—নাও না, গো। নিলে আমি শান্তি পাই। এ বাড়ির একমাত্র মেয়ে তুমি। অথচ এমনই অদৃষ্ট। কিছুই জুটল না তোমার।

সরস্বতী হেসেছিল।

—তুমি তার কি করবে? তবু তো তুমি আমার জন্য ভাবছ। আর কেউ তো তা নিয়ে মাথা ঘামায় না?

সরস্বতীর সেজদা তখন সেই ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল। সে কিন্তু একটিও কথা বলে নি। সরস্বতী দেখে অবাক হয়েছিল, একবারের জন্যও সে স্ত্রীর সঙ্গে গলা মেলায়নি। মনে মনে আহত হয়েছিল সে। বুঝেছিল, স্ত্রীর ঔদার্যে তার সায় নেই।

সরস্বতীর মেজ বৌদি ধনী পরিবারের মেয়ে। বাপের বাড়ি থেকে প্রচুর গয়না পেয়েছে। পরে শ্বশুর বাড়িতে এসে তার গয়নার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মায়ের গয়নার মোটা ভাগ সেও পেয়েছিল। সরস্বতী বঞ্চিত হয়েছে বলে তার মনে কোন খেদ দেখেনি সরস্বতী।

শাড়ি গয়নার প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি মেজ বৌদির। প্রতি মাসে একাধিক শাড়ি কেনার অভ্যাস তার। সরস্বতীকে হাতে করে একটি শাড়িও দেয়নি সে প্রাণে ধরে। অথচ সরস্বতীর শাড়ির পুঁজি তার চোখে পড়েনি, এমন নয়।

দেবাশিস কোনদিনই খুব একটা শাড়িটাড়ি কিনে দেয়নি। শেষের দিকে তো সেসব পাট চুকেবুকে গিয়েছিল। ছোড়দার কাছে আইন পড়ার খরচ বাবত যে টাকা পেত, তার থেকে একটু একটু করে জমিয়ে সে শাড়ি কিনেছে, ব্লাউজ কিনেছে। ছোড়দার কাছে শাড়ি ব্লাউজের জন্য টাকা চাইতে তার সংকোচ বোধ হোত।

কিন্তু সে কথা থাক। সরস্বতীর অত লোভ নেই। শুধু তার খারাপ লাগে যে, তার গয়নাগুলো আত্মসাৎ করতেও বাধলনা এদের। বাড়ি থেকে চলে আসার সময় কানে, গলায় ও হাতে যা ছিল, সেটুকুই তার সম্বল। দু'গাছা চুড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে আগেই। গিরিজাদের বাড়িতে থাকার সময়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কতদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে?

সরস্বতী খরচের হাত গুটিয়ে নিল। নির্মলদা মিথ্যা বলেনি। তার ভবিষ্যৎ কি? সত্যিই তো! অল্প করে হলেও, কিছু টাকা তার জমানো উচিত। ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

পরিস্থিতি পালটে গেল। সুরু হোল তার অনাদর। নিলয় তাকে খাওয়া খরচ বাবত মাসে দুশো টাকা করে দিতে বলেছিল। কিন্তু কার্যতঃ সে তাতে সন্তুষ্ট নয়।

সরস্বতীর জন্য সকালে বিকালে জলখাবারের যে বন্দোবস্ত ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। সকালে চায়ের সঙ্গে একটি বিস্কুট, বিকালে শুধু চা। বাধ্য হয়ে নিজের জন্য আলাদা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হোল।

মনে মনে আবার একচোট হাসল সরস্বতী। সে টাকা জমিয়ে নিশ্চিন্ত হবে? তার ভাগ্য যে তাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না।

কিছুদিন পর সুরু হোল খাওয়ার কষ্ট। দুপুরে ভাতের সঙ্গে পাতলা জলের মত ডাল, ছোট্ট এক টুকরো মাছ, তার সঙ্গে দু'এক টুকরো পাতলা করে কাটা আলুর ফালি আর রাত্রে রুটির সঙ্গে দু'এক টুকরো আলুর ঝোল। তুলনায় হোস্টেলের খাবার অনেক ভাল ছিল।

নিলয়রা কি খায়, সরস্বতী জানে না। তার খাবার তার ঘরে দিয়ে যায়। সরস্বতী হাঁপিয়ে উঠল। এমন খেয়ে সে সুস্থ থাকবে কি করে? কাজকর্ম করবে কি করে?

সবচেয়ে বেশি বাজল অপমানটা। নিলয়ের ঘাড়ে বসে সে খাচ্ছে না। তবু নিলয়, স্পষ্টভাবে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে তাদের আশ্রিত। তাদের বাড়িতে, তাদের সংসারে, পড়ে আছে।

সরস্বতী ভাবে, সে এখন কি করে? আবার আস্তানা গুটোবে? কিন্তু বাড়ি কোথায় পাবে? তার সে সঙ্গতিই বা কই? তার চেয়ে মুখ বুজে সহ্য করে যাবে। তবু তো বাড়ি ভাড়া লাগে না, বাজারে যেতে হয় না, রান্না করে খেতে হয় না। লেখাপড়ার খানিকটা সময় পায়। মনের চাহিদা মেটায়। দোকানবাজার করে, রান্না করে, কতটুকু সময় উদ্বৃত্ত থাকবে?

একদিন স্পষ্ট করে নিলয় তার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করল সরস্বতীর কাছে।

—দিদি, তুই অন্য ব্যবস্থা দেখ। আমার অসুবিধা হচ্ছে। ওষুধপত্র ঠিকমত গুছিয়ে রাখার জন্য এই ঘরটা আমার দরকার।

সরস্বতী আগেই বুঝেছিল, তার এখানে থাকার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। নিলয় ও তার বৌ ইদানীং তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। তার কাছে ঘেঁষে না। কেন, তা জানেনা সরস্বতী। খাওয়ার কষ্ট দিয়ে, নিঃশব্দে নানাভাবে অপমান করে পরোক্ষভাবে তাকে বিদায় নিতে বলছিল তারা। সরস্বতী সেসব গ্রাহ্য না করে রয়ে গেছে দেখে মরীয়া হয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে।

এরপর, জোর করে থাকা যায় নাকি? সরস্বতী আবার খুঁজতে লাগল হোস্টেল। আগে দেবাশিস খুঁজে দিয়েছিল হোস্টেল। সরস্বতীকে তার জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। এখন কে সেই ঝামেলা পোহাবে? নিলয়কে সে অনুরোধ করবে না। নিলয়দের সঙ্গে অতঃপর সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে। অসহায় সহোদর বোনকে যে ঘরের এক কোণে ঠাঁই দিতে পরাঙ্মুখ, তার সঙ্গে কিসের আত্মীয়তা? তুলনায় পরও অনেক ভাল।

ছোড়দাকে জানালে হয়ত কাজ হয়। কিন্তু সরস্বতীর অভিমান হোল।

কি দরকার ? সে ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসার কাজে আজ এখানে, কাল ওখানে, দৌড়া-দৌড়ি করে। তার খবর নিতেও সময় পায় না। সরস্বতী আর অন্যের ওপর নির্ভর করবে না। এখন থেকে নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি নিজে বহন করবে। তার সুখদুঃখের মালিক হবে সে নিজে।

এতদিন পরগাছার জীবন যাপন করেছে সরস্বতী। কাউকে না কাউকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজেছে। আর সে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। নিজের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সে নিজে করবে। শাকভাত খেয়ে থাকবে, কুঁড়ে ঘরে থাকবে। তবু নিজেকে আর অসম্মানিত করবে না।

টিউশানির এক বাড়িতে সরস্বতী একটি হোস্টেলের খোঁজ পেয়ে একদিন দেখে এল সেটি। হাজরার মোড় থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। সুপারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এল।

হোস্টেলটি আদৌ পছন্দসই নয়। প্রায় ডরমিটারির ব্যবস্থা। এককে ঘরে পাঁচ জন, ছয় জন, করে মেয়ে থাকে। যৌথ রান্নাঘরে রয়েছে রান্নার ব্যবস্থা। বোর্ডারকে নিজে রান্না করে নিতে হবে। প্রত্যেকে একটি করে স্টোভ ও আনুষঙ্গিক জিনিষ রাখে তার জন্য।

তুলনায় আগের হোস্টেল ছিল স্বর্গ। কিন্তু ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! নিলয়ের বাড়িতে আর নয়। পরের দিনই সরস্বতী জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে এল নতুন হোস্টেলে। সুরু হোল তার নতুন জীবন।

॥ ষোল ॥

সরস্বতী জানত, দুঃখের ভোগ নাকি ক্রমে কেটে যায়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সব অন্যরকম হয়ে যায়। তাকে নিয়ে যেন একটি পরীক্ষা চলেছে। তার ভাগ্যে কি আছে, তা কেউই জানে না। সমস্তই অনিশ্চিত। স্বয়ং বিধাতাপুরুষই যেন ভেবে পাচ্ছেননা, তাকে নিয়ে কি করবেন। কত খেলাই না তিনি খেলাচ্ছেন তাকে দিয়ে!

নতুন হোস্টেলের পরিবেশ আগের হোস্টেলের পরিবেশের মত নয়। এখানে যেসব মেয়ে আছে, তারা জীবনযুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষ।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠল সরস্বতী। বাজার করে, দোকানপাট করে, রান্না করে, তার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তারপরে আছে, টিউশানি।

সঙ্গী হিসাবে যারা আছে তার সঙ্গে তার ঘরে, তাদের সঙ্গে কি শিক্ষায়, কি রুচিতে, কি মানসিকতায়, একেবারেই মেলেনা। আগে যে হোস্টেলে ছিল, সেখানে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি বাতাবরণ বিদ্যমান ছিল। জীবনের অর্থ সেখানে খাওয়া, শোওয়া, ঘুমোনোর মধ্যে সীমিত ছিল না। এখানে যে মেয়েরা আছে, তারা অন্য রকমের। অপরের ব্যক্তিগত খবরে তাদের যত কৌতূহল, বিশ্বজগতের খবরাখবর সম্পর্কে তার সিকি ভাগও নেই।

তার পরে রয়েছে আরও নানা ধরনের সমস্যা। প্রায়ই তেল চুরি যায়, তরকারি

চুরি যায়, মশলাপাতি চুরি যায়। সরস্বতী এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত। প্রথম প্রথম সে খেয়াল করত না। তার অবাক লাগত এত তাড়াতাড়ি কি করে তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। রান্না করতে গিয়ে হিমসিম খায়। তেল নেই। কি-ই বা সে রান্না করে? তবু তেল কিনে কিনে হয়রান।

সুপারের কাছে সব রহস্যের সমাধান হোল। সরস্বতী শুনল, তার তেল চুরি যায়। তাকে সতর্ক হতে হবে। একসঙ্গে বেশি তেল কেনা চলবে না। আর তেলের শিশিটি ভাল করে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

যে মেয়েটি তেল চুরি করত, তাকে একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলল সরস্বতী। ফল খুব ভাল হোল না। সরস্বতীকে লেখা সুনির্মলের চিঠিগুলো চুরি গেল। মহার্ঘ্য সম্পদের মত সে সযত্নে রক্ষা করেছিল সেগুলি এতদিন। দেবাশিসের সঙ্গে বিয়ের পরও সেগুলি নষ্ট করেনি। আশ্চর্যের কথা, দেবাশিসও মাথা ঘামায়নি চিঠিগুলো নিয়ে। হয়ত ইংরাজিতে লেখা বলেই সে সন্দিহান হয়নি। ভাবতেই পারেনি, আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হতে পারে সেগুলির মধ্যে।

সরস্বতী জানে, সুনির্মলের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, তা আর জোড়া লাগবে না। নতুন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার কথা অকল্পনীয়। কিন্তু সুনির্মলের স্মৃতি বড় মধুর, বড় রোম্যান্টিক। সে অভিমানে, দুঃখে, তার কাছে থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। শুধু তার অনবদ্য চিঠিগুলো সরস্বতী পরম মমতায় নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে সেগুলি বার করে সে পড়ত। জীবন জগৎ সম্পর্কে, মানুষের সম্পর্কে, অনেক ভাবনাচিন্তা ছিল সুনির্মলের। তার ফসল তার লেখা চিঠিগুলো। সুনির্মলের সান্নিধ্যের তাপ সরস্বতীর শরীরে মনে এসে লাগত। সে তার কুঁকড়ে যাওয়া হিমাক্ত মনে তাপ সঞ্চার করে তাকে উজ্জীবিত করে তুলত।

চিঠিগুলো কিভাবে চুরি গেল, ভেবে পেল না সরস্বতী। সে কি অসাবধানে তার ট্রাঙ্ক খোলা রেখেছিল, না চিঠির তাড়া বার করে পরে ঢুকিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিল? অনেক ভেবেও কিছু মনে করতে পারল না।

দুঃখে দীর্ণ হয়ে গেল সরস্বতী। বিনা প্রমাণে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। অনাত্মীয় পুরুষের লেখা চিঠিগুলো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়িও করা চলে না। লোকে কদর্থ করবে। চিঠিগুলো তাকে অবশ্যই ব্ল্যাকমেল করার জন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

রুচিহীন মনে হতে পারে, এমন কিছু চিঠিগুলোর মধ্যে নেই। তার ভয় সেখানে নয়। কি ক্ষতি হবে তার? শুধু সুনির্মলের যেন কোন ক্ষতি না হয়। দেবাশিসের লেখা চিঠিগুলি তার বাড়ির লোকেরা সরিয়ে ফেলেছিল। সরস্বতীর খারাপ লেগেছিল। কিন্তু সুনির্মলের চিঠিগুলি খোয়া যাওয়াতে সরস্বতী যেন নিঃস্ব হয়ে পড়ল।

হোস্টেলে নিজের মনে থাকে সরস্বতী। কারুর সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করে

না। কিন্তু সর্বত্র দু'একজন করে 'কমলি নেহি ছোড়তা' স্বভাবের লোক থাকে। নাছোড়বান্দা সেই সব লোককে চেষ্টা করেও এড়ানো যায় না। সরস্বতীও এড়াতে পারল না, ইন্দিরা নামে একটি অতি-আলাপী, অতি-মিশুকে মেয়েকে।

ইন্দিরার একটি ইতিহাস আছে। তার বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। হোস্টেলে তার থাকার কথা নয়। কিন্তু বাড়িতে ভাড়াটে পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তার। বাড়ির কর্তা যে কোম্পানিতে কাজ করতেন, সেই কোম্পানি গুটিয়ে ফেলে ব্যবসা। অতএব চাকরি চলে যায়। কোন রকমে এটাসেটা করে চলছিল তাদের। অনেক সময় দু'বেলা ভালভাবে খাওয়া পর্যন্ত জুটেছিল না। ইন্দিরা গোপনে চালটা, ডালটা, সরবরাহ করত। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই। অনেকদিনের ভাড়া বাকি পড়ে। ইন্দিরার বাবা নোটিশ দেন। বাড়ি ছাড়তে হবে। তারা ওবাড়ি ছেড়ে তাই অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ইন্দিরার সঙ্গে অশোকের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে ইন্দিরার বাবা তাকে বকাবকি করেন। অশোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন। অশোক স্কুল ফাইনাল পাশ। টুকটাক এটাসেটা করে। কোন চাকরি জোটাতে পারেনি। দীনদরিদ্র অবস্থা। ইন্দিরার বাবা চান না, ওরকম একটা হাঘরের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ে জড়িয়ে পড়ে। মেয়েকে তিনি শাসিয়েছেন যে, যদি তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তাহলে তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন।

সেই কারণে সে বাড়িছাড়া। নারীমঙ্গলে সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা চাকরি জোগাড় করেছে। আর. আই. সি.-তে। ইন্দিরা নিজে স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। নিজের মাকে পাঁচ ছয় বছর বয়সে হারিয়েছে। পড়াশোনায় তার আগ্রহ নেই। বাবা কিংবা সৎমাও সে ব্যাপারে জোরাজুরি করেননি। অন্য ভাইবোনেরা পড়াশোনা করছে। তারা পড়াশোনায় ভাল।

সরস্বতী প্রথম প্রথম ইন্দিরাকে পাত্তা দেয়নি। একেবারেই ভাল লাগত না তার মেয়েটিকে। ইন্দিরার বইপত্র পড়ার অভ্যাস নেই। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সীমিত। আলোচনার পরিধি 'থোড়বড়ি খাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড়।' বয়সেও অনেক ছোট। সরস্বতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে কি করে? ইন্দিরা তার বিরূপতা দূর করল অভিনব উপায়ে।

টিউশানি সেরে হোস্টেলে ফিরতে মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায় সরস্বতীর। এসে দেখে, ইন্দিরা রান্না করে রেখেছে। সরস্বতীকে কিছুতেই রান্না করতে দেবেনা সে। তাকে রীতিমত পীড়াপীড়ি করে, তার সঙ্গে বসে তার রান্না করা খাবার খেতে। সরস্বতী রাজী হয় না দেখে ইন্দিরা প্রায় কেঁদে ফেলে।

—তুমি এমন কেন, সরস্বতীদি? এক হোস্টেলে এক ঘরে আছি আমরা। একদিন যদি ইচ্ছে করে, তোমাকে কিছু করে খাওয়াই, তাহলে কি সেটা খুব অন্যায় হয়? তুমি যদি আমাকে বলো খেতে, আমি কিন্তু না করব না। সঙ্গে সঙ্গে থালা নিয়ে বসে পড়ব।

সরস্বতী নরম হয় না।

—আমি পছন্দ করিনা এসব। আমি জানি, পরে অনেক কথা হতে পারে তা নিয়ে। আমি একটি স্পষ্ট নীতি মেনে চলি। সেটি হোল, আমি নিজে যেমন কাউকে খাওয়াব না, তেমন অন্য কেউ আমাকে খাওয়াক, সেটাও চাইব না।

ইন্দিরা কাঁচুমাচু হয়ে অন্য যুক্তি দেখায়।

—ঠিক আছে। তোমার নীতি তুমি মেনে চলো। আজকের মত আমার কথা রাখ। তোমার আসতে দেরি দেখে ভেবেছি, অত বেলায় ফিরে কি রান্না করবে? তাই দু'জনের মত রান্না করেছি। তুমি না খেলে নষ্ট হবে।

নিরুপায় সরস্বতীকে খেতে বসতে হয়। কিন্তু সে দৃঢ়সংকল্প—নীতিভ্রষ্ট হবে না। ইন্দিরাকে মূল্য ধরে দেয়। আপত্তি জানিয়েও ইন্দিরা তার অন্যথা করতে পারে না।

পরে অন্য কৌশল অবলম্বন করল ইন্দিরা। সরস্বতী খেতে বসলে, তার পাতে কোন তরকারি ঢেলে দেয়। সরস্বতীর আপত্তি গ্রাহ্য করে না। সরস্বতী মূল্য ধরে দেওয়ার কথা বললে, ইন্দিরা তার বিস্ময় ও বিরক্তি গোপন রাখত না।

—তোমার মত কাউকে দেখিনি, সরস্বতীদি। তুমি খুব অদ্ভূত। কেউ কাউকে খাওয়ালে যে তাকে মূল্য ধরে দিতে হয়, তা আমি বাপের জন্মে শুনিনি।

সরস্বতী নিরস্ত্র হয়ে পড়ে। নিজের কাঠিন্য বজায় রাখতে পারে না।

—আমার মত অভিজ্ঞতা তো তোর হয়নি? তাই একথা বলছিস। জীবনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, বুঝেছিস? একটা সার কথা বুঝেছি, অনেক মূল্য দিয়ে। এ সংসারে কেউ কারো নয়। আমরা যাকে নিকট সম্পর্ক বলি, তার মধ্যেও অনেক ফাঁক থাকে।

পরিবেশ অন্য রকম হয়ে যায়। ইন্দিরা বোঝে, সরস্বতী খানিকটা ধরা দিয়েছে। সে তার সুযোগ নেয়। মনের কৌতূহল ব্যক্ত করে।

—আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে তোমার কথা। শুধু সাহস হয় না জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সব কথা চেপে রাখলে তো কষ্ট কমবে না, সরস্বতীদি?

সরস্বতী তখনই নিজের ইতিহাস অনাবৃত করে মেলে ধরেনি ইন্দিরার কাছে। তবে ইন্দিরার বিস্ময় তাকে ওতঃপ্রোতভাবে নাড়া দিল। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হোল সরস্বতী। সত্যিই অনেক বদলে গিয়েছে সে। নিষ্ঠুর পৃথিবী তাকে দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মেরেছে। সারা শরীরে মনে তার ছ্যাকা। সে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে।

তার পরিবারের মানুষগুলির দুর্ব্যবহার কি এ জীবনে মুছে ফেলা যাবে স্মৃতি থেকে? মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা ও সম্পর্ক চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাস, মায়ামমতা ও ভালবাসা কতগুলি ফাঁপা শব্দ। ফুলিয়ে ফাপিয়ে বেলুনের মত করে, সেগুলি নিয়ে খেলে মানুষ। যে কোন সময়ে ফেটে যেতে পারে সেগুলি সশব্দে।

নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করার আর বাসনা নেই সরস্বতীর। খেলা অনেক হয়েছে। হেরে হেরে গোহারা হয়ে গেছে। আর খেলবে না সে। রক্তমাংসের শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, সমাজ সংসারে চলতে গেলে, যতটুকু খেলা দরকার, ততটুকু খেলতে হবে।

'কমলি নেহি ছোড়তা'। ইন্দিরা সরস্বতীকে কতভাবে বাঁধতে চায়। সরস্বতী এক বাঁধন ছাড়ায়, তো অন্য বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা জয়ী হয়। সরস্বতী তার অভিজ্ঞতা অর্জিত কাঠিন্য আর নিরাসক্তি দেখিয়েও তাকে প্রতিহত করতে পারল না। মনের রাশ অজান্তে একটু একটু করে আলগা হয়ে গেল। ইন্দিরার সামনে ফ্ল্যাশব্যাকে অভিক্ষিপ্ত হোল সরস্বতীর পূর্ব ইতিহাস। ইন্দিরা শুধু বিস্মিত নয়, সে যেন অভিভূত হয়ে গেল।

—সত্যি বিশ্বাস হয়না, সরস্বতীদি। মনে হয়, গল্প শুনছি। এত সব ঘটেছে তোমার জীবনে?

সরস্বতী হাসে।

—আমারই বিশ্বাস হতে চায় না। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলাম, আর ভাগ্য আমাকে সেখান থেকে কোথায় না ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ইন্দিরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

—কপাল এজন্যই বিশ্বাস করতে হয়, সরস্বতীদি। এত বড় ঘরের মেয়ে তুমি, এত সুন্দর তোমার চেহারা! কিন্তু কপাল তোমার সত্যিই বড় খারাপ। সব পেয়েও তাই সব থেকে বঞ্চিত হলে। সব থেকে আশ্চর্য লাগছে, দেবাশিসের কথা ভেবে। তোমার প্রেমে পড়েছিল সে। তার জন্য তুমি বাড়ি ছাড়লে। তোমাদের বিয়ে হোল। তারপরে কেন সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল? তুমি বলছ, তোমাকে সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারত না। কি করে হয় তা? একান্নবর্তী পরিবারে অন্যের জন্য অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, তাদের মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে অন্যেরা। তোমাদের তো ছিল টোনাটুনির সংসার। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকও বলছ খারাপ ছিল না। আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার বর নিশ্চয় অক্ষম ছিল।

সরস্বতী চেষ্টা করেও দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রাখতে পারে না।

—আমার সেজ বৌদিও এক কথা বলে। আমি বৌদিকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা বৌদি, আমাকে কি কোন পুরুষমানুষের পেতে ইচ্ছা করে না? আমাকে দেখে কি পুরুষ মানুষের মনে বিতৃষ্ণা জাগে?' বৌদি বলেছিল, "তোমার মত সুন্দর যৌবনবতী মেয়েকে দেখে যার আকাঙ্খা জেগে ওঠে না, সে কখনই সুস্থ স্বাভাবিক নয়। আমার ধারণা সে অশক্ত, নপুংসক।" আমারও কি কম অবাক লাগত? মনোমালিন্য তো পরে হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরে পরেই দেখেছি আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। কেমন ছটফট করত। মায়ের জন্য, বোনেদের

জন্য অত টান ওর অন্য ভায়েদের ছিল না। তারাও অবাক হোত। আমার যে দেওর আমার সঙ্গে আইন পড়ত, সে পর্যন্ত বলত, ওর দাদা স্বাভাবিক নয়।

ইন্দিরার স্বভাবে দয়া, মায়া, সহানুভূতি আছে। কিন্তু কারণে অকারণে তার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস সরস্বতীর মনে বিরক্তি উদ্রেক করে। অনেক সময় সরস্বতীকে বাঁচানোর জন্য সুপারের কাছে মিথ্যা কথা বলে। সরস্বতী তাকে প্রতিহত করতে পারেনা। সরস্বতীর সংসার-অনভিজ্ঞতা দেখে বহুসময়েই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ইন্দিরা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজান্তে তাকে স্বীকার করে ফেলে সরস্বতী। ক্রমে ইন্দিরা তার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সরস্বতী এক সময়ে ভাবতে শুরু করে, ইন্দিরা না থাকলে এই হোস্টেলে টিঁকে থাকা মুশকিল হোত।

একদিন তার একটি প্রশ্ন শুনে চমকে গেল সরস্বতী।

—আচ্ছা, সরস্বতীদি, সরকারী ফ্ল্যাট পেলে কিনবে তুমি?

এক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে সরস্বতী।

—আমার অত টাকা কই? তুই তো সবই জানিস। ফ্ল্যাট কেনা কি আমার মত লোকের পক্ষে সোজা কথা?

—সস্তায় পেলে? তুমি তো জান, আমি আর. আই. সি.-তে কাজ করি। আমি চাইলে একটা ফ্ল্যাট পেতে পারি। অবশ্য বড় ফ্ল্যাট ওরা আমাকে দেবে না। তবে তুমি একা মানুষ। তোমার চলে যাবে।

সরস্বতী তার বিস্ময় ব্যক্ত করে।

—কিন্তু তোর ফ্ল্যাট আমি পাব কি করে? আর সেটা কি বেআইনী হবে না?

ইন্দিরা হাসে। অমায়িক হাসি।

—সেসব তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি রাজী কিনা বল। আমি বেআইনী কিছু করব না। তোমাকে আমি 'নমিনী' করব। ফ্ল্যাটটা পেলে তোমাকে দানপত্র করে দেব। দলিল সেভাবেই তৈরি করা হবে।

সরস্বতী অভিভূত বোধ করে।

—আমার জন্য তুই কেন স্বার্থত্যাগ করবি? তোর নিজের তো দরকার আছে ফ্ল্যাটের, তাই না? আর অত টাকাই বা কই আমার?

—তোমার যা আছে, আমার তা-ও নেই। তোমাকে ফ্ল্যাটটা কেন দিতে চাইছি, জানতে চাইছ? আমার থেকে তোমার প্রয়োজন বেশি বলে। তোমার মাথা গোঁজার স্থানটুকুও নেই। তোমার ভায়েদের কথা শুনে বুঝেছি, তারা তোমায় দেখবে না। আমার অবস্থা তোমার থেকে অনেক ভাল। আমার তবু বাপের বাড়ি আছে। তিনতলা বাড়ি আমাদের। সম্পত্তির ভাগ থেকে বাড়ির মেয়েকে বঞ্চিত করবেন না বাবা। আর শ্বশুর বাড়িতেও থাকার জায়গা আছে।

সরস্বতী রসিকতা করল।

—'দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন'—তাই তো?

ইন্দিরা কিছু বুঝল না। তার প্রশ্নেই মালুম হোল সেটি সরস্বতীর।

—কি বললে?

সরস্বতী খোলসা করল না। শুধু হাসল।

—কিছু না। কিন্তু আমি কেন ফ্ল্যাট নেব? আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। ঠিক চলে যাবে আমার। আর কেউ না দেখুক, ছোড়দা আমায় ফেলে দেবে না। তেমন অসুবিধায় পড়লে, ছোড়দার শরণাপন্ন হবো। ও ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে।

একটু দমে গেল ইন্দিরা।

—তুমি যা ভাবছ, তা নয়। নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জন্য যে ফ্ল্যাটগুলি তৈরি হয়, সেগুলির জন্য বেশি দাম দিতে হয় না। অনেক সস্তায় পাবে তুমি। ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট দশেকের পথ। এরকম জায়গায় সস্তায় ছিমছাম ফ্ল্যাটে থাকবে নিজের মত করে—তোমার ইচ্ছে হয় না?

সরস্বতী আত্মবিস্মৃত হোল।

—ইচ্ছে হয়। কিন্তু সঙ্গীতির কথাটাও তো ভাবতে হবে?

—তুমি কিছু ভেবো না। ক্ষেপে ক্ষেপে দিলেই হবে। অল্প পয়সায় এমন ফ্ল্যাট আর পাবে না। এই সুযোগ তুমি হারিও না, সরস্বতীদি।

সরস্বতী অনেকগুলো টিউশানি করে। মাসে হাজার টাকা মত আয় হয় তা থেকে। খোরপোষ বাবত দেবাশিসের কাছ থেকে পায় চারশ টাকা। ছোট ভাইয়ের বাড়িতে থাকার সময় থেকেই টাকা জমাতে শুরু করেছে সে। প্রথম দিকে বেশি জমাতে পারে নি। তখন টিউশানি যোগাড় হয়নি। খোরপোষের টাকার বেশির ভাগই খরচ হয়ে গেছে। পরের দিকে ছোড়দার উকিল বন্ধুর পরামর্শমত নিয়মিতভাবে মোটা হাতে টাকা জমানো সুরু করে সে। টাকায় টাকা বাড়ে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা মুরগীর মত ডিম পাড়ে। একটু একটু করে বেশ কয়েক হাজার টাকা জমে গেছে ব্যাঙ্কে।

ফ্ল্যাটের জন্য সরস্বতী তুলে আনল সেই টাকা। পরে নিয়মিতভাবে কখন হাজার, কখন পাঁচশ, এভাবে দিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে চিন্তা হোত সরস্বতীর। সব পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অসুখবিসুখ হলে কি করবে? অন্যের কাছে হাত পাতবে?

কিন্তু ইন্দিরা তাকে নিজের বাড়ির যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তার ঘোরে সব চিন্তাভাবনা সরিয়ে দিল সে মন থেকে। সরস্বতী দেখল, সে একাই নয়, ইন্দিরাও তার মত করে তার জন্য চিন্তা করে, দুশ্চিন্তা ভোগ করে। তার ওপর ইন্দিরার এত টান দেখে বিস্মিত হয় সরস্বতী। ভাবে আপনজন পর হয়ে যায়, অথচ পরও কত আপন হয়ে ওঠে।

ইন্দিরাও পরের দিকে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

—সত্যি একটা ফ্ল্যাটের জন্য এত ঝামেলা নিতে হবে, বুঝিনি। তোমার কাছে

আজকাল টাকা চাইতে আমার খারাপ লাগে, সরস্বতীদি। আবার এও ভাবি যে, শেষ পর্যন্ত তো একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে বসবে। এখানে ওখানে আর যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে না।

সরস্বতী খুশি হয়।

—সে তো ঠিকই। তবু তো তুই ছিলি বলে সুযোগটা পেলাম। টাকা চাইতে তোর খারাপ লাগছে কেন, বুঝছি না। তুই তো আর নিজের জন্য টাকা চাইছিস না। চাইছিস আমার ফ্ল্যাটের জন্য। তোর এত সংকোচ বোধ করার কারণ কি? আমার বাড়ির লোকে কি ভাবে, আমি কোথায় আছি, না কোথায় থাকব? ভাবে না। তারা আমাকে তাদের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। আমি আমার পরিবারের কাছে বাতিল হয়ে গিয়েছি। তোর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই আমার। তবু তুই উঠে পড়ে লেগেছিস, আমার যাতে একটা মাথা গোঁজার আস্তানা হয়। আজকালকার দিনে কেউ কারো জন্য এত করে না!

ইন্দিরা তার আবেগ গোপন করে না।

—তোমাকে যে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি, সরস্বতীদি। আমার তো নিজের দিদি নেই। তুমি আমার দিদির মত। তোমাকে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। ভাবি, কত বড় ঘরের মেয়ে হয়েও আজ এভাবে এত কষ্টে জীবন কাটাতে হচ্ছে কেন তোমাকে?

সরস্বতী অভিভূত হয়।

—ভাগ্য, সবই ভাগ্য, বুঝলি, ইন্দিরা। তুইও তো অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তোর কাছে যতটুকু শুনেছি, তাতে বুঝেছি, তোর বাড়ির অবস্থাও সাধারণের থেকে অনেক ভাল। তুইও কি কম কষ্ট করছিস?

কিন্তু ইন্দিরাকে দেখে অনেক সময়েই অবাক হয় সরস্বতী। তার চালচলন, কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে সঙ্গতিপন্ন বাড়ির ছাপ নেই। স্টেনলেস বাসন বলতে কিছু নেই। অ্যালুমিনিয়ামের একটা কাঁসিতে অনেকটা পরিমাণ ভাত নিয়ে যখন সে খেতে বসে, তখন তাকে দেখে সরস্বতীর অস্বস্তি হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তার মনে হয়, তাদের বাড়িতে দাসদাসীরাও বুঝি অনেক বেশি শোভনতা মেনে চলত।

ইন্দিরার খাদ্যতালিকা দেখেও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সরস্বতীর মত রুটি মাখন ডিম কলা হরলিক্স দিয়ে প্রাতরাশ সারার পাট নেই তার। একটি দুটি বিস্কুট সহযোগে একগ্লাস চা তার সকালের খাবার। দুপুরের খাবারও তথৈবচ। আলুসেদ্ধ ভাতের সঙ্গে অনেকখানি ডাল হলেই চলে যায় তার। খুব কম দিনই মাছ খায় সে। তরিতরকারিরও পাট নেই তেমন। সরস্বতী দেখে অবাক হয়, সময়ের তরিতরকারি বা ফল খেতেও যেন আগ্রহ নেই ইন্দিরার।

বিশাল কাঁসিতে একরাশ ভাত ডাল দিয়ে মেখে যখন সে বড় বড় গ্রাসে হাপুস হুপুস শব্দ করে খায়, তখন সরস্বতী কেমন এক বিতৃষ্ণা আর বিরাগ বোধ করে। মনের ভেতরে উঁচিয়ে ওঠা রাগ, বিরক্তি আর ঘৃণা দাবিয়ে রাখতে পারে না।

ইন্দিরাকে অসহ্য লাগে। সরস্বতী ভাবে, ইন্দিরার বাড়ির অবস্থা ভাল হতে পারে, কিন্তু তার রুচি মোটেই ভাল নয়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি—কোন দিক দিয়েই মেনে নিতে পারে না সে ইন্দিরাকে। হোস্টেলের দু'একজন মেয়েও রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে ইন্দিরার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব দেখে।

শমিতা চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এম. এ. পড়ে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ইন্দিরার সম্পর্কে সে যা বলল, তা শুনে সরস্বতীর মন খারাপ হয়ে গেল। তাকে একরকম সাবধান করে দিল সে ইন্দিরার সম্পর্কে।

—তোমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করছে কেন ও, সরস্বতীদি? অবশ্যই কোন মতলব আছে। তুমি সাবধান থেক। একদম সুবিধের নয় ঐ মেয়ে।

সরস্বতী আপত্তি জানাল। ইন্দিরা তার জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করছে। অনেক সময় অর্থ দিয়ে না হোক, গায়ে গতরে খেটে বা অন্যভাবেও সাহায্য করে তাকে ইন্দিরা। তার বিরুদ্ধে ঐসব মন্তব্য তার ভালো লাগল না। ইচ্ছা হোল, শমিতাকে সে জানায়, ইন্দিরা তার জন্য কত ভাবে। ওকে তার ফ্ল্যাটের কথা বলে। বলে, ইন্দিরার কোন মতলব নেই। সে আসলে পরোপকারী। অনেকের থেকেই দয়া মায়া মমতা বেশি আছে তার মধ্যে।

কিন্তু মনে পড়ল, ইন্দিরা তাকে নিষেধ করেছে। বলেছে, ব্যাপারটা যেন তাদের দুজনের মধ্যে আপাততঃ সীমাবদ্ধ থাকে। নাহলে ইন্দিরার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

সরস্বতীর অভিজ্ঞতা কম। অফিস, চাকরি, নিয়মকানুন, কিছুই জানেনা। এত বছর সে অপরের ছত্রছায়ায় থেকেছে। তার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। তার মেজদা বাবাকে সাহায্য করত। সেজদা বি. এ. পাশ করে চলে গিয়েছিল বিলাতে। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারের একটা ট্রেনিং নিতে। তার ছোড়দাও ব্যবসায়ী। অন্য ভাইরা একেক জন একেক জায়গায় থাকে। তাদের সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়নি। সে কি-ই বা বোঝে?

ইন্দিরা বলেছে, অন্যদের বললে তার ক্ষতি হবে। ইন্দিরার পরোপকারের প্রতিদানে সে তার অপকার করবে? শমিতাকে ফ্ল্যাটের কথা কিছু জানাল না সরস্বতী। কিন্তু তাকে পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়ল না।

—আমাকে তোমার সাবধান করে দিতে হবে না, শমিতা। আমার বয়স তোমার থেকে বেশি, অভিজ্ঞতাও তোমার থেকে কম না। কারুর সম্পর্কে খুব খারাপ কথা অত সহজে বলা কি ঠিক? তুমি কতটুকু জান ওর সম্পর্কে? ও যে সুবিধার নয়, তা জানলেই বা কি করে?

শমিতা একটু দমে গেল।

—সরস্বতীদি, তুমি আমার ওপর রাগ করছ। আমি অকারণে ওকথা বলিনি। পরে তুমি বুঝবে। আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না। বলাটা এখন

ঠিক হবে না। তুমি বিশ্বাস করবে না। শুধু জেনে রাখ, ওর অনেক রকম লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে। আমি রাস্তাঘাটে অনেক বাজে ধরনের লোকের সঙ্গে ওকে দেখেছি। আমার ধারণা, কোন চোরাই চালানদার দলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। তুমি তো খুব সাদাসিধে। তোমাকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। তাই বয়সে ছোট হয়েও তোমাকে সাবধান করে দিলাম। তুমি অন্যরকম অর্থ করো না, প্লীজ।

এসব শুনে সরস্বতীও যেন দমে গেল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে কেবলি ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। ইন্দিরার স্বভাবের অনেক দিক তার পছন্দ নয়। ইন্দিরার অনেক কিছু তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু শমিতার কথাও বিশ্বাস করা শক্ত।

ইন্দিরাকে এসব কিছু জানাল না সরস্বতী। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করল, ইন্দিরাকে একটু বাজিয়ে দেখবে। সত্যিই তো, কতটুকু দেখতে পায় সে?

ইন্দিরা যথারীতি ফ্ল্যাটের জন্য আবার যখন টাকা চাইল, সরস্বতী বেঁকে বসল।

—শোন, আমি খুব ভাল বুঝছি না। সমানে টাকা দিয়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমার টাকা মারা যাবে না তো?

ইন্দিরার মুখ কালো হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে কষ্টে ঢোক গিলল সে।

—তুমি বলতে পারলে এমন কথা, সরস্বতীদি? আমি তোমাকে ঠকাব? জানি না, কে তোমাকে কি বলেছে? এখন বুঝবে না। পরে বুঝবে, আমি তোমার জন্য কি করেছি, কতটা করেছি।

সরস্বতী ভাবল, শমিতাও এক কথা বলেছিল। পরে বুঝবে সরস্বতী। পরে কি বুঝবে সে? শমিতার কথা ঠিক, না ইন্দিরার কথা ঠিক? ভাগ্যকে দেখতে পেলে মানুষ তার করণীয় কত সহজে স্থির করতে পারত।

ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে ইন্দিরার কথাই বিশ্বাস হোল তার। তবু ইচ্ছা করেই ইন্দিরাকে আরও আঘাত দিতে চাইল। তাকে আরও বাজিয়ে দেখতে চাইল।

—সে তো বুঝবই। তখন কি আর কিছু করার থাকবে? সর্বস্ব খুইয়ে ভিখারী হয়ে যাব যে। ফ্ল্যাটও হবে না, ব্যাঙ্কেও একটি পয়সা থাকবে না। তুমি কি আর আমার ধারে কাছে থাকবে? তোমাকে কোথায় পাব তখন?

ইন্দিরা যেন ধরতে পারল সরস্বতীর মনোভাব। কিন্তু সে সরস্বতীর কথা ধরল না।

—ভাল একটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যখন বসবে, তখন আর আমাকে কি দরকার হবে? এখন সব সহ্য করছি কেন জান, সরস্বতীদি? আমি তোমাকে দেখাতে চাই, মানুষকে বিশ্বাস করলে তার ফল ভালই হয়। পরে তুমি আপশোস করবে। বুঝবে, আমাকে অবিশ্বাস করে আমার প্রতি তুমি কত অন্যায় করেছ।

কিছুদিন পর ইন্দিরা তাকে আরও একটি লাভজনক স্কীমের সঙ্গে যুক্ত করতে

চাইল। সরস্বতী শুনল, তাদের অফিসে একটা স্কীম চালু আছে—সেখানে টাকা রাখলে মাসে মাসে চড়া হারে সুদ পাওয়া যায়। অল্প দিনের মধ্যে সরস্বতী অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। সরস্বতীকে সে কাগজপত্র এনে দেখাল। ইন্দিরা বলল, তাদের অফিসে অনেকেই ঐ স্কীমে টাকা রেখে অনেক টাকার মালিক হয়েছে।

সরস্বতী আগ্রহ দেখাচ্ছে না দেখে একদিন সে দুটি মেয়েকে নিয়ে এল হোস্টেলে। সরস্বতী তাদের কাছে শুনল যে, সত্যিই এই স্কীমে টাকা রাখা খুব লাভজনক। তারাও টাকা রাখছে। সুদে আসলে কয়েক বছরের মধ্যে টাকা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

সরস্বতী নিরস্ত্র হয়ে পড়ল। টাকা কে না চায়? আগে সে টাকার মর্ম বুঝত না। এখন সার কথা বুঝেছে—টাকার মত জিনিষ নেই। অর্থকে যারা অনর্থ বলে, তারা অর্থের যথার্থ মূল্য জানেনা। অর্থ মানুষের জীবনকে অর্থময় করে তোলে। অর্থ না থাকলেই সব কিছু অনর্থ হয়ে যায়। সরস্বতী আজকাল নিরাপত্তার কথা ভাবে। এক সর্বগ্রাসী দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। যেদিন সে অর্থোপার্জন করতে অপারগ হবে, সেদিন কি হবে তার?

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত সরস্বতী রাজী হলো স্কীমে টাকা রাখতে। অল্প সময়ে অনেক টাকা করার যে সুযোগ অযাচিতভাবে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, তাকে সে হাতছাড়া করবে না।

ইন্দিরা তাকে পরামর্শ দিল গয়না বিক্রি করার। তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারল না সরস্বতী।

—গয়না দিয়ে তুমি কি করবে, সরস্বতীদি? কোথায় যাচ্ছ গয়না পরে? তার চেয়ে ওগুলি বিক্রি করে সেই টাকাটা স্কীমে রাখলে সুদে আসলে অনেকগুণ বেড়ে যাবে। ইচ্ছা করলে সুদটা তুমি মাসে মাসে নিতে পার। তবে আমার মনে হয়, না নিলেই ভাল করবে তুমি। লাভ তাতে অনেক বেশি। আর তোমার যখন চলে যাচ্ছে—তখন মাসে মাসে টাকা নেওয়ার দরকার কি?

সরস্বতী খালি সোনার দু'গাছা চুড়ি আগেই বিক্রি করেছিল। এখন ইন্দিরার হাতে সে তার বাকি গয়না—তার কানের দুল, গলার হার, আংটি ও বাকি চার গাছা চুড়ি সমর্পণ করল। ইন্দিরার কথামত 'ইমিটেশন' গয়না কিনে এনেছিল। সেগুলি পরার সময় একটু খারাপ লাগল। কিন্তু নিজেকে সে বোঝাল। সময়ের সাথে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে, মানিয়ে না চললে চলবে কেন?

সরস্বতী প্রথমে শুনেছিল, নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জন্য যে ফ্ল্যাটটা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য বেশি টাকা দিতে হবে না। ইন্দিরা তাকে যে পরিমাণ টাকার কথা বলেছিল, তা দেওয়া তার পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সেই পরিমাণ বেড়েই চলল।

ইন্দিরা নিজেও বিরক্তি প্রকাশ করল তার কাছে।

—দেখ, আমি যদি জানতাম এত দিতে হবে, তাহলে কি তোমাকে বলি ফ্ল্যাটটা

নিতে? কিন্তু শুনেছি, যে জমিতে ফ্ল্যাটটা হয়েছে তার ডেভেলাপমেণ্ট বাবত অনেক খরচ পড়ে যাচ্ছে। আর ওরা যা খরচ ধরেছিল, তার থেকে অনেক বেশিই লাগবে। জিনিষপত্রের দাম তো বাড়ছে বই কমছে না? লেবারের খরচও বেড়ে গেছে সাংঘাতিক রকম। তবে জান, সরস্বতীদি, শুনলাম, ফ্ল্যাটটা নাকি ওরা যা ভেবেছিল, তার থেকে অনেক ভাল করে বানাচ্ছে। আমার নিজেরই লজ্জা করছে। বেসরকারী ফ্ল্যাট নিলে অবশ্য তোমাকে অনেক বেশিই দিতে হোত। সেটাই যা সান্ত্বনা!

সরস্বতী আজকাল উত্যক্ত বোধ করে। দু'এক মাস পরে পরেই ফ্ল্যাটের জন্য টাকা চায় ইন্দিরা। সরস্বতী বিরক্ত হয়। কি করে যোগাবে অত টাকা? তার আর সাধ্য নেই। এর মধ্যে ইন্দিরার পরামর্শে ছোড়দার কাছে, এমনকি অমলাদির কাছেও, টাকা ধার করেছে। ছোড়দা শোনামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা বার করে দিয়েছে। বলেছে, তাকে শোধ দিতে হবে না। কিন্তু অমলাদির টাকা তো শোধ দিতে হবে?

সরস্বতী হেস্তনেস্ত করতে চাইল। স্পষ্ট ভাষায় নিজের অক্ষমতা জানাল।

—শোন, ইন্দিরা, অনেক হয়েছে। আর পারছি না। সমানে এভাবে দু'হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকা কি করে দিই, বল? আমার কি টাকার গাছ আছে? তুই তো সবই জানিস। যা কোনদিন করিনি, তাও করেছি এই ফ্ল্যাটের জন্য। টাকা ধার করেছি। এবার তুই ক্ষ্যামা দে। দরকার নেই আমার ফ্ল্যাট। তুই নিয়ে নে ওটা। আমি যে টাকা দিয়েছি, শুধু সেই টাকা তুই আমায় ফিরিয়ে দে। তাহলেই হবে।

—বলছ কি তুমি, সরস্বতীদি? এতদিন ধরে টাকা গুণে এখন পিছু হটবে? তীরে এসে তরী ডুববে? আর কয়েকটা দিন কষ্ট কর। পরে যখন সুন্দর ফ্ল্যাটটা পাবে, তখন এই কষ্টের কথা আর মনে থাকবে না। কতজন এই ফ্ল্যাটের জন্য মুখিয়ে আছে, জান? শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া করবে সেটা?

সরস্বতী নরম হয় না।

—বললাম যে, ফ্ল্যাট আমার চাই না? রাক্ষসের হাঁ বুজানো আমার সাধ্যে নেই। চার বছর ধরে সমানে টাকা দিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকবারই তুই বলছিস, আর বেশি দিতে হবে না। পরে নতুন কোন কারণ দেখিয়ে আবার টাকা চাইছিস। তোকে সত্যি কথা বলছি, ইন্দিরা—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে ভাঁওতা দিচ্ছিস না তো?

—মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি করছি—যদি আমি তোমাকে ঠকাই, তাহলে আমার যেন সর্বনাশ হয়। বুঝলে সরস্বতীদি, লোকের উপকার না করাই ভাল। কেউ তার দাম দেয় না। বরং তার জন্য অপবাদের ভাগী হতে হয়, দুর্নামের ভাগী হতে হয়।

সরস্বতী অবিচলিত। আজকাল ইন্দিরার অনেক কিছু তার কাছে মেকী মনে হয়, লোক দেখানো মনে হয়। ইন্দিরার সান্নিধ্য বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। শুধু

টাকার মায়াতেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না সরস্বতী। তার সর্বস্ব গেছে। যত রাগই হোক, তাকে ধৈর্য বজায় রাখতে হবে। নাহলে সমূহ ক্ষতি।

—শোন, ইন্দিরা, আমার এখন সত্যিই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তুই ওটা জোগাড় করে দে। পরে আমি তোকে শোধ করে দেব।

ইন্দিরা রাজী হয়ে গেল।

—ঠিক আছে, সরস্বতীদি। আমি এই টাকাটা জোগাড় করব। তুমি পরে দিয়ে দিও।

সরস্বতী আজকাল প্রায়ই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পীড়িত হয়। ইন্দিরার সম্পর্কে সুনিশ্চিত রায় দিতে পারে না। কখনও তার মনে হয়, সে অকারণে সন্দেহ করছে। ইন্দিরার নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তির যথার্থ মূল্যায়ন করছে না।

কখনও অন্য কথা মনে হয়। সরস্বতী ভাবে, ইন্দিরা অত্যন্ত চতুর, কৌশলী ও ধাপ্পাবাজ। সরস্বতীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সে তাকে ফাঁদে ফেলেছে। তার টাকাপয়সা, গয়নাগাটি, আত্মসাৎ করে তাকে পথের ভিখারী করেছে। সরস্বতী এখন কি করে? তার মনে হয়, বাড়ির লোকে যদি তার পাশে দাঁড়াত, তাহলে কি এমনভাবে ঠকাতে পারত বাইরের লোকে?

পরপর দুটি ঘটনায় ইন্দিরার সততা সম্পর্কে সরস্বতীর মনে সন্দেহ জাগল। অনেক আগেই ইন্দিরা সম্পর্কে সে মানসিক অসুবিধা ভোগ করছিল। ঘটনা দুটি আরও বেশি করে নাড়া দিয়ে গেল তাকে।

টিউশানি থেকে ফিরে বাথরুমে গিয়েছিল সরস্বতী। এক বাড়িতে মাইনের দুশো টাকা পেয়েছিল। ব্যাগটি ট্রাঙ্কে রেখে দেওয়ার কথা খেয়াল ছিলনা তার। বাথরুম থেকে ফিরে এসে বিছানার উপর ব্যাগ দেখে সেকথা মনে হোল। ব্যাগটি খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল সরস্বতী। ব্যাগ থেকে অদৃশ্য হয়েছে দুশো টাকা। ঘরে ইন্দিরা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

ইন্দিরা শুনে তাড়িঘড়ি রায় দিল।

—বোঝাই যাচ্ছে, বাসের থেকে কেউ টাকাটা তুলে নিয়েছে। দিনকাল যা পড়েছে! নির্ঘাৎ মেয়ে পকেটমারের কাজ।

আইনে 'সন্দেহের অবকাশ' বলে একটা কথা আছে। টাকাটা যে ইন্দিরা নিয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই। বাসেও টাকাটা খোয়া যেতে পারে। তার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভদ্রঘরের মেয়ের সম্পর্কে এরকম একটা সাংঘাতিক কথা ভাবলেও খারাপ লাগে। তবু সরস্বতী সন্দেহমুক্ত হতে পারল না। তার মনে একটা কাঁটা বিঁধে গেল। মাঝেমাঝেই সেটা খচখচ করে তাকে জ্বালায়।

আরেকটি ঘটনা অন্য ধরনের। কিন্তু ইন্দিরার সম্পর্কে তার ধারণা অনেকটা প্রভাবিত হোল তার দ্বারা। ইন্দিরার কাছে একটা চিঠি এসেছিল। সরস্বতীর সামনে জোরে জোরে চিঠিটা পড়তে থাকে ইন্দিরা। চিঠিটা তার এক বন্ধুর মায়ের কাছে থেকে এসেছে। তার মূল বক্তব্য, ইন্দিরার মত পরোপকারী,

অমায়িক মেয়ে আর দ্বিতীয়টি দেখেননি তিনি। ইন্দিরা তার মেয়ের জন্য এক সময়ে কত স্বার্থত্যাগ করেছে, তাকে কিভাবে সাহায্য করেছে, তা তিনি জানেন। ইন্দিরাকে তার এখন একটু দরকার। সে যেন অতি অবশ্য সামনের শনিবার তাদের বাড়ি চলে আসে।

সরস্বতীর সন্দেহ হোল। চিঠিটা ডাকে এসেছে? তার সন্দেহ অবশ্য অমূলক প্রমাণিত হোল। চিঠিতে পোষ্টাফিসের ছাপ মারা। ইন্দিরার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরস্বতীর মন থেকে সব সন্দেহ নির্মূল করতে চেয়েছে সে।

রান্না চাপিয়ে এসেছিল ইন্দিরা। হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে রান্নাঘরে চলে গেল। সরস্বতী ভাবল, ইন্দিরাকে না জানিয়ে তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ভালভাবে খোঁজখবর নেবে সে ইন্দিরার সম্পর্কে। সম্প্রতি অনেক রকম কথা কানে আসছে। একদিন অমলাদির কাছেও নিয়ে গিয়েছিল ইন্দিরাকে। অমলাদি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটাকে তার সুবিধের মনে হচ্ছে না। ওর হাতে যখন তখন ঐভাবে যেন সে টাকা না দেয়।

সরস্বতী আরও শুনল যে, স্বদেশ বসুও নাকি ইন্দিরার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার ধারণা, ইন্দিরা ঠগ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। সরস্বতীকে ধাপ্পা দিয়ে তার টাকা পয়সা গ্রাস করছে।

সরস্বতী ঠিকানাটা দেখে নিল। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানাটা লেখা আছে দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করল। একটা কাগজে টুকে নিল সেটা। পরে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল। ইন্দিরা তাকে যা পড়ে শুনিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠিতে লেখা বক্তব্যের কোন মিল নেই। এমন যে হতে পারে, তা অভাবিত, কল্পনাতীত। এমন মিথ্যাচারও সম্ভব, ভদ্রঘরের একটি মেয়ের পক্ষে?

সরস্বতীর মনে হোল, তার সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলছে। অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি আর মিথ্যাচারে পৃথিবীর নাভিশ্বাস উঠছে!

ইন্দিরা ফিরে আসল একটু পরেই। ইচ্ছা করেই তাকে কিছু বলল না সরস্বতী। মনে মনে তার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেল ইন্দিরা। সরস্বতী বুঝতে পারল, ইন্দিরাকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি এতদিন। তার সব কথা বিশ্বাস করে ঠিক কাজ করেনি। লোকচরিত্র সম্বন্ধে তার এখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়নি।

॥ সতের ॥

হোস্টেলের পরিবেশ ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত সুপার ভদ্রমহিলার স্বামীটি নাছোড়বান্দার মত পিছনে লেগেছে তার।

প্রথম থেকেই সরস্বতীর দিকে তার নজর। সরস্বতী স্নান করে এলে তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারিফ করে—'বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো আপনাকে?

বলাবাহুল্য, তার দৃষ্টিটা খুব নির্দোষ থাকে না।

কখনও বা সরস্বতী হাত দেখতে পারে শুনে তার সামনে মেলে দেয় নিজের হাত।

—দেখুন তো, আমার ভাগ্যে কি আছে?

নিয়মরক্ষামত দু'একটি কথা বলে পার পায় না সরস্বতী। সরস্বতীর হাত টেনে নিয়ে অনুরোধ জানায়, আরও খুঁটিয়ে ভালভাবে দেখুক সে তার হাত। লোকটির ভাবভঙ্গী ভাল ঠেকে না সরস্বতীর। তার সান্নিধ্যে অশ্লীল এক অনুভূতি হয়। তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করে সরস্বতী। কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। ছিনে জোঁকের মত পেছনে লেগে থাকে লোকটি।

ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে পড়েছে। কিন্তু কিছু করার নেই। স্বয়ং সুপার ভদ্রমহিলা পর্যন্ত বুঝেও না বোঝার ভান করেন। স্বামীর ব্যাপারে অত্যন্ত প্রশ্রয়শীল তিনি। সরস্বতীর কাছে রহস্যময় মনে হয় সবকিছু।

অনেক সময় তিনি নিজে ডেকে পাঠান সরস্বতীকে। পরে স্বামীর কাছে সরস্বতীকে রেখে কোন অজুহাতে স্থানত্যাগ করেন।

প্রথম দিকে এসব খুঁটিয়ে দেখেনি সরস্বতী। সে ভেবেছে, ভদ্রমহিলা নির্বোধ। স্বামীর মতিগতির খবর রাখেন না। অগাধ আস্থা তার স্বামীর উপরে। পরে ইন্দিরার কাছে, শমিতার কাছে, ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যা শুনল, তাতে সে তাজ্জব হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলার নাকি এটি দ্বিতীয় বিয়ে। অভিনয় করতেন আগে ভদ্রমহিলা। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রেম হয় ও দুজনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হোস্টেল বাড়িটি ভদ্রমহিলার প্রথম স্বামীর। ভদ্রমহিলা প্রেমমুগ্ধ স্বামীকে দিয়ে বাড়িটি নিজের নামে লিখিয়ে নেন।

পরে যে দলে অভিনয় করতেন, সেই দলের ম্যানেজারের সঙ্গে প্রেম জমে ওঠে এবং দুজনে মিলে ভদ্রমহিলার প্রথম স্বামীকে বাড়িছাড়া করেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, লম্পট। মেয়েঘটিত বহু দুর্নাম আছে তার। তবু ভদ্রমহিলা এর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন ও ভালমানুষ স্বামীটিকে বিতাড়িত করেছেন এরই প্ররোচনায়। অতঃপর একে বিবাহ করেছেন এবং এই ভদ্রলোক এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। কার্যতঃ ভদ্রমহিলার ওপরেও ডাণ্ডা ঘোরাতে সুরু করেছেন।

ভদ্রলোকের গুণের ঘাট নেই। মদ খেয়ে মাতলামি, স্ত্রীকে ধরে ঠেঙ্গানো, ইত্যাদি তো আছেই, তার সঙ্গে শাসন, তর্জনগর্জন সবই চলে একাদিক্রমে। ভদ্রমহিলা অসম্ভব ভয় করে চলেন তার দ্বিতীয় পতিদেবতাটিকে। সব শুনে সরস্বতীর কাছে পুরো ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা স্বামীর মতিগতি

সহ্য করেন ভয়ে, মারের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে।

অনেক সময়েই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সরস্বতী। সুপারের স্বামী ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সরস্বতী তাকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে রীতিমত নাজেহাল করতে সুরু করেছে ইদানীং।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা এরকম পর্যায়ে ছিল না। এখন লোকটি যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাকে কিভাবে অপদস্ত করবে, বেইজ্জত করবে, সেই চেষ্টা। টিউশানি করে ফিরতে দেরি হলে রীতিমত শাসায় তাকে। বলে, হোস্টেলে এত দেরি করে ফেরা চলবে না। সে যেন অন্য হোস্টেল দেখে নেয়। এই হোস্টেলে থাকতে হলে তাকে নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিরুপায় হয়ে সরস্বতী সহ্য করে যাচ্ছিল এসব উৎপাত দিনের পর দিন। কিন্তু একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল। বিকালে টিউশানির বাড়িতে গিয়ে সরস্বতী শোনে, ছাত্রীর অসুখ হয়েছে। সে পড়তে পারবে না। কাছেই অমলাদির বাড়ি। সরস্বতীর ইচ্ছা হোল, অমলাদির খোঁজখবর নিয়ে আসে।

অমলাদির বাড়ি এসে পৌঁছবার একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি যখন থামল, তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। অমলাদি সরস্বতীকে বাড়ি যেতে দিলেন না। সুপারের স্বামীর শাসানির কথা শুনিয়েও লাভ হোল না। অমলাদি নির্বিকার।

—থাম তো। ঐ বদমাইশটার ভয়ে তুই কেঁচো হয়ে থাকবি নাকি? যে বৃষ্টি হয়েছে—মনে হয় না, বাস ট্রাম ঠিকমত চলবে। শেষে মাঝরাস্তায় তুই ঠিক বিপদে পড়বি, বলে দিচ্ছি।

পরদিন হোস্টেলে ফেরামাত্র, সরস্বতীর ওপরে এক হাত নিল সুপারের স্বামী। সুপারও তাকে সমর্থন করল। সরস্বতীর সহ্য হোল না। চালুনি বলবে সুচকে? যাদের নিজেদের চরিত্রের ঠিক নেই, তারা অপরের চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করে কোন লজ্জায়?

সরস্বতী সতেজে জবাব দিল।

—আপনারা আমার অভিভাবক নন। আমি কাল কেন ফিরতে পারিনি, তার জন্য আপনাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেব না। আপনাদের যা খুশি, করতে পারেন।

সুপারের স্বামী যেন মুখিয়েই ছিল।

—আপনি অন্য হোস্টেল দেখে নিন। এখানে আপনার থাকা চলবে না।

অপ্রয়োজন বোধে কোন জবাব দিল না সরস্বতী। গটগট করে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। রাগের পারা নেমে গেলে, তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কোথায় খুঁজবে এখন নতুন হোস্টেল? সাময়িকভাবে কয়েক দিনের জন্য গিয়ে ওঠা যায় অমলাদির বাড়ি। কিন্তু, তারপর? তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেশিদিন অপরের আশ্রয়ে থাকা যায় না। দু'চারদিন সকলেই অতিথির সমাদর করে। কিন্তু আশ্রিত পরমুখাপেক্ষী সকলেরই চক্ষুশূল হয়ে ওঠে পরে।

এখানকার পালা তার শেষ হয়েছে। আবার তাকে নতুন আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। জন্মলগ্নে যে দুষ্ট রাহুটার কোপদৃষ্টি ছিল, সে তাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। সুপারের স্বামী নিমিত্ত মাত্র। কার ওপরে রাগ করবে সরস্বতী? কিন্তু আর কতবার তাকে এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ঘুরতে হবে?

সরস্বতী বড় ক্লান্ত! ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোকেও আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। সরস্বতী ইন্দিরাকেই ধরল।

—আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দে, ইন্দিরা। হোস্টেলে আর নয়। একটা যেমন তেমন ঘর পেলেই চলবে।

ইন্দিরাকে চিন্তিত দেখাল।

—আর সময় খুঁজে পেলে না, সরস্বতীদি? সামনের সোমবার যে আমার বিয়ে। আমি এখন কি করি, বলত?

সরস্বতী আকাশ থেকে পড়ল।

—সে কি রে? তোর বিয়ে? আমাকে তো বলিসনি?

—ভেবেছিলাম, একেবারে শেষ মুহূর্তে জানাব। তোমাকে চমকে দেব।

—বাড়িতে মেনে নিয়েছে?

—আমাদের বাড়িতে যে মেনে নেবে না, তা তো তুমি জানই। ওদের বাড়িতে আপত্তি নেই। আমরা রেজিস্ট্রি করছি। ছোটমত পার্টি দেওয়া হবে। তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে। আর কেউ না আসুক, তোমার আসা চাই।

সরস্বতী তার অক্ষমতা জানাল।

—আমি যেতে পারব না। আমাকে তুই ক্ষমা করিস। বিয়েবাড়িতে যেতে আমার ভাল লাগে না।

ইন্দিরা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে তার ট্রাঙ্ক থেকে একটা নতুন সোনার আংটি বার করে সরস্বতীর হাতে দিল।

—সরস্বতীদি, এটা তুমি রেখে দাও। বিয়ের দিন নিয়ে যেও। সকলের সামনে আমাকে ওটা উপহার দিও। আমার ভাল লাগবে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সরস্বতী ইন্দিরার দিকে। ইন্দিরাকে কি সে চিনতে পারেনি ঠিকমত? সরস্বতীকে তাহলে সত্যিই এত ভালবাসে ইন্দিরা? তবে কি ফ্ল্যাট নিয়ে, স্কীম নিয়ে যা ভেবেছে সে ইন্দিরার সম্পর্কে, তা ঠিক নয়? হিসাবে কি গোলমাল হয়েছে তাহলে? ইন্দিরা যা বলছে, তাও মিথ্যাচার বৈ কি! তবু এই মিথ্যাচারের মধ্যে তার প্রাণের টানটা যেন ধরা পড়ছে।

ইন্দিরার কাছে কিন্তু তার ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। তাকে আংটিটা ফিরিয়ে দিল সরস্বতী। আবার তার অক্ষমতার কথা অকপটে ব্যক্ত করল।

—তুই তো জানিস, এসব আমি পছন্দ করি না। আমার তোকে আংটি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। লোক দেখিয়ে আমি তা দিতে যাব কেন? তোর জিনিষ নিয়ে তোকে দেব, লোককে দেখাবার জন্য? এসব তুই পারিস। আমি পারি না।

ইন্দিরা আহত হোল।

—তুমি খুব নিষ্ঠুর, সরস্বতীদি। মানুষের মনের দিকে তাকাও না। তোমাকে কিছু দিতে হবে না। তবু তুমি এসো। না আসলে, খুব রাগ করব।

সরস্বতী সে কথার জবাব দিল না। চিন্তিতভাবে ইন্দিরাকে আবার তার অনুরোধ জানাল।

—শোন, ইন্দিরা, যা বলেছি, মনে রাখিস। একটা বাড়ি না পেলে চলবে না আমার। তার জন্য তোর বিয়ে আটকাবে না। কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

ইন্দিরা তাকে আশ্বস্ত করল নির্দ্বিধায়।

—আমি খুঁজব, সরস্বতীদি। তুমি ভেবোনা।

সরস্বতী ভেবেছিল, অতঃপর মুশকিল হবে তার হোস্টেলে টিঁকে থাকা। সুপারের স্বামী ভদ্রলোকটি তাকে জেরবার করে ছাড়বে। সরস্বতী তেজ দেখিয়েছে। তা কখনই হজম করবে না ঐ লোক। উঠতে বসতে তাকে কটূক্তি শুনতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ কোন মন্ত্রবলে পালটে গেল পরিস্থিতি। সুপার বা তার স্বামী কোন রকম দুর্ব্যবহার করল না তার সঙ্গে। সরস্বতীর ভয় অনেকটা দূর হোল। সে মত পালটে ফেলল। নতুন বাড়িতে আর যাবে না। সে যে আশংকা করেছিল, তা যদি ঠিক না হয়, তাহলে মিছিমিছি কাঠখড় পোড়ানো কেন?

বিয়ের দু'দিন আগে হোস্টেল ছেড়ে দিল ইন্দিরা। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি থাকবে এই দু'দিন। যাবার সময় সরস্বতীকে আবার সে তার অনুরোধ জানিয়ে গেল।

—তুমি এসো, সরস্বতীদি, আমার বিয়েতে। ঐদিন ছুটি পড়েছে। আর তোমার জন্য একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছি। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

কি মনে করে আপত্তি জানাল না সরস্বতী। তার কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই। কে জানে, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে থমথমে হয়ে ওঠা আবহাওয়া কি না? সে হয়ত তার পূর্বাভাস পাচ্ছে না।

ইন্দিরা হোস্টেলের কয়েকজনকে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল। সরস্বতী তাদের সঙ্গে গেল না। খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল সে। একটু আগে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ পেল সরস্বতী। তার রুমমেটরা এত তাড়াতাড়ি বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে আসতে পারে না। সরস্বতী খাট থেকে নেমে দরজার কাছে চলে আসে। প্রশ্ন করে—'কে'?

কোন জবাব এল না। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সরস্বতী। তাকে একা পাবে জেনে লম্পটটা সুযোগ নিতে আসেনি তো? আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ হোল। এবার অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে।

আবার প্রশ্ন করল সরস্বতী।

—কে ?

দরজার করাঘাত বন্ধ হোল। কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ। নিঃসন্দেহ হোল সরস্বতী। সুপারের স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। সম্ভবতঃ হোস্টেলে আজ লোকজন কম। কে জানে, সুপারও হয়ত হোস্টেলে নেই। সরস্বতীকে উত্যক্ত করতে এসেছে লম্পটটা সেই সুযোগে।

দরজা খুলল না সরস্বতী। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে দরজার কাছে। ভয়ে, উত্তেজনায়, বুকের মধ্যে তার হাতুড়ি পেটার আওয়াজ হতে লাগল। যদি কোনভাবে দরজা ভেঙ্গে যায় ?

তার রুমমেটরা কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল। সেদিনের মত বিপদ কেটে গেল। কিন্তু সরস্বতী বুঝতে পারল, তার এখানে সমূহ বিপদ। যেকোন অসতর্ক মুহূর্তে গুরুতর কিছু ঘটতে পারে। সরস্বতী মনস্থির করে ফেলল, এখানে থাকা যাবে না। আপাততঃ অমলাদির বাড়ি গিয়ে উঠবে সে। অমলাদি সব জানেন। তিনি তার অসহায় অবস্থার কথা বুঝবেন। তার বাড়িতে বাড়তি ঘর আছে। কয়েকটা দিন যদি সে থেকে যায়, তিনি কিছু মনে করবেন না।

বাড়ির লোকেদের কাছে সে যাবে না। তাদের ব্যবহার সরস্বতী এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে কি করে? একমাত্র যাওয়া চলে ছোড়দার কাছে। কিন্তু সে ব্যস্ত মানুষ। তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে মন চায় না সরস্বতীর! সবচেয়ে বড় কথা, তার আলাদা কোন বাড়ি নেই। থাকলে, সব কিছু সত্ত্বেও, সরস্বতী সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হোত।

একমাত্র ছোড়দাই তার জন্য ভাবে। আর আইন পড়ার খরচ জুগিয়েছিল ছোড়দাই। দেবাশিসের সঙ্গে যখন তার গোলমাল চলছিল, তখন ছোড়দাই তাকে সমানে হাতখরচ জুগিয়েছে। ফ্ল্যাটের জন্যও খেপে খেপে কয়েকবার টাকা দিয়েছে সে সরস্বতীকে।

ছোড়দা যাদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে, সেই লোকগুলি হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, নির্মম। বাড়ির দুর্ভাগা মেয়েটির জন্য তারা দিনান্তে একবারও ভাবে না। সরস্বতীর জন্য তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাদের জীবনে সরস্বতীর অস্তিত্বের কোন স্বীকৃতি নেই।

অমলাদির বাড়িতে আসার পাঁচ ছয় দিন পর, একদিন হঠাৎ ইন্দিরা এসে হাজির সেখানে। সরস্বতী অবাক হোল। সুপারকে সে অমলাদির বাড়ির ঠিকানা দিয়ে আসেনি। ইন্দিরা কি করে জানল, সে এখানে এসেছে ?

ইন্দিরা তার সংশয় দূর করল।

—হোস্টেলে গিয়ে শুনি, তুমি হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছ। ওরা আমাকে কোন ঠিকানা দিতে পারল না। তখন ভাবলাম, যদি তুমি বাড়ি খুঁজে না পেয়ে থাক, তাহলে অমলাদির বাড়ি আসতে পার। তোমার নিজের বাড়িতে যে তুমি যাবে না, তা আমি জানি। দেখ, আমার অনুমান কেমন ঠিক। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে

আমার অভিযোগ আছে, সরস্বতীদি। আমার বিয়েতে গেলে না কেন তুমি ?

কাঠকাঠ নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল সরস্বতী।

—তোকে তো আগেই বলেছি, বিয়েবাড়ি যেতে ভাল লাগে না আমার। কাজের কথা বল। আমার জন্য বাড়ি খোঁজার কি হোল ?

—যাদবপুরে বাড়ি একটা খুঁজে পেয়েছি, সরস্বতীদি। তবে, তুমি কি সেখানে থাকতে পারবে ? ছোট খুপরির মতন ঘর, অ্যাসবেস্টসের ছাদ। বাথরুম, পাইখানা এজমালি। আজকাল বাড়িভাড়া এত বেড়ে গেছে যে, কি বলব ? সস্তায় এর চেয়ে ভাল বাড়ি তুমি পাবে না।

সরস্বতী অভিভূত হোল। ইন্দিরার সম্পর্কে হিসেবে কেবলি গরমিল হয়ে যায়। বেশিদিন বিয়ে হয়নি। তবু তার জন্য সময় করে বাড়ি খুঁজেছে। তার খোঁজখবর নিতে এসেছে। ইন্দিরার কথাই হয়ত ঠিক। অযাচিতভাবে উপকারী মানুষকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। সে হয়ত সত্যিই ঠগ নয়, প্রতারক নয়। তা যদি হোত, তাহলে এভাবে উপযাচক হয়ে তার খোঁজখবর নিত না।

ইন্দিরা তাকে বাড়ি দেখে আসার কথা বললে, সে অসম্মতি জানাল।

—তুই দেখেছিস তো ? তাহলেই হবে। আর, দেখে কি করব ? আমার সাধ্য কই, ভাল বাড়িতে থাকার ? যে কপাল নিয়ে জন্মেছি, ভাল কিছু আশা করি না।

ইন্দিরা ছলছল চোখে সান্ত্বনা দিল।

—দেখ, আর খারাপ থাকবে না কপাল। তোমার ভোগ কেটে যাচ্ছে। শিগগিরই ভাল ফ্ল্যাট হবে। সকীমের দরুন অনেক টাকা হবে। তখন আর কাকে পরোয়া করবে তুমি ? আমি আর দেরি করব না, সরস্বতীদি। নতুন শ্বশুরবাড়ি। বোঝই তো !

অমলাদি সব শুনে উৎসাহ প্রকাশ করলেন না।

—ঘরটা দেখে এলে ভাল করতিস। ঐ মেয়ে আবার কোন মতলব হাসিল করতে চায়, কে জানে ? আমার বাপু একেবারেই সুবিধের লাগে না ওকে।

সরস্বতী আশ্বস্ত করল অমলাদিকে।

—না, না, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমি ওকে অনেক করে বলেছিলাম। অকারণ দুশ্চিন্তা করো না।

অমলাদি নির্বিকার।

—দুশ্চিন্তা আমার অকারণে নয়, সরস্বতী। এই কয় বছর ধরে ফ্ল্যাটের নাম করে, সকীমের নাম করে, কম টাকা তো হাতায়নি ওই মেয়ে তোর কাছে ? তুই এবার কাগজপত্র দেখ। দলিল দেখ। অন্ধের মত চলিস না, আমার মনে হচ্ছে, আবার তোর কাছে টাকা চাইবে ও। আর বোকামি করিস না। তুই সহজে টাকা বের করবি না। বলবি, 'অনেকদিন তো হয়ে গেল। এবার আমাকে কাগজপত্র দেখাও।'

নতুন বাড়িতে এসে সত্যিই হতাশ হোল সরস্বতী। তার বাপের বাড়িতে দাসদাসী, মালিরাও, এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকত। ঘর না বলে খুপরি বলাই যথার্থ হবে। একটিমাত্র জানলা নামধারী ফোকর রয়েছে ঘরে। এবড়ো খেবড়ো মেঝে,

ছোট একফালি বারান্দায় রান্নার জায়গা। এজমালি কলতলা ও পায়খানা বেশ খানিকটা দূরে। বারো ঘর, এক উঠোনের কথা মনে এল সরস্বতীর।

প্রতিবেশী হিসাবে যারা রয়েছে, তাদের কেউ দর্জি, কেউ হোটেলের রাঁধুনী, আবার কেউবা দোকানদার। প্রত্যেকেই একটি করে ঘর নিয়ে রয়েছে।

সরস্বতীর মত পরিবার থেকে কেউ আসেনি। তাদের শিক্ষার মানও বৈষম্য।

ঐশ্বর্যের মত দারিদ্র্যের বুলডোজার সমান করে দেয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। কয়েকদিনের মধ্যেই তার প্রাথমিক অস্বস্তি, বিতৃষ্ণা আর বিরাগ কাটিয়ে উঠল সরস্বতী। অভ্যস্ত হয়ে গেল এই নতুন জীবনে। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে উঠত তার মন। আবার জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে, জীবনধারণের স্বাভাবিক তাগিদে, নিজেকে মানিয়ে নিতে হোল নতুন জীবনের সঙ্গে।

এখানে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল তার মায়ার সঙ্গে। কাছেই বাড়ি করেছে সে। স্বামী কন্যা নিয়ে সুখী, সচ্ছল সংসার তার। মায়াকে দেখে পুরনো দিনের স্মৃতি ভিড় করে এল সরস্বতীর মনে। অজ্ঞানতেই মনে আসে একটি তুলনা। মায়া ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। আজ সে বিধিনির্বন্ধে সুখের মুখ দেখেছে, সচ্ছলতার স্বাদ পেয়েছে। রাজকন্যা সরস্বতী এখন পরিণত হয়েছে ঘুঁটেকুড়ুনীতে।

তবু মায়ার সান্নিধ্য ভাল লাগে। মায়ার মত বন্ধুবৎসল মানুষ সত্যিই দুর্লভ। একদিন তার জন্য কম করেনি মায়া। আর এখন বর্তমানের দুর্বহ বোঝাও সে কিছুটা লাঘব করতে পারবে বৈকি মায়ার সান্নিধ্যে।

ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ী থেকে মাঝে মাঝে আসে। তার সঙ্গে দেখা করে যায়। সরস্বতী শুনল, তাদের ফ্ল্যাট তৈরি প্রায় শেষ। বহুবার সরস্বতী ফ্ল্যাটটা দেখে আসতে চেয়েছে। ইন্দিরা রাজী হয়নি। সে বলেছে, 'আমি চাইছি, তুমি একেবারে তৈরি ফ্ল্যাটে, ঝকঝকে ছিমছাম ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হবে। চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে তুমি চমকে যাবে।' মন্ত্রমুগ্ধ সরস্বতী মেনে নিয়েছে তার কথা।

কিন্তু এবার সে দৃঢ়সঙ্কল্প। তার ফ্ল্যাটটি দেখবে। ইন্দিরা যথারীতি আপত্তি জানিয়ে, পরে তার দাবি মেনে নিল। কিন্তু একটি শর্ত আরোপ করল সেইসঙ্গে।

—আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে, সরস্বতীদি। ছোট বোনের সামান্য একটা অনুরোধ তুমি নিশ্চয় ফেলবে না। বাইরে থেকে দেখবে তুমি। ভেতরে ঢুকবে না। আমার কি ইচ্ছা, তা তো তুমি জান। তৈরি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তোমায় হাজির করব। এতদিন এত কষ্ট করলে। আমি তোমাকে দেখাতে চাই, তোমার জন্য আমি কি করেছি। দেখাতে চাই, শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য সুন্দর একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

সরস্বতী মেনে নিল তার প্রস্তাব। ইন্দিরা তাকে সঙ্গে করে একদিন ফ্ল্যাটবাড়ি দেখিয়ে নিয়ে এল। সরস্বতী মোহিত হোল দেখে। সত্যিই, বাড়ির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। অকারণে সে সন্দেহ পোষণ করেছিল। ইন্দিরা তার সত্যিই

পরম উপকারী বন্ধু।

কয়েক দিন পর, ইন্দিরা আবার আট হাজার টাকা চাইল। সরস্বতী বিরক্ত হোল।

—সে কি? আগের বার শুনলাম, আর বেশি টাকা দিতে হবে না। বড় জোর হাজার খানিক, কি হাজার দুয়েক, হয়ত দিতে হতে পারে। আবার এত টাকা দিতে হবে? আমি কোথায় পাব? সব সম্বল তো নিঃশেষ। আমাকে একেবারে ফতুর করে দিয়েছিস তুই।

ইন্দিরা অভিমান করে।

—বুঝলে, সরস্বতীদি, তোমার এসব কথা শুনলে কি মনে হয়, জান? মনে হয়, ফ্ল্যাটটা নিজে নিয়ে নিই। তুমি যে টাকা দিয়েছ, সেটা তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দিই।

গম্ভীর থেকে রসিকতা করল সরস্বতী।

—তাই কর। আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দে। তোর সাধের ফ্ল্যাট নিয়ে তুই থাক। আমার আর কাজ নেই ওতে। কিন্তু আর আমি এত টাকা গুণতে পারি না।

ইন্দিরাও গম্ভীর হয়ে জবাব দিল।

—তুমি জান, সেটা আমি পারব না। আমার শ্বশুরবাড়ীতে থাকার জায়গা আছে। বাপের বাড়িতেও সম্পত্তির ভাগ আছে। সেই জন্যই তোমার কথা ভেবেছি। একদিন বুঝবে, তোমার জন্য আমি কি করেছি!

সরস্বতী কাজের কথা পাড়ল।

—সে না হয় বুঝব। কিন্তু টাকাটা যোগাড় হবে কি করে? স্কীমের টাকাটা যদি এখন পেতাম, তাহলে ভাবনা ছিল না। সেটাও তো পাচ্ছি না।

ইন্দিরা অনুযোগ করল।

—পাচ্ছি না, বলো না। যথাসময়ে পাবে। অনেক গুণ বেশি পাবে।

—বুঝলাম। কিন্তু, কার কাছে হাত পাতব? অমলাদির কাছে আর আমি হাত পাততে পারব না। ছোড়দার কাছে আগে কয়েকবার টাকা নিয়েছি। আবার চাইব? লজ্জা করছে।

—আর তো উপায় নেই, সরস্বতীদি। এখন শেষ মুহূর্তে আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। ছোড়দার টাকা পরে নয় শোধ করে দিও। তুমি আর দেরি না করে, আজই যোগাযোগ করো ছোড়দার সঙ্গে। আমি কাল আসব। আজ কালের মধ্যেই টাকাটা দিতে হবে।

সরস্বতী ছোড়দার কারখানায় ফোন করল। ফোন ধরল টাইপিস্ট মেয়েটি। সরস্বতীকে সে জানাল, তার ছোড়দা জরুরী কাজে দিল্লী গেছে। ফিরতে বেশ কয়েক দিন দেরি হবে।

সরস্বতী চিন্তিত হোল। এখন উপায়? সত্যিই কি তীরে এসে তরী ডুববে?

পরদিন সরস্বতীর কাছে সব শুনে ইন্দিরা দমে গেল।

—এখন উপায়, সরস্বতীদি? অল্পস্বল্প হলে ভাবতাম না। যাহোক করে জোগাড় করে দিতাম। কিন্তু এতগুলি টাকা? তুমি তোমার অন্য দাদাদের কাছে চাইতে পার না?

—খেপেছিস? ছোড়দা ছাড়া আর কারুর কাছে আমি হাত পাতিনি, আর পাতবও না। আমি ভাল করেই জানি, ওরা কেউ টাকা বের করে দেবে না।

ইন্দিরা একটুক্ষণ চিন্তা করল। পরে সরস্বতীকে দুশ্চিন্তামুক্ত করল।

—শোন, আপাততঃ আমি আমার কালেকশানের টাকা থেকে ওটা মিটিয়ে দেব। ছোড়দা ফিরে এলে, তুমি ওটা আমায় ফেরৎ দিয়ে দিও।

সরস্বতী কৃতজ্ঞ বোধ করল। ইন্দিরা এই কয়েক বছর ধরে সমানে তাকে দুঃখের দিনে, অসময়ে, সাহচর্য দিয়ে আসছে। আর কেউ এভাবে তার পাশেপাশে থাকে নি। বিয়ের পরও তার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। অথচ ইন্দিরার সম্পর্কে কত কি সন্দেহ পোষণ করেছে তারা। ইন্দিরার স্বভাবের অনেক কিছু তার পছন্দ নয়, ঠিকই। তবে, দোষে গুণে মিলিয়ে মানুষ। এই পৃথিবীতে দোষমুক্ত কে?

কয়েক দিন পরে, ইন্দিরা এসে ভেঙ্গে পড়ল।

—সর্বনাশ হয়েছে, সরস্বতীদি। অফিস জানতে পেরেছে, আমি কালেকশানের টাকা সরিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যে টাকা ফেরৎ না দিলে, আমায় 'সাসপেন্ড' করবে ওরা।

সরস্বতী অবাক হোল। ব্যাপারটার মধ্যে যে গর্হিত কোন অপরাধ আছে, তা সে জানত না। তার বিস্ময় নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করে ইন্দিরার কাছে।

—তুই জানতিস, এরকম হতে পারে?

ইন্দিরা অপ্রয়োজনবোধে, নিরুত্তর রইল। সরস্বতী বুঝতে পেরে তার অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করল।

—আমি জানতাম না, এরকম হতে পারে। জেনেশুনে এরকম করা উচিত হয়নি তোর। এখন, উপায়?

—তোমার ছোড়দা কবে কলকাতায় ফিরছেন?

—ঠিক করে তো কিছু বলেনি ওর টাইপিস্ট। দেখি, আজ একবার ফোন করে। যদি ফিরে এসে থাকে, ভালই।

সরস্বতী অপরাধবোধে পীড়িত হচ্ছিল। তার ফ্ল্যাটের জন্য অদূরদর্শিতা দেখিয়ে চাকরিটা খোয়াতে বসেছে ইন্দিরা। সরস্বতী তা হতে দেবে না। যেভাবে হোক, তার প্রতিকার করবে।

সরস্বতী ভেবেছিল, তার ছোড়দার আসতে এখনও দেরি। ফল হবে না জেনেও, খানিকটা ভাগ্য পরীক্ষার জন্যই টেলিফোন করল সে ছোড়দার অফিসে। আশ্চর্য। আগের দিনই ফিরে এসেছে ছোড়দা। সরস্বতী দ্রুত সব সমস্যার কথা জানিয়ে বলল, ছোড়দার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চায়।

সব শুনে, তার ছোড়দা গম্ভীর হয়ে গেল।

—আট হাজার কেন? তার চেয়ে বেশি টাকা লাগলেও আমি দেব। মায়ের আশীর্বাদে টাকার কোন অসুবিধে নেই আমার। প্রশ্নটা টাকার নয়। কথা হোল, সত্যি সত্যি তোর ফ্ল্যাটের জন্য ওগুলি যাচ্ছে তো? না, তোকে বোকা বানিয়ে অন্যে ওটা আত্মসাৎ করছে? তুই কাগজপত্র দেখ। ভাল করে সব বুঝে নে। তোর ইন্দিরা যা বলছে, তা যে সব সত্যি, তারই বা নিশ্চয়তা কি? সাসপেনশানের কথা টথা, সবই হয়ত মনগড়া! তুই এক কাজ কর। তোর বন্ধুকে নিয়ে আয় আমার কাছে। ওকে বল, আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই।

দিন দুয়েক পরে ইন্দিরা এলে, সরস্বতী তাকে জানাল, তার ছোড়দা টাকা দিতে অরাজী নয়। তবে, ইন্দিরার কাছে সে কয়েকটা কথা জানতে চায়।

ইন্দিরাকে দেখে ছোড়দার যে ভালো লাগেনি, তা সরস্বতী বুঝতে পারল তার মুখ দেখে। তবে ছোড়দা অভদ্রতা করল না। পাঁচ দশ মিনিট মত কথা বলল সে ইন্দিরার সঙ্গে। মূল কথা হোল, টাকা সে দেবে। তবে ফ্ল্যাট যে সরস্বতী পাবে, তেমন কোন দানপত্র দেখাতে হবে।

ছোড়দার সঙ্গে আলোচনার পর, সরস্বতী নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে, ফ্ল্যাটের আশা তাকে ছাড়তে হবে। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, এতদিন ধরে তাকে প্রতারণা করে এসেছে ইন্দিরা।

কিন্তু ইন্দিরা তাকে অবাক করে দিল কয়েক দিন পর। একটি দলিল এনে হাজির করল সে। সরস্বতী পড়ে দেখল, ইন্দিরার বয়ানে লেখা রয়েছে যে, সে তার মাসতুতো বোন সরস্বতী ঘোষালকে ফ্ল্যাটের অধিকার দানপত্র করে দিচ্ছে। দলিলটি আদালতের শীলমোহরাঙ্কিত।

সরস্বতী স্বস্তি বোধ করল। অর্থক্ষতির দুশ্চিন্তা দূর হোল। সেই সঙ্গে নিরসন ঘটল, মানুষের সম্পর্কে অবিশ্বাস আর সন্দেহেরও।

ছোড়দাকে সব জানিয়ে, তার কাছে থেকে আট হাজার টাকার চেক নিয়ে এল সরস্বতী। ইন্দিরার হাতে নির্দ্বিধায় সমর্পণ করল সেটি।

গোলমাল সুরু হোল তার পরে। ইন্দিরার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। মাসের পর মাস যায়। সরস্বতী প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু ইন্দিরার দর্শন পাওয়া যায় না। সরস্বতী কিছু বুঝে উঠতে পারল না। সব কিছু তো ঠিকই আছে বলে মনে হোল। শেষ মুহূর্তে আবার কি ঘটল? এতদিন ধরে না আসার কারণ কি?

সরস্বতীর মনে পড়ল, ইন্দিরার বাপের বাড়ির ঠিকানা তার কাছে আছে। হোস্টেলে থাকার সময়েই, একদিন ইন্দিরার কাছে তার বাপের বাড়ির ঠিকানায় লেখা একটি চিঠি রি-ডাইরেক্ট হয়ে হোস্টেলে এসেছিল। ইন্দিরার সম্পর্কে তখন সরস্বতীর মনে সন্দেহ ঢুকেছিল। ইচ্ছা করেই ঠিকানাটা লিখে রেখেছিল তাই। এতদিন সেটি কাজে লাগাবার কথা ভাবেনি। এখন ভাবল।

ইন্দিরার বাপের বাড়ি দেখে, সরস্বতী কম বিস্মিত হোল না। ইন্দিরা বলেছিল, তাদের তিনতলা বাড়ি। তার বাপের বাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছিল, বাস্তবে তার সঙ্গে

আকাশপাতাল তফাৎ দেখে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সাধারণ, ছোট একতলা বাড়ি। ততোধিক সাধারণ আসবাবপত্র। ইন্দিরার বাবার কাছে সরস্বতী তার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা পেল। সরস্বতী তার সমস্যার কথাটা সংক্ষেপে জানাতে চেয়েছিল ভদ্রলোককে। তিনি কঠিনভাবে বাধা দিলেন।

—আমাকে এসব বলে লাভ নেই। আমি কিছু জানি না।

মেয়ের সম্পর্কে ভদ্রলোকের অনীহা অত্যন্ত স্পষ্ট। সরস্বতী চমৎকৃত হোল কম না। ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ি সেখান থেকে খুব দূরে নয়। প্রায় বস্তির মত এলাকায় সেই বাড়ি। পাকা বাড়ি। তবে অস্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ প্রকট সর্বত্র।

সরস্বতীকে দেখে ইন্দিরা চমকে গেল। আমতা আমতা সুরু করল।

—তোমার কাছে আমি যেতাম। কষ্ট করে তুমি এলে কেন? আমার শরীরটা ভাল নেই। তাই—

সরস্বতী নির্বাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে, অর্থপূর্ণ হাসি হাসে সে।

—মানে···বুঝতেই পারছ!

বুঝতে পেরেও, সরস্বতী তার বিরক্তি গোপন করল না।

—শোন, তোর কি হয়েছে, তা জানার আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আমি জানতে চাই, আমার ফ্ল্যাটের কতদূর কি হোল? আর, আমার স্কীমের টাকা তো এখন পাওয়ার কথা! কবে পাব টাকাটা?

ইন্দিরা শশব্যস্তে চারদিকে তাকিয়ে সরস্বতীকে কাতরভাবে অনুনয় করল।

—প্লীজ, সরস্বতীদি। ও শুনতে পাবে। পাশের ঘরে আছে।

সরস্বতী চটে উঠল। গলার স্বর না পাল্টিয়ে ধমকে উঠল।

—শুনতে পাবে তো, কি হয়েছে? শোনাই তো উচিত। তোর ব্যাপার স্যাপার আমার একদম ভালো লাগছে না। বুঝতে পারছি, শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাট আমার হবে না। আর স্কীমের নাম করে যে টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছিস, তা-ও আমি ফেরৎ পাব না।

ইন্দিরা ছলছল চোখে সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে, তার একটা হাত নিজের মাথায় রাখল।

—শোন, আমি আমার পেটের সন্তানের নামে বলছি, যদি আমি তোমাকে ঠকাই, তাহলে যেন আমার মরা সন্তান হয়!

সরস্বতী অপ্রস্তুত হয়। বেজার মুখে ইন্দিরাকে বাধা দেয় সে।

—এসব কি কথা? এসব আমি একদম পছন্দ করি না।

ইন্দিরাকে অপ্রসন্ন দেখায়।

—কি করব, বল? তুমি যে আমাকে বিশ্বাস করছ না? এখন তোমার সন্দেহ গেল তো? সন্তানের নামে মা মিছে কথা বলতে পারে না, এটা বিশ্বাস কর তো?

সরস্বতী বিরক্ত বোধ করছিল। ইন্দিরার গ্রাম্যতা অসহ্য ঠেকছিল তার।

—বিশ্বাস অবিশ্বাস নির্ভর করে মানুষের আচরণের ওপর, তার ন্যায়নীতি-

বোধের ওপর। তুই যদি আমাকে না ঠকাস, তাহলে তোর প্রতি আমার বিশ্বাস ঠিকই ফিরে আসবে। শুধু শুধু কেউ কাউকে অবিশ্বাস করে না। তার কতগুলি কারণ থাকে। তুই তো সত্যি কথা কম বলিস। তুই বলেছিলি, তোদের তিনতলা বাড়ি। গিয়ে দেখি, সেটি একতলা। এরকম কত মিথ্যা কথা তুই বলেছিস, ভেবে দেখিস।

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইল।

—আমি দু'এক দিনের মধ্যেই তোমার বাড়ি যাব। এখন এস, আমার বরের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ওকে কিছু বলো না। ও এসব ব্যাপারে কিছু জানে না।

ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে, শাশুড়ীর সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিল সরস্বতীর। সরস্বতী নিরস্ত্র হয়ে ফিরে আসল। আঘাত হানতে পারল না।

পরবর্তী ইতিহাস তথৈবচ। মাঝে মাঝে ইন্দিরা আসে, তাকে স্তোকবাক্য দেয়। ভবিষ্যতের অনেক রঙীন স্বপ্ন সাজিয়ে এনে তার চোখের সামনে মেলে ধরে। এটা ওটা কারণ দেখিয়ে, তার কাছে টাকা চায়। বেশির ভাগ সময়েই সরস্বতী তার অক্ষমতার কথা জানায়। কখনও সখনও, সামান্য কিছু টাকা, যেন ঘুষ হিসাবেই তুলে দেয় ইন্দিরার হাতে।

এত বছর ধরে সরস্বতী যে ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখেছে, তার মায়া ত্যাগ করতে পারে না। অ্যাকিলেসের হিলের মত সরস্বতীর সেই দুর্বলতা কাজে লাগায় ইন্দিরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কখনও এই ওজুহাত, কখনও ঐ ওজুহাত দেখাতে লাগল, ফ্ল্যাটের দখল পেতে দেরি হওয়ার কারণ হিসাবে।

সরস্বতীর সঙ্গে তার প্রায় প্রতিদিনই বচসা বাধে। তবু সরস্বতী সেই সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে ছিন্ন করতে পারে না। ইন্দিরার কাছে তার সর্বস্ব রয়েছে। তিল তিল করে জমানো টাকা সে তুলে দিয়েছে তার হাতে। গহনাপত্র বেচেও টাকা যোগাড় করে দিয়েছে। সেগুলি সে আদায় করবে না?

ইতিমধ্যে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ভাঙ্গা সম্পর্ক কিছুটা জোড়া লাগল। জোড়া লাগার কারণ ছোড়দার অসুস্থতা। সরস্বতীর বাড়িতে একদিন নিলয় এসে হাজির। ছোড়দার কাছেই পেয়েছে সে সরস্বতীর ঠিকানা। সরস্বতী শুনল, ছোড়দার ক্যান্সার হয়েছে। তাকে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইতঃপূর্বে পরপর মেজদা ও মেজবৌদির মৃত্যুসংবাদ পেয়েও এতখানি অধীর হয়নি সরস্বতী। আর দশটা খবরের মত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল সেই খবর। কিন্তু ছোড়দার প্রতি তার প্রাণের টান অন্যরকম। সরস্বতীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

তার মনে হোল, সংসারে কি ভাল লোকেদের ঠাঁই নেই? ক্যান্সার এখনও পর্যন্ত দুরারোগ্য। যত নিষ্ঠুরই শোনাক, ছোড়দার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সরস্বতী কি করবে? এই সংসারে তার আপন বলতে কে আছে? কার ওপর সে নির্ভর করবে?

সে যার ওপরই নির্ভর করতে যায়, তাকেই ছিনিয়ে নেয় ভাগ্য। ঈশ্বর কি সত্যি আছেন?

আজকাল মাঝে মাঝেই সন্দিহান হয় সরস্বতী ঈশ্বরের অস্তিত্বে। বিশ্বসংসারে দুর্নীতিপরায়ণ, লম্পট, বদমাস শয়তানদের অবাধ রাজত্ব চলছে। যারা যত বেশি ধূর্ত, যত বেশি বদমাস, যত বেশি শয়তান, তারা তত বেশি ভালভাবে জীবন কাটাচ্ছে। সজ্জন, নীতিবান, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষদের কেঁচো হয়ে থাকতে হচ্ছে বদমাসদের কাছে। ঈশ্বর মেনে নেন কিভাবে এসব ব্যাপার? কত মানুষ বুক ফুলিয়ে একের পর এক অন্যায় করে যাচ্ছে—তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগছে না। এসব যদি চলে, তাহলে ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন কি?

এসব চিন্তা করে, সরস্বতী দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। হয়, ঈশ্বর আছেন—কিন্তু তিনি অক্ষম। অন্যায়ের প্রতিকার করা তার সাধ্যে নেই। অথবা, তিনি নেই। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেননি। মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে।

আগে দুঃখের মুহূর্তে, গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর মুখ মনে করার চেষ্টা করত সরস্বতী। আজকাল তার বিরক্তি বোধ হয়। কি হবে, ঈশ্বরকে ডেকে? তিনি কি সত্যিই আছেন? আর যদি থাকেনও, তাহলে তিনি অবশ্যই নিষ্ক্রিয়—কিছু করেন না, কিছু করার সাধ্যই নেই তার। শুধু শুধু এক মিথ্যার স্বর্গ রচনা করে, নিজেকে ভোলাতে চায় না সরস্বতী।

প্রায় নিয়মিতভাবে ছোড়দাকে গিয়ে দেখে আসে সরস্বতী। দিনে দিনে স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে ছোড়দার। সরস্বতীরা দেখতে পায়, ছোড়দার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে শমন। কিন্তু কি আশ্চর্য। ছোড়দা যেন বুঝে উঠতে চায় না।

পালা করে ভাইয়েরা রাত্রে বেসভিউয়ে থাকছে। সকলেই বুঝতে পারছে, শেষের দিন আগতপ্রায়। নিলয় একদিন তার ছোড়দাকে জিজ্ঞাসা করল, সে কাউকে দেখতে চায় কিনা। সে ভেবেছিল, যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছোড়দার সম্পর্ক আছে, তাকে নিশ্চয়ই দেখতে চাইবে সে মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু তার ছোড়দা কোন আগ্রহ দেখাল না।

সরস্বতীকে সেকথা জানিয়ে, দুঃখ প্রকাশ করল নিলয়।

—ছোড়দা ভাবছে, ও আবার ভাল হয়ে যাবে। ভাবছে, সুস্থ হয়ে ঐ মহিলার কাছে আবার যেতে পারবে। আমরা কি করে ওর কাছে নিষ্ঠুর সত্যটা প্রকাশ করি?

ছোড়দার এই অধ্যায়টা ভাবলে বড় বিচিত্র লাগে সরস্বতীর। তার ছোড়দার মত আরামপ্রিয়, রুচিবান মানুষ যে কি করে বেলগাছিয়ার এঁদো গলির এক মহিলার প্রেমে এমন হাবুডুবু খেল, তা ভাবলে তার মনে হয়, পৃথিবীতে সবই সম্ভব। কি একটা দরকারে, একবার নিলয়কে যেতে হয়েছিল সেই বাড়িতে ছোড়দার খোঁজে। ও সেখানকার পরিবেশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলার সম্পর্কে ছোড়দাকে স্পষ্ট করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় নি। তবু বাড়ির কারুর কাছেই অজানা নেই সেই গোপন সম্পর্ক। সরস্বতীর মেজ বৌদি একদিন তার ছোড়দাকে গাড়িতে একজন মহিলার সঙ্গে দেখেছিল।

গাড়িতে দু'তিনটি বাচ্চাও বুঝি ছিল। বৌদির ধারণা হয়েছিল, অভয় হয়ত বা বিয়ে করেছে সেই মহিলাকে, আর বাচ্চাগুলি তাদেরই।

অন্যরাও একাধিকবার ছোড়দাকে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখেছে। সরস্বতী একদিন ভয়ে ভয়ে ছোড়দাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আচ্ছা ছোড়দা, তুমি কি বিয়ে করেছ? সকলে বলে, তুমি নাকি'—কথাটা শেষ করেনি। থেমে গিয়েছিল আচমকা। অভয় হেসেছিল। সরল, নির্ভেজাল হাসি।

—না রে, বিয়ে করিনি। তবে আমি একজন মহিলার কাছে যাই।

সরস্বতীর আরও অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল। লজ্জায় আর কোন প্রশ্ন সে করতে পারেনি। সরস্বতী কেন, বাড়ির অন্য কেউও ছোড়দাকে সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। বয়োজ্যেষ্ঠ দাদারাও নয়।

অকৃতদার ছোড়দা বড় হাতে টাকা দেয় পরিবারে। যেকোন প্রয়োজনে, যেকোন উপলক্ষে, মোটা হাতে টাকা দেয় যে, তাকে ঝুটঝামেলা কতগুলি প্রশ্ন করে তাতিয়ে তোলার অর্থ হয় না। ছোড়দা অসন্তুষ্ট হলে সকলেরই ক্ষতি। সে যে কারখানাটি গড়ে তুলেছে, তার টার্নওভার অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করবে। ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও বড় কম নেই। পরিবারে, এক অর্থে, সবচেয়ে কৃতী পুরুষ তার ছোড়দা। ছোড়দার নারী ঘটিত সেই অধ্যায়ের অনেক তথ্যই তাই এখনও অজানা রয়ে গেছে তাদের কাছে।

মৃত্যুর দিন, ছোড়দার অবস্থা খুব খারাপ শুনে, সরস্বতীরা নার্সিংহোমে তাকে দেখতে গেল। ছোড়দা অনেক কষ্টে যা বলল, তার মর্মার্থ হোল, উকিলকে ডেকে নিয়ে আসা হোক। সে উইল করে যাবে। কিন্তু ওরকম অবস্থায় ঐ নির্দেশ পালন করা যায় না। অমানবিক হবে বিবেচনায়, তারা মুমূর্ষুর শেষ ইচ্ছা অগ্রাহ্য করল। তবু মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। একটু পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ঘোষাল পরিবারের সেই দামাল, দুরন্ত, সরল ছেলেটি।

অন্যদের কত ক্ষতি হোল, তা তারা জানে। সরস্বতী যেন অকূল পাথারে পড়ল। ছোড়দা তাকে ইদানীং অনেকবার বলেছে, তার ব্যবস্থা সে করে যাবে। সরস্বতীরও মনে মনে সেই বিশ্বাসই ছিল।

কিন্তু ছোড়দার মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, টাকা পয়সা বা ব্যবসার ব্যাপারে, কোন রকম নির্দেশনামা সে রেখে যায়নি। অবিবাহিত ছোড়দার সম্পত্তিতে সমান ভাগ থাকার কথা ভাইবোনেদের। সরস্বতীরও তাতে ভাগ থাকবে।

কিন্তু সুরু হয়ে গেল, শরিকী বিবাদ। তার মেজদার ছেলে সেই ব্যাপারে বাদ সাধল। যা অনায়াসে তাদের প্রাপ্য হোত, তার পথে অন্তরায় হোল পারিবারিক কোন্দল। সেই কোন্দলে সবচেয়ে ক্ষতি হোল সরস্বতীর।

সরস্বতী দেখল, যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পরিবার সত্যিই অভিশপ্ত। বহু পূর্বে শরিকী বিবাদের ফলে, তাদের হারাতে হয়েছিল অনেক সম্পত্তি। একে একে অনেক সম্পত্তি গ্রাস করে নিয়েছিল রিসিভার মামলার খরচ চালানোর অজুহাতে।

পরিবারের মানুষগুলো তার থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। হিংসা, লোভ, নীচতা, স্বার্থপরতা ও অনুদারতার মাশুল আবার গুণে দিতে হবে তাদের। সেটাই তাদের ভবিতব্য।

একদিন সরস্বতীর মনে হয়েছিল, গৃহত্যাগ করে, পরিবারের লোকগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। বহুবছর পর তাদের সঙ্গে ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া লাগাতে গিয়ে দেখল, সেই দুর্ভাগ্য তাকে পরম আপনজনের মত বেঁধে রেখেছে। তার আর মুক্তি নেই।

বিপদ একা আসে না। ছোড়দার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, আবার একটি মর্মান্তিক সংবাদ পেঁছল। তার আইন ক্লাসের সহপাঠী দেওর এসে সরস্বতীকে খবর দিল; দেবাশিস মৃত্যুশয্যায়। সরস্বতী গিয়ে দেখে আসতে পারে। এরপর হয়ত আর সুযোগ হবে না। সরস্বতী তার ভাঙ্গা বুকে বেদনা বোধ করল।

শত তিক্ততা সত্ত্বেও, দেবাশিসের অস্তিত্বের সঙ্গে তার অস্তিত্ব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এত বছর পরেও, তার জন্য মন খারাপ হোল সরস্বতীর। অনেকদিন দেবাশিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কতদিন দেখেনি তাকে সরস্বতী। এত সব সত্ত্বেও, ইচ্ছা হোল, তাকে গিয়ে দেখে। কিন্তু সরস্বতী তবু যেতে পারল না। দেবাশিস তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, সে জানে না। তার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে তা নিয়ে।

কয়েক বছর আগে তার এক জায়ের কাছে সরস্বতী শুনেছিল, সে চলে আসার পর, দেবাশিস নাকি খুব ভেঙ্গে পড়েছিল। মনের দুঃখে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান সুরু করেছিল। তার শরীরের অবস্থা খারাপ শুনে সরস্বতী আগের তিক্ততার কথা ভুলে গিয়েছিল। দেবাশিসকে নম্র ভাষায় একটি চিঠি লিখেছিল। নিজের অন্যায়ের জন্য মাপ চেয়েছিল। দেবাশিসকে সে লিখেছিল, দেবাশিস যদি চায়, তাহলে আবার তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারে। সে চিঠির জবাব আসেনি। রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছিল সেই চিঠি সরস্বতী। প্রাপ্তি স্বীকারের ফরমে দেবাশিসের সই ছিল! তাই সে চিঠি দেবাশিসের কাছে পেঁছয়নি, তা হতে পারে না।

অতঃপর সরস্বতী ক্ষান্ত হয়েছিল। ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া দিতে আর সে উদ্যোগী হয়নি। পরে সেই জায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সরস্বতী তাকে সব খুলে বলেছিল। সে বলেছিল, দেবাশিস যখন চায় না, তখন আর মিছামিছি তাকে পত্রাঘাত করে বিড়ম্বিত করবে না। দেবাশিস যদি ইচ্ছুক হয়, তাহলে সরস্বতী যে কোন সময়েই মিটিয়ে নিতে পারে।

তা সত্ত্বেও, খবরটা শোনার পর থেকে, সরস্বতী কেমন যেন অস্থির বোধ করতে লাগল। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সব রাগ, দুঃখ, অভিমান, মান অপমান বোধ চাপা দিয়ে, শেষবারের মত গিয়ে দেখে আসে সে দেবাশিসকে। মৃত্যু যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে আবার মান অপমান কি? সরস্বতী কেবলি ভাবল আর ভাবল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

দুই দিন পর, সেই চরম সংবাদ পেঁছল তার কাছে। দেবাশিস মারা গেছে।

সরস্বতী উপলব্ধি করল, মৃত্যুর চেয়ে বড় শূন্যতা আর কিছু নেই। বিরোধে, কলহে, বিচ্ছেদে, শূন্যতাবোধ এমন সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় দগ্ধ করে না অন্তরাত্মাকে। কিন্তু দুঃখকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল একটি জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তাকে বারবার পীড়িত করে। কেন তার জীবন আগাগোড়া এমন দুঃখময়, যন্ত্রণাময়, বঞ্চনাময়? কেন তাকে আমৃত্যু এত কষ্ট সইতে হবে?

সরস্বতী নিষ্ঠুর সেই রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করে আজকাল। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়—নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, আচরণের মধ্যে তার কারণ সন্ধান করে। ভাগ্য, দৈব, ঈশ্বরের বিধান, নিয়তি, তার কাছে কেবলি অর্থহীন শব্দবন্ধের গোলকধাঁধা হয়ে ওঠে। যে ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে সে তার জীবন সুরু করেছিল, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসের রাংতামোড়া আস্তরণ পরতে পরতে খসে পড়ে। জীবনের শ্রীহীনতা ও কুশ্রীতা সরস্বতীর কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। সরস্বতী বিশ্বসংসারে কেবলি অসংগতি দেখে, অন্যায় দেখে, ঘোরতর অবিচার দেখে। পরম নিয়ন্তা, পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

সরস্বতী এখন শুধু টিঁকে থাকার কথা ভাবে। অর্থচিন্তা তার রাত্রির ঘুম কেড়ে নেয়। রাতদিন এক চিন্তা অস্থির করে তোলে তাকে। কতদিন টিউশানি থাকবে? যখন থাকবে না, তখন জীবনধারণের উপায় কি হবে?

সরস্বতী ভাবে, তার ছোড়দা যে অর্থ রেখে গেছে, তার এক ভাগ পেলে সরস্বতীর আর ভাবনা ছিল না। কিন্তু যে মামলা মোকদ্দমা সুরু হয়েছে, তার নিষ্পত্তি কবে হবে, কেউ জানে না। আর মামলা বাবত খরচখরচা বাদ দিয়ে কতটুকু হাতে আসবে?

সরস্বতীর অভিমান হয়। ছোড়দা যদি তার জন্য একটা ব্যবস্থা করে যেত, তাহলে আজ এতসব কাঠখড় পোড়াতে হতো না। তার বিশ্বাস ছিল—আর তার ছোড়দাও তাকে সেরকম আশ্বাস দিয়েছিল যে, সে তার ব্যবস্থা করে যাবে। সব কিছু অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ চলে গেল ছোড়দা। ছোড়দার মৃত্যুশোক ছাপিয়ে সরস্বতীর মনে প্রবল হয়ে ওঠে ছোড়দার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য আপসোস।

মাঝে মাঝে নিজেকে ছোট মনে হয় সরস্বতীর। নিজের কাঙালপনা তাকে লজ্জা দেয়। কোনদিন কারুর কাছে হাত পাতেনি সে। অর্থচিন্তা এমন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি আগে। এখন ভবিষ্যতের চিন্তা প্রজ্জ্বলিত আগুনের মত দাউদাউ করে। সেই খরতাপে তার শান্তি, স্থৈর্য, জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়।

তার মেজদার যে ছেলেটিকে সে নির্লোভ, সৎ ও শান্ত স্বভাবের বলে জানত, সে এখন অন্য মূর্তি ধারণ করেছে। সরস্বতী ভাবে, তার মায়ের লোভ ও স্বার্থপরতা ছেলের মধ্যে অবশ্যই সুপ্ত ছিল এতদিন। সরস্বতীরা তার হদিশ পায়নি। এখন বউ ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সরস্বতীদের প্রাপ্য ভাগ থেকে বঞ্চিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

যদি তার ভায়েদের মধ্যে একতা থাকত, তাহলে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠত না। তার সেজদা হঠাৎ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে হাত মেলাল মেজদার

ছেলের সঙ্গে। সবচেয়ে ক্ষতি হোল সরস্বতীর। অন্যদের অন্য সংস্থান আছে—সরস্বতীর মত তারা নিঃস্ব, নিঃসম্বল নয়।

সরস্বতী তার নিজের ভাগ্যকে ছাড়া, আর কাকে দোষ দেবে? দাদারা তাকে সান্ত্বনা দেয়। টাকা নাকি সে ঠিকই পাবে। সরস্বতীর মনে হয়, ঠগের বাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়ার মত অবস্থা তার। যতক্ষণ না পাচ্ছে, বিশ্বাস নেই। তার দুর্ভাগ্য তাকে অদৃষ্টবাদী করে তুলেছে, দুঃখবাদী করে তুলেছে।

গভীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত, একদিন সরস্বতীর কাছে এসে উপস্থিত হোল তার আইন ক্লাসের সহপাঠী দেওর বিশ্বজিৎ। সরস্বতীর জন্য বিধবা পেনশনের ব্যবস্থা করবে সে। দেবাশিসের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। আইনের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। অতএব বিধবা পেনশন তার প্রাপ্য। দেবাশিস তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, ইত্যাদির জন্য নমিনী করে গেছে তার মা ও বোনেদের। সরস্বতী চেষ্টা করলে, একমাত্র বিধবা পেনশনের সুবিধাটুকু পেতে পারে।

বিস্মিত হোল সরস্বতী। সে একেবারেই ভাবেনি ঐ বিষয়ে। তার দেওর যে তার জন্য ভেবেছে, তা দেখে অভিভূত হোল। ইদানীং মানুষের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল সে।

বিশ্বজিৎ তাকে দেবাশিসের অফিসে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। সইসাবুদ যা দরকার, করল সরস্বতী। দেবাশিসের বসের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল বিশ্বজিৎ।

ভদ্রলোক প্রকাশ্যে স্পষ্ট করেই তার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—আপনার সঙ্গে কথা বলে তো মনে হচ্ছে, না আপনি অস্বাভাবিক? আপনার সম্পর্কে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম শুনেছিলাম। কতদিন আপনাদের ফ্ল্যাটে যেতে চেয়েছি। দেবাশিস রাজী হয়নি। বলেছে, আপনি নাকি ঠিক স্বাভাবিক নন। কিন্তু এখন আপনাকে—

সরস্বতীর দেওর বাধা দেয়।

—দেখুন, আমার দাদা এখন জীবিত নেই। তার বিরুদ্ধে কিছু বলা ঠিক হবে না। তবু বলছি, এক হাতে তালি বাজে না। দোষ আমার দাদারও কম ছিল না।

সরস্বতী নিঃশব্দে শুনে গেল। তার মনে হোল, এটুকু না শুনলেই বুঝি ভাল ছিল। দেবাশিসের মৃত্যুর পরেও, তাদের দুজনের সম্পর্কের তিক্ততা শেষ হয় না কেন? কেন তার রেশ থেকে যায় অপরের স্মৃতিতে? মৃত মানুষের বিরুদ্ধে তার মনে যেন কোন অভিযোগ উত্তাল হয়ে না ওঠে।

সরস্বতীকে ইন্দিরা যে ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই ফ্ল্যাট সরস্বতীর কাছে এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে। তার জীবনে বাহ্যতঃ কোন পরিবর্তন আসেনি। এখনও সে বস্তী বাড়িতেই রয়ে গেছে। এখনও সে এজমালি কলতলা ও পায়খানা অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে। ইন্দিরার জীবনে কিন্তু পরিবর্তনের

ছোঁয়া লেগেছে। সে বিয়ে করেছে, একটি কন্যা সন্তানের জননী হয়েছে।

ইন্দিরা আরও কয়েকবার, এটা সেটা ওজুহাতে, তার কাছে টাকা চেয়েছে। অবিশ্বাস করতে করতে আবার বিশ্বাস করে ফেলেছে সরস্বতী। ইন্দিরা তার সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করেছে। বলেছে, সে যদি সরস্বতীকে ঠকায়, তাহলে তার চরম সর্বনাশ হবে। কালী ঠাকুরের ছবি স্পর্শ করেও শপথ করেছে। বলেছে, সরস্বতী তার ফ্ল্যাট পাবে। স্কীমের টাকা পাবে। সরস্বতী তার এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পুঁজি সম্বল করেও ইন্দিরার চরিত্ররহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। যখন পারল, তখন অনেক দেরি করে ফেলেছে।

সরস্বতী তার ছোট ভাইয়ের মারফৎ, তার ছোড়দার উকিল বন্ধুর মারফৎ, যে তথ্য সংগ্রহ করল, তা মারাত্মক। ইন্দিরা একটি ঠগবাজ দলের সঙ্গে জড়িত। দলিল তৈরি করা, স্কীমের কাগজপত্র তৈরি করা, তাদের কাছে জলভাত। সরস্বতীকে বোকা বানাতে তাই অসুবিধা হয়নি তার। সরস্বতী শুনল, তার আসল নাম অন্য। একবার সে জেল খেটেছিল। পরে অন্য নাম গ্রহণ করেছে। তার স্বামী নাকি আসলে সবই জানে। আড়ালে থেকে সে-ই ইন্দিরাকে চালাচ্ছে। তার স্বামী কিছু জানে না বলে ইন্দিরা যে ভয় ব্যক্ত করেছিল, সেটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা কার্যসিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত কৌশল মাত্র।

সরস্বতী মনস্থির করে ফেলল। আর নয়। অনেক হয়েছে। অনেক খেলা খেলেছে তাকে নিয়ে ইন্দিরা। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে অনেক। সরস্বতী নিজেকে বুদ্ধিহীন মনে করেনি কোনদিন। তার বাড়িতে তাকে বুদ্ধিমতী বলত সকলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সে চরম নির্বোধ, অপরিণত, অতিবিশ্বাসপ্রবণ।

পৃথিবীর আবহাওয়া দিনে দিনে কলুষিত হয়ে উঠছে। ধূর্তামি, শঠতা, কপটতা ও শয়তানির ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে, অন্য রকম বুদ্ধির দরকার হয়। এতদিনেও তা সে অর্জন করে উঠতে পারেনি।

গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হয়েছে, হয়েছে। তার আর নড়চড় হতে পারে না। যে ঢেউ বয়ে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু অপরকে কাণ্ডারী করে জীবনসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথা আর সে ভাববে না। সে নিজেই তার জীবনতরীর কাণ্ডারী হবে।

ইন্দিরার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল তার। ইন্দিরা ভাবতে পারেনি, সরস্বতী তার সম্পর্কে এতসব খবর সংগ্রহ করতে পারে। আগের মতই কৌশলে সরস্বতীর অভিযোগ নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। সরস্বতী স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, ইন্দিরার সমস্ত জারিজুরি সে ধরে ফেলেছে। তার কপটতা, মিথ্যাচার ও নোংরামী তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে।

ইন্দিরা প্রকাশ্যে তার সঙ্গে যুঝতে পারল না বটে, কিন্তু তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করল অন্যভাবে। বাড়িওয়ালার মেয়েদের কাছে সরস্বতীর সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত অনেক কিছু বলে তাদের মন বিষিয়ে দিল। সরস্বতী মদ্যপান

করে, সে দেহের বেসাতী করে অর্থোপার্জন করে, টিউশানির কথাটা আদৌ সত্য নয়, ইত্যাদি অনেক অপবাদ জুটল সরস্বতীর কপালে।

বাড়িওয়ালার মেয়েরা এবং অন্য ভাড়াটেরা তার সত্যাসত্য নির্ণয় না করে, তার ওপর নির্যাতন চালাতে সুরু করল। সরস্বতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ হোল।

সরস্বতীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অনন্যোপায় হয়ে সে আবার তার ছোড়দার উকিল বন্ধুর শরণাপন্ন হোল। সব শুনে তিনি বললেন, চেষ্টাচরিত্র করলে, ইন্দিরাকে জেল খাটানো হয়ত যায়। স্কীমের টাকার নাম করে মোট যে টাকা সে সরস্বতীর কাছে থেকে নিয়েছে, তার উল্লেখ করে একবার একটি বিবৃতি দিয়েছে। সরস্বতীর নির্দেশমত, মেয়াদ শেষ হলে, সরস্বতী কত টাকা পাবে, তা স্বহস্তে লিখেছে। খোঁজখবর করলে, তার সম্পর্কে আরও এমন কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যাকে ভিত্তি করে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়।

কিন্তু সরস্বতীর টাকা উদ্ধার হবে না। আর ফ্ল্যাটের তো কথাই নেই। ইন্দিরা যা বলেছে, যা দেখিয়েছে, তা সবই মিথ্যা, জাল, সাজানো। মাঝখান থেকে সরস্বতীর জীবন বিপন্ন হবে। তার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে। যে দলের সঙ্গে ইন্দিরা জড়িত, তারা সরস্বতীকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না'।

সরস্বতী তাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। তবে ইন্দিরার সংশ্রব সে পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। বেহায়ার মত আবার তার কাছে এসেছিল ইন্দিরা। তাকে বোঝাতে চেয়েছিল। সরস্বতী যেন তাকে অবিশ্বাস না করে। সরস্বতী তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, তার মুখদর্শন করতে চায় না সে। আর কোনদিন তার ত্রিসীমানায় যেন না দেখে ইন্দিরাকে। তাহলে ফল ভাল হবে না।

সরস্বতী বুঝতে পারছে, যে বাড়িতে আছে, সেখানে বেশিদিন টিকতে পারবে না। নিলয়কে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেছে, তার জন্য অল্প ভাড়ায় একটা ঘর ঠিক করে দিতে। মায়াকেও এক অনুরোধ করেছে। বাড়ি হয়ত একটা সে পাবে। কিন্তু অতঃপর? সেখানেও যে সে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে, তার কি কোন গ্যারাণ্টি আছে?

এর মধ্যে দু'দিন দুটি বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। একদিন জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে একটি হাত তার মাথা স্পর্শ করেছিল। তখনও ঘুমোয়নি সরস্বতী। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। তার চোখে পড়েছিল, একটি লোক বারান্দা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

আরেকদিন তার দরজায় করাঘাত শুনেছিল। সে 'কে' বলে প্রশ্ন করলে, জবাব এসেছিল, 'আমি, দরজা খোল।' সরস্বতী বলেছিল, 'আমি চেঁচাব, লোক জড়ো করব।' সেই লোকটা তখন আশা নেই দেখে, চলে গিয়েছিল। এই ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না, তা কে বলতে পারে? আর তেমন ডাকাবুকো কেউ হলে, এত সহজে কি সে নিবৃত্ত হবে?

আরও অত রকমের অভিজ্ঞতা হোল তার। একা থাকা মেয়েকে সুযোগসন্ধানী পুরুষ বেওয়ারিশ মাল মনে করে। তার সদ্ব্যবহারে সে সদাই তৎপর। কিছুদিন আগে, তাদের পাড়ার কাছাকাছি এক বাড়িতে একটি বাচ্চা মেয়েকে পড়াবার টিউশানি পেয়েছিল সরস্বতী। মেয়েটির বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগাযোগ করেছিল তার সঙ্গে। সরস্বতী সরল বিশ্বাসে পড়াতে গিয়েছিল বাড়িতে। গিয়ে মেয়েটির মাকে দেখতে পায়নি। মেয়ের বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলেছিল, স্ত্রী নাকি রাগ করে মাসখানিক আগে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

সরস্বতী আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু মেয়েটির বাবা নিজের থেকেই বাড়তি তথ্য সরবরাহ করেছিল। সরস্বতীকে বলেছিল, স্ত্রীকে সে ডিভোর্স করবে। তার স্ত্রীর স্বভাবচরিত্র ভাল না। স্ত্রী যদি ফিরেও আসতে চায়, তাকে ঢুকতে দেবে না বাড়ি।

সরস্বতী অস্বস্তি বোধ করেছিল সব শুনে। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। সে যখন পড়ানো শেষ করে বাড়ি ফিরে আসছে, তখন ভদ্রলোক তাকে তার সঙ্গে বসে মদ্য পান করতে অনুরোধ করেছিল। তার চোখমুখের ভাব ভাল লাগেনি সরস্বতীর। 'আমি মদ খাইনা' বলে কোনরকমে তার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছে সেদিন। পরে আর পড়াতে যায়নি সেই মেয়েকে।

সরস্বতী ব্যাপারটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করতে পারল না। তার মনে হোল, তার সম্পর্কে যে অপবাদ রটানো হচ্ছে, তার সঙ্গে হয়ত কোনরকম যোগসূত্র আছে ঐ ঘটনার। সে একা থাকে, তার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে না, বিকালবেলায় সে সেজেগুজে বেরিয়ে যায় টিউশানি করতে—এই ব্যাপারগুলো অনেকের কাছেই আর নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে না।

অভিজ্ঞতার পরিধি তার বেড়েই চলল। বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করলেও রেহাই নেই তার মাংসলোভী লম্পটদের হাত থেকে। কাছে এসে ফিসফিস করে কুৎসিত প্রস্তাব দেয় তারা। রাগে, দুঃখে, অপমানে, সরস্বতীর চোখে জল এসে যায়।

একা থাকার এত মূল্য দিতে হয়, জানত না সরস্বতী। সে ভেবে পায় না, কিভাবে সে চিহ্নিত হয়ে গেছে। কেন তাকে লোকে কুৎসিত তাগিদ মেটানোর যন্ত্র বলে ভেবে নেয়?

সরস্বতী ভাবে আর ভাবে। সে আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মিথ্যা মোহঘোরে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখতে চায় না।

অলীক স্বপ্নের মোহাঞ্জন মুছে গেছে তার চোখ থেকে। সে এখন নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে।

কিন্তু তাকে উত্যক্ত করে কতগুলি প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের জবাব সে জানে না। তার আশা, একদিন কেউ না কেউ তার জবাব দেবে। অনেক আশা সে ছেড়েছে, কিন্তু এই আশাটুকু সরস্বতী এখনও জীইয়ে রেখেছে।

॥ উপসংহার ॥

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে এক রূপকথা শুনছিলাম। প্রাসাদপুরীর রূপসী রাজকন্যা শাপভ্রষ্ট হয়ে ঘুঁটেকুড়নী হয়, কিংবা দাসী হয়, বলে শুনেছি। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। শাপভ্রষ্ট রাজকন্যার দুঃখভোগ একদিন শেষ হয়, আবার তার সৌভাগ্যসূর্য মধ্যগগনের দীপ্তিতে ঝলমল করে।

সরস্বতীর জীবনে শুধুই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার জীবনে কোন উত্তরণ নেই। আমাকে সে তার কাহিনী শুনিয়েছে, তার মনের প্রশ্নগুলি ব্যক্ত করেছে। সে জানতে চেয়েছে, তার জীবন কেন এরকম হোল? তার দুর্ভাগ্যের মূলে কি আছে? সে প্রশ্ন করেছে, ভাগ্য তাকে পুতুলের মত নাচিয়েছে, না সে তার বুদ্ধির দোষে অনবদ্য ভাগ্য তৈরি করে নিয়েছে?

সে আরও প্রশ্ন করেছে, তার দুর্ভাগ্যের জন্য তার পরিবারের লোকগুলির কি কোন দায় নেই? সে নিজেই কি একমাত্র দায়ী তার জন্য? তার বাল্যবিবাহের কি কোন দায় নেই? আর কেউ কি ভালবেসে গৃহত্যাগ করে না? তার মত আমৃত্যু এভাবে যুঝে যেতে হয় তাদেরও?

ইন্দিরা কি আসলে উপলক্ষ মাত্র, নিমিত্ত মাত্র? সরস্বতীর নিবান্ধব অসহায় অবস্থার সুযোগ কি ইন্দিরা না হয়ে, অন্য কেউও নিতে পারত?

কর্মফল, নিয়তি, ভাগ্য ও ঈশ্বর সম্পর্কেও তার মনে উদয় হয়েছে যে সব প্রশ্ন, তা ব্যক্ত করেছে সে আমার কাছে। মানুষের সততা, উদারতা ও মহত্ত্বের তাৎপর্য নিয়েও তার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে।

আমি সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। অনেক ভেবেও, সেগুলির কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি। এক সময়ে যে জবাব সঠিক মনে হয়েছে, পরের মুহূর্তে তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে মনে।

সরস্বতীকে আমি সত্য কথাই বলেছি। বলেছি, আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ। বলেছি, আমাদের জীবনপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর পাশাপাশি সহাবস্থান করে। হয়ত সে নিজেই একদিন সঠিক জবাব খুঁজে পাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

তবে তাকে কথা দিয়েছি, তার কাহিনীটি লোকসমক্ষে পেশ করব। কে জানে পাঠকদের মধ্যেই কেউ হয়ত তার প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে।

সরস্বতী স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে, এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। জীবনের শিকড় তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সে জানে, এক অপার শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন। প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের মধ্যেই জীবনের অর্থ সীমিত হয়ে গেছে এখন। অন্য কোন গূঢ় গভীর অর্থ সে খুঁজে পায় না আর।

সরস্বতী বলে, কোন কিছুতেই আর সে আস্থাশীল নয়। মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাস সে হারিয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সে সন্দিহান। অর্থই এখন তার উপাস্য দেবতা। আর সব কিছু মিথ্যা হয়ে গেছে তার কাছে।

আমি বুঝেছি, অনেক দুঃখে, অভিমানে, সব কিছু নস্যাৎ করতে চাইছে সরস্বতী। মনের প্রত্যন্তে তার সায় নেই। সরস্বতীর মত মানুষরা তাই এত কষ্ট পায়, তাদের জীবন তাই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের মসৃণ পথ ধরে এগিয়ে চলে না।

জীবনজিজ্ঞাসায় কণ্টকিত পথে অনেক ঘাম, রক্ত ঝরিয়ে তারা চলতে সুরু করে। সেই পথচলা কখনই নিষ্ফল হতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি, সরস্বতীর অভিমানের মেঘ একদিন কেটে যাবে। সে উপলব্ধি করবে, তার ঝোলা পুরোপুরি শূন্য নয়। এই বেদরদী পৃথিবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তার ঝুলিতে কিছু ফেলে দিয়েছে।

॥ সমাপ্ত ॥